রবীন্দ্র-চর্চা

হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত

সুরভি প্রকাশনী
১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

রবীন্দ্র-চর্চা

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ, যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরি মতো
হে অমর কবি ? ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা-ষড়চক্র, আঘাত গোপন
কখনো কি সহ নাই অপমান ভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি ?

তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য কমল,
আনন্দের সূর্য পানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই ।
জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান ॥

১১ শ্রাবণ ১৩০৩ —রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি' থেকে

রবি-রশ্মি, রবীন্দ্র-চর্চা, রবীন্দ্রায়ণ

'রবি-রশ্মি' কথাটি যেমন প্রথম সত্যেন দত্তের প্রয়োগ,—বাংলা কবিতায় 'রবীন্দ্রায়ণ' শব্দটি তেমনি প্রথম যতীন্দ্রমোহন বাগচীর। মধ্যবর্তী তৃতীয় শব্দ এই 'রবীন্দ্র-চর্চা'—যে-নামে নিবেদিত উপস্থিত বই।

১৩৩৮ সালের পৌষে বেরিয়েছিল 'জয়ন্তী উৎসর্গ'। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই সংবর্ধনার স্মৃতি মনে পড়ছে। সে-বইয়ে 'রবীন্দ্রায়ণ' নামে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটি কবিতা ছাপা হয়। সে লেখাটির শেষ কয়েক ছত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ

আজি শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবি মনে, কী যে তুমি ধন
বিধাতার আশীর্বাদ,—তব স্পর্শে ধন্য এ জীবন।
কবির প্রেরণা তুমি চিত্তমাঝে, ভক্তের বিনতি
তব পদপ্রান্তে আজি জানাইনু প্রাণের প্রণতি।

রবীন্দ্রনাথ যে কতো বড়ো কবি ছিলেন, সে-কথা স্তব্ধ হয়ে ভাববার কথা! তাঁর স্পর্শে আমাদের জীবন যে ধন্য হয়েছে, সে-কথা একবাক্যে অনেকে বলেছেন। তবে, তিনি যে কেবলমাত্র কবি ছিলেন, তা নয়। সমাজচিন্তায়, রাষ্ট্রচিন্তায়,—শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায়,—শিল্পরুচি সৃষ্টিতে,—গানে,—সাধারণ আলাপের ভাষায়,—অভিনয়ে,—অনুবাদে,—ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ অথবা নানা শ্রেণীর বিজ্ঞান আলোচনাতেও তাঁর মৌলিকতা এবং কৃতিত্বের কথা সুপরিচিত। তাঁর অনেক দিনের বন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিজে একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক আর সম্পাদক ছিলেন বলেই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা সম্পাদনার প্রসঙ্গ তাঁর বিশেষ মনোযোগের বিষয় ছিল। সেই রামানন্দ বলে গেছেন—'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সব কাগজের মধ্যে 'সাধনা' শ্রেষ্ঠ, সেকালে আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহা পরিবর্তন করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। 'সাধনার' শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁহার লেখাতেই ইহার কলেবর অনেকখানি পূর্ণ হইত। তাছাড়া, অন্য যে-সব লেখা বাহির হইত, তাহার উপরও তাঁহারই ব্যক্তিত্বের ও লিখিবার সম্বন্ধে তাঁহার স্বকীয় ছাঁদের ছাপ অনুভব করিতাম। ইহার কারণ, বোধ হয়, এই, যে, তিনি অন্য লেখকদের লেখা সুধরাইয়া দিতেন; হয়ত সেগুলি অনেকটা তাঁহার দ্বারা পুনর্লিখিত

হইত। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মত লেখকের লেখাও তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তবে 'সাধনা'য় বাহির হইত। বলিতে গেলে, তিনি অনেক লেখককে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রচনার উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।' এখানে রামানন্দের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত হওয়া দরকার। তিনি বলে গেছেন—'কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎকৃষ্ট লেখাই ছাপিব অথচ মাসিক পত্রটা ঠিক নির্দিষ্ট দিনে বাহির করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা সেই সম্পাদকই করিতে পারেন, যিনি স্বয়ং মাসিক পত্রের জন্য আবশ্যক সব রকম গদ্য ও পদ্য রচনা প্রচুর পরিমাণে জোগাইতে পারেন। এই যোগ্যতা বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথের যেমন দেখিয়াছি, আর কাহারও সেরূপ দেখি নাই।'

সমবায় শিল্পোন্নয়নের পন্থাও তিনি মেনেছেন,—শিক্ষা-ব্যবস্থায় উদার সর্বান্বয়ও তিনি স্বীকার করেছেন,—দেশে-দেশে বার-বার ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি,—শেষ বয়সে চিত্র-রচনায় উদ্যত হয়েছেন! গান্ধীজী তাঁকে 'গুরুদেব' বলতেন, জগদীশচন্দ্রের তিনি বন্ধু ছিলেন,—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জবাহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু—এবং জীবনের বিভিন্ন মহলের স্বনামধন্য আরো অনেকেই তাঁর স্নেহ-প্রীতি-মমতার নৈকট্যে বাস করে গেছেন। অসংখ্য মানুষের অন্তহীন এই মর্তলোকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় কবি! রামমোহম, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের তিনি ছিলেন বিশেষ গুণগ্রাহী। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর তিনি ছিলেন অকৃত্রিম অনুরাগী। বাংলা দেশের এবং বিশাল ভারতবর্ষের বাইরে বিস্তীর্ণ সভ্য দুনিয়ার অনেক নামকরা মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। একটি কবিতায় তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'যেখানেই বন্ধু পাই, সেখানেই নবজন্ম ঘটে।'

রবীন্দ্রনাথের অজস্র গদ্য-পদ্য-নাট্য রচনার ধারায় যে-কথা প্রধান,—যা গভীরভাবে প্রধান হয়ে বেজেছে,—সে তাঁর সর্বদর্শী, সর্বত্রজাগর ঐক্যানুভূতির আনন্দ! রবীন্দ্রনাথের আর এক অনুরাগী বন্ধু—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই ঐক্যের তত্ত্বই আর এক পথে উপলব্ধি করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের বিজ্ঞান-সাধক সত্তার আন্তরিক মিলনের সানন্দ স্বীকৃতি রেখে গেছেন!

যে-বছর রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, সেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে—বোলপুরের সন্নিহিত রায়পুকুরের সিংহ-পরিবারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে বোলপুর জায়গাটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের খুবই ভালো লেগে যায়। বাংলা হিসেবে সে ছিল ১২৬৮ সালের ঘটনা। তার পরের বছর—১২৬৯ সালে,—দুটি মাত্র ছাতিম

গাছ ঘিরে মাঠের মধ্যে বেশ খানিকটা জায়গা নেওয়া হয় দেবেন্দ্রনাথের নির্জন সাধনার জন্যে।

পিতার উপনিষদ-অনুরাগী অন্তর্মুখী মনের গভীর সংযোগ অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। অথচ সংসারের স্থূল কর্তব্য বলতে যা বোঝায়, কম-বেশি সে-রকম যাবতীয় কর্তব্যই রবীন্দ্রনাথকে মানতে হয়েছে। তাঁর জীবনে—পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা-জায়া ইত্যাদি সংসারের প্রিয় সম্পর্কে বার-বার শোকাগ্নি-প্রদানে মৃত্যুর কোনো কার্পণ্য ছিল না! ঈর্ষাগ্রস্ত সমসাময়িকদের সান্নিধ্য থেকে আত্মরক্ষা করবার উপায়ও ছিল না তাঁর। তবু এই সব অসামর্থ্যের সঙ্গেই পরমাশ্চর্য এক সামর্থ্য ছিল তাঁর। তিনি লোকান্তরিত হবার পরে আচার্য যদুনাথ সরকার সে-কথা জানিয়েছিলেন। সেই যদুনাথও আজ নেই! তিনি বলেছিলেন:

'রবীন্দ্রনাথ কখনও জনতার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নেতৃত্ব-লোভে হুঙ্কার—অর্থাৎ বীণার সপ্তমে চড়া সুর-বাদন করেন নাই; এরূপ ধস্তাধস্তি কাজের পক্ষে তাঁহার আন্তরিক অসামর্থ্য ছিল। যে দাঁড়িপাল্লায় মণে মণে কয়লা ওজন হয়, তাহার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগৃহের ব্যালান্সে করিতে পারে না। তিনি একবার স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কিছুদিন সংবাদপত্র চালাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার ফল ও স্থায়িত্ব ঠিক সেই আত্রেয়ী গ্রামে পাটের ব্যবসার মতই। [এই লেখাটির আগের অংশে যদুনাথ বলেছিলেন—'ভুলি নাই যে, তিনি একবার আত্রেয়ী গ্রামের 'পাটের হাটে মথুর কুণ্ডু শিবু শা'-র গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া পাটের দোকান খোলেন, যদিও অবশেষে বহু অর্থক্ষতি দিয়া পলাইয়া বাঁচেন।'] ফলত যদি এই দেশে এবং এই যুগে সফল খবরের কাগজ চালাইতে চাও, তবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অথবা পাঁচকড়ি বাবুর মত সম্পাদক লাগাইয়া দাও, কারণ তাঁহাদের 'আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরাই ব্যবসা' নহে, এবং অভিজ্ঞতাও অন্যরূপ।'

অতঃপর যদুনাথ আরো লিখেছিলেন:

'এতক্ষণে বোধ হয় বুঝাইতে পারিয়াছি যে, বঙ্গ-সাহিত্যে এবং বাঙালীর আধুনিক চিন্তাজগতে রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় দানটি কি। যে মনোভাব হইতে এই দান সৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহার একটি ছোটোগল্পে অল্প কথায় অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে:

'মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের

পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দিকবর্তী সভাস্থ জনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।……

'শেখর প্রান্তভাগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক-টি কথা বলিলেন—বীণাপাণি শ্বেতভূজা, তুমি যদি আমার কমলবন শূন্য করিয়া আজ মর্তভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে, তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃতপিপাসী, তাহাদের কী গতি হইবে?'—'জয় পরাজয়'

এই গল্পাংশ উদ্ধৃত করে যদুনাথ পুনরায় বলে গেছেন:

'আমি এই পার্থক্য কী উপমা দিয়া বুঝাইব? যেন এক দিকে বিশারদের কর্ণভেদী ঢক্কানিনাদ অথবা পাঁচকড়িবাবুর দৈনিক হ্রেষারব, আর অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের সংযত মিহি স্বর। অথবা একদিকে হাতকাটা সার্ট, খাকী শর্ট এবং ফুটবল-বুট পরা যুবক, আর অপর দিকে শান্তিপুরে মিহি ধুতি, ধোলাই মলমলের চুড়িদার পাঞ্জাবি এবং কারুকার্যমণ্ডিত গ্রীসিয়ান স্লিপার-পরা তরুণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি, আহিরগ্রাম পত্রিকা আর জাহিরগ্রাম পত্রিকা।

'রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম আনিয়া দেন, এবং যাহার অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরেজি নাম—**refined delicacy**, এবং তাহার বিপরীতটির নাম—**vulgarity of taste**। 'কোমলতা' বা 'মার্জিত রুচি' বলিলে এটিকে ঠিক বুঝাইবে না, কারণ 'কোমল' কথাটা প্রায়ই আমাদের মনে আসে—মেরুদণ্ডহীন দুর্বলতা বা অস্থিহীন মাংসপিণ্ডের ছবি, যেমন বৈষ্ণবসাহিত্যে 'প্রেমরসবিগলিতং' বলিলে বুঝায়। আমি চাই এমন একটি কথা, যাহাতে কবিশেখর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীকের মধ্যকার মানসিক পার্থক্য বুঝাইতে পারিবে। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের কবিশেখর।'

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে,—ঐ একই সময়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছিলেন:

'আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ও সমসাময়িক—অসম্ভব নয় যে দূর ভবিষ্যতে আমাদের একালের প্রধান পরিচয় হবে যে এটা রবীন্দ্রনাথের যুগ। আজকার দিনের তুচ্ছ ঘটনা, ক্ষুদ্র চেষ্টা, স্বল্প সাফল্য যখন সুদূরের দৃষ্টিতে

অলক্ষ্য হবে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দীপ্তিতেই ভাবী কাল আমাদের কালকে জানবে। আমাদের সুখ-দুঃখ, নিরাশা আনন্দ তাদের চিত্তকে স্পর্শ করবে তাঁরই কাব্য থেকে। আমাদের সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য হবে জানতে, আমরা কি ভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলাম, আমাদের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা ব্যাপক ও গভীর ছিল আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছে! তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে আমাদের একাল অমর হয়ে থাকল। সব কালের ভাগ্যে এ সৌভাগ্য ঘটে না।'

'ভবিষ্যৎ কালের লোক মানুষ-রবীন্দ্রনাথকে জানবে ইতিহাসের সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠায়, কিন্তু কবি-রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম স্পর্শ তারা পাবে তাঁর কাব্যে, যেমন আমরা পেয়েছি। আজ হতে বহু শত বর্ষ পরে তাদের বসন্ত দিনও রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-গানে ধ্বনিত হবে, তাদের আষাঢ়ের সজল মেঘের উপর তাঁর বর্ষা-কাব্যের নীল অঞ্জন নেমে আসবে। প্রেয়সী নারীর নয়ন অধর তাঁর কাব্যের মধুতে মধুময় হবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তারা নিরাশায় উৎসাহ, শোকে সান্ত্বনা পাবে। সেই অনাগত কালের সমসময়ীদের আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে তাদের আনন্দই এর প্রত্যভিবাদন।'

'কিন্তু মহাকবির কাব্য চিরকালের হলেও বিশেষ করে তাঁর সমসাময়িকদের। যে চিরন্তন নর-নারীর হৃদয়-স্পন্দন তাঁর কাব্যে রূপ পায়, তাঁর সমকালের নর-নারীর হৃদয় তার উপকরণ। সেই বিশেষের মধ্যে বিশ্বমানব নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। আর কবির সমকালিকেরা তাঁর কাব্যে নিজেদেরই পায় এমন পূর্ণ ও নিবিড় করে, যা ভিন্ন কালের মানুষের সম্ভব নয়। আমরা যারা আকৈশোর দিনের পর দিন রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্য পড়েছি, যার অদ্ভুত বৈচিত্র্য আমাদের মনের সামনে গড়ে উঠেছে ও আমাদের মনকে গড়েছে—চিরকালের রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে আমাদের। বাংলার উদার আকাশ ও অবারিত মাঠে আমাদের চিত্তের প্রসার এসেছে তাঁর কাব্য থেকে। শুভ্র বালুচরের নীচে পদ্মার কালো জল তাঁর কাব্যের কথাই আমাদের কানে কানে বলে। ভোরের প্রথম আলোতে তাঁর কাব্যের মোহ, গোধূলির রক্তরাগে তাঁরই কাব্যের রং। বাংলার নর-নারী আমাদের অন্তরতর তাঁর কাব্যের বন্ধনে। সকল যুগের লোকের এ

সৌভাগ্য ঘটে না। মহাকবির যারা সমসাময়িক এ দুর্লভ সৌভাগ্য তাদেরই। রবীন্দ্রনাথের সমকালে জন্মে আমরা ধন্য হয়েছি।'

মনে পড়ে আর এক জনের কথা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে—জগদ্ব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যেই সে কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর কথা। তিনি বলেছিলেন :

'১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এবং উহার ইংরেজি অনুবাদ The Master's Will প্রকাশিত হয়। আমাদের শাসকসম্প্রদায় দেশের সাহিত্য ও কর্ষণাধারার অনেক সংবাদই রাখেন না, দেশে জাতীয়তার উদ্বোধন রবীন্দ্র-সাহিত্য কতখানি কাজ করিয়াছে, সেই খবরও তাঁহারা রাখিতেন না। The Master's Will পড়িয়া তাঁহারা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। যাঁহাকে এতকাল নিছক কবি ভাবিয়াই তাঁহারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে আবার এ কেমনধারা কথা শুনা যায়। ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু হইল। 'স্টেট্স্ম্যান' বলিলেন, কদলী বৃক্ষ ও ফলের বিকাশ সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ গান শুনিতে রাজি আছি, কিন্তু রাজনীতি তো কবিত্ব নহে। রবীন্দ্রনিন্দা বা তাঁহার মহিমা খর্ব করিবার চেষ্টা প্রত্যেক রবীন্দ্রভক্তেরই অসহ্য, পূর্ববঙ্গবাসীর অসহিষ্ণুতা আবার সর্বদাই একটু সক্রিয় ও প্রবল আকার ধারণ করিয়া থাকে। আমি নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের একটি চমৎকার লেখা অংশত অনুবাদ করিয়া, এবং রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনাড়ী বলিয়া ধরা যে কত বড় মূঢ়তা এই সম্বন্ধে নিজস্ব লম্বা ভূমিকা দিয়া Sir Rabindranath and Politics নাম দিয়া একটা লেখা পত্রের আকারে 'স্টেট্স্ম্যান'-এ প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। স্টেট্স্ম্যানের' সম্পাদক উহা মহা সমাদরে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংলগ্ন করিয়া ৭ই অক্টোবর রবিবার ১৯১৭ তারিখের কাগজে প্রায় পুরা দুই কলমে ছাপিলেন।...সম্পাদকীয়ের পার্শ্বে মুদ্রিত এই দীর্ঘ এবং বেশ গরম প্রবন্ধ ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলির রবীন্দ্র-পরিহাসের সুর থামাইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। কারণ, ইহার পরে আর ঐ রকম রবীন্দ্র-তাচ্ছিল্যের সুর নজরে পড়ে নাই। A well-wisher of

the Empire ছদ্মনামীয় লেখাটি খবরের কাগজে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক দৈনিক কাগজে সম্পাদকীয়ভাবে লেখা হইল, রবীন্দ্রনাথের কোন শত্রু তাঁহার লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রবন্ধ বাহির হওয়ার কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঢাকা-সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন। লক্ষ্মীবাজারে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাসায় তিনি উঠিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তথায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বেশ এক মজলিস বসিল, তথায় কথাপ্রসঙ্গে এই প্রবন্ধের কথা উঠিল। দেশবন্ধু বলিলেন, এমন জোরদার লেখা জাষ্টিস্ উডরফের বলিয়াই বোধ হয়। নানা জনে নানা মন্তব্য করিলেন; মজলিস ভাঙিলে সকলে উঠিয়া পড়িলাম, দেশবন্ধুর জামাতা সুধীরবাবুকে কানে কানে বলিয়া আসিলাম, দাশ মহাশয়কে বলিবেন লেখাটি এই অধমের। পরের দিন দেখা হইলে দেশবন্ধু সম্ভবতঃ অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কিছু মনে নাই।'

এতো গেল রাজনীতির কথা। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিও ছিলেন না, কেবল রাজনীতির পণ্ডিত, নেতা বা কর্মী মাত্রও ছিলেন না! পুরোপুরি ভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নেতৃত্বের খবর আছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায়। 'শব্দকথা'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখে গেছেন :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তোলেন, টুকটুকে শব্দটি নিশ্চয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ। যাহা টুকটুক ধ্বনি করে, তাহাই টুকটুকে। কিন্তু যে দ্রব্য রাঙা টুকটুকে, তাহা ত কোনরূপ টুকটুক শব্দ করে না ;— তবে তাহাকে টুকটুকে বিশেষণ দিই কেন? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'টক টক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে লাল অত্যন্ত কড়া লাল, সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাত ক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ অমাদের মনে উহ্য হইয়া থাকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী—আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না।'……

রমেন্দ্রসুন্দরই বলেছিলেন :

'বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সেই সেই নিয়মের আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে সুধীজনকে এই কার্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র।……ব্যাকরণশাস্ত্র নির্মাণের এখনও সময় হয় নাই, কিন্তু উপাদান সংগ্রহের সময় হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এখনই সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ আশা করেন না; সাহিত্য-পরিষদের কোন বর্তমান বা ভাবী সদস্য যদি নক্সাটা প্রস্তুত করিতে পারেন বা অট্টালিকার ভগ্নাংশ গড়িয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব ধন্য হইবে। উপাদান-সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষদের সাধ্য। কেন না, উপাদান মজুরের কাজ; ইহাতে কেবল পরিশ্রম আবশ্যক। সংগৃহীত উপাদানগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিবার বুদ্ধিটুকু দরকার, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে যিনি ব্যাকরণ রচনা-কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে যেন মশলা খুঁজিয়া লইতেই দিনক্ষেপ না করিতে হয়।……

'রবীন্দ্রনাথ সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং মজুরের কাজে যদি কেহ অপমান বোধ করেন, এই কর্মকে হেয় কার্য জ্ঞান করেন, সেই আশঙ্কায় স্বয়ং মজুরের কাজ গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি ধন্য, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্য সাহিত্য-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ।……'

তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের এই কথাগুলির সঙ্গে 'শব্দকথা' বইখানিরই আর-একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। 'বাঙ্গলার প্রথম রসায়নগ্রন্থ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

'কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার পুস্তকালয় হইতে একখানি রসায়নগ্রন্থ আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন! গ্রন্থখানির সহিত বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সম্বন্ধ আছে দেখিয়া উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ কর্তব্য বোধ করিলাম।…'

আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর এবং ভিন্ন জাতের লেখার খবর দিয়েছেন ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য :

'ডাক্তারি পাস করবার পরে কিছুকালের জন্য আমার কাজের অবসর ঘটল। তাই শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বোলপুরে আমার কাছে এখন থাকবে চল, তোমার গান শেখবার সুবিধা হবে। প্রায় দুমাস তাঁর কাছে গিয়ে থাকলাম, এই দু' মাস তিনি আমাকে আনন্দে ভরিয়ে রাখলেন। দীনুবাবুকে আমায় গান শেখাতে বলে দিলেন, প্রত্যহ নতুন নতুন গান শিখতাম। আর প্রত্যহ দুবেলা যেতাম রবীন্দ্রনাথের কাছে, কত রকমের হাস্য-পরিহাস এবং আলাপ আলোচনা তিনি করতেন আমার সঙ্গে।······

'একদিন কথায় কথায় বললেন, ডাক্তারী বিদ্যায় যা তুমি শিখলে, বাংলায় সেসব কথা লেখনা কেন : দেশের তাতে উপকার হবে। আমি বললাম, তা কি কখনও হয়? ডাক্তারী বিজ্ঞানের শক্ত শক্ত কথা কি আমাদের বাংলা কথায় লেখা যায়······রবীন্দ্রনাথ বললেন, নিশ্চয়ই লেখা যায় এবং লেখা উচিত।'

জীবনের নানা দিকের অনুসন্ধানে ক্লান্তি ছিল না তাঁর। অসীম উৎসাহ, অশেষ অধ্যবসায়, পরমাশ্চর্য আশাবাদ এবং পরমার্থে প্রত্যয়—এই ছিল রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। তাঁর ভ্রমণ দেশে দেশে, দিকে দিকে,—অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে! তাঁর গানে সাংসারিক দশকর্মের আনুকূল্যও ঘটেছে, আবার আকুল হয়ে গানের ছত্রে-ছত্রেই তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে-মন নিয়েছ
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ ॥

বোধ হয়, গানেতেই সর্বাধিক নিশ্চিতভাবে তাঁকে পাওয়া যায়। মনে পড়ে সেই আত্মোদ্ঘাটনের ভাষা আর ছন্দ :

যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।
গগনে তব বিমল নীল, হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে ॥

তাঁর সকল কর্মে, সকল রচনায় সেই ধ্রুবপদের ঝংকার ছিল সুনিশ্চিত। 'তপোবন' থেকেই ভারতবর্ষের সভ্যতা নেমে এসেছে—এ তাঁরই দৃষ্টি,—

তাঁরই উপলব্ধি! তিনি বার বার স্মরণ করেছেন ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন ঋষিবাক্য :

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

'যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।'

রবি-রশ্মির আলোতে উত্তাপে তাই তো শতদলের বিকাশ সম্ভব হয়। 'রবি-রশ্মি,' 'রবীন্দ্রায়ণ', 'রবীন্দ্র-চর্চা' এবং আরো বহু নামে—মহাকবির এই প্রথম জন্ম-শতবার্ষিকীতে মানুষের মনে দেশে দেশে আজ সেই ভাবনাই ভাবা হচ্ছে। আর, সেই ভাবনাসূত্রেই পুনর্বার মনে পড়ে তাঁর আপন-কথা :

'আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য, নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য।......রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।'

হরিপ্রসাদ মিত্র

জ্যোতির্বন্যা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মানুষের ইতিহাস
লোভ হিংসা গ্লানিতে পঙ্কিল
ক্ষুব্ধ স্রোতে বয় নিরুদ্দেশ
যুগ থেকে ব্যর্থ যুগান্তরে,
কখনো আবর্তে বন্দী
কখনো বা সহসা প্রপ্রাতে
ঝাঁপ দিয়ে শূন্যতার অপঘাত-ই বরে।

তারই মাঝে মহালগ্নে কোনো
অকস্মাৎ আকাশ ভাস্বর,
জ্যোতির্বন্যা ধরণী ভাসায়।
প্রাণের আকুল তৃষা
শুদ্ধ মুক্ত সে আলোক-স্নানে
পেতে পারে সিন্ধু-সত্তা
খুঁজিছে যা অন্ধ হতাশায়।

সেই জ্যোতির্বন্যা তুমি
হে রবীন্দ্র মহাকাশ-দূত,
এনেছ অমৃত বার্তা
যার লাগি চির পিপাসিত
মৃত্যুমগ্ন মাটির বুদ্বুদ।

পৃথিবী পবিত্র হবে?
ইতিহাস খুঁজে পাবে পথ?
সাড়া দেবে শঙ্খনাদে
বাজায় যা মূর্তমুক্তি ভবিষ্যের প্রাণ ভগীরথ!

রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন-প্রসঙ্গ

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের ছাত্রাবস্থায় একটা কথা শুনে এসেছি,—বাংলাদেশে everybody who is anybody সে-ই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। উক্তিটা নিশ্চয় এখনও চালু আছে, আর এখনও বোধ হয় কথাটা বিপরীত ভাবেও সত্য ধরে নিয়ে সে-কলেজের ছাত্ররা মনে করে তাদের প্রত্যেকেই এক-একজন জাঁদরেল হবে।

অন্য কলেজের ছাত্ররা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে ওই উক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা জানায় যে ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এখানকার ছাত্ররা একেবারে মুষড়ে পড়ে যখন প্রতিপক্ষ রবীন্দ্রনাথের নজির আনে। রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ ব্যক্তি, একথা মানতেই হবে, আর যিনি শৈশবেই স্কুল খতম করেছিলেন, তাঁর পক্ষে কলেজে পড়ার কথা ওঠে না। এত বড়ো ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে মুল নিয়মটাকে আর নিয়ম বলা চলে না। ওটা অগ্রাহ্য।

কিন্তু তিনি আদৌ ব্যতিক্রম নন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের-ই ছাত্র ছিলেন।

কিন্তু কি ক'রে তা হবে? তিনি তো এণ্ট্রান্স পাশ করেন নি! সেই কথাই বলি।

এখন যেমন একটা লাইন টেনে দিয়ে বলা হয় এত নম্বরের নিচে আর ভর্তি করা হবে না, তখন সেরকম ছিল না। ঘর খালি পড়ে থাকত, দু-একজন external student নেওয়া হোতো। বর্ধিষ্ণু-ঘরের লোক, যাঁদের ছেলেরা ঘরে পড়াশুনা করেছে বা আদৌ করেনি, তাঁরা ওই ছেলেদের কিছুটা বিদ্যা, কতকটা সহবৎ শেখার জন্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠাতেন। এই রকম ছাত্রদের পুরা বেতন দিতে হোতো, কলেজের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হোতো। কলেজের পরীক্ষা দিতে হোতো না।

এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ একদিন এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কতদিন

এখানে পড়েছিলেন? আমাদের তদানীন্তন দাদাদের কথা স্মরণ ক'রে লজ্জা পেতে হচ্ছে।* রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা উদ্ধৃত করি:

'কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গ ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল, যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম।'

তার্কিক বলবে, ওই এক দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি যা নিয়ে গেলেন, সারা জীবন তা উজাড় ক'রে দিয়ে গেছেন। সে কথা থাক, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এলেন, চলে গেলেন, নিয়ে গেলেন না কিছুই; তবে পরিণতজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু। প্রেসিডেন্সি কলেজের নিমন্ত্রণে তিনি কয়েকবার কলেজে এসেছেন, অনেক কথা বলে গিয়েছেন। আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সঙ্গে কোনো ইউরোপীয় অধ্যাপকের একদিন একটা যে দুঃখময় ব্যাপার ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন, আজকের দিনেও তা অনুধাবনযোগ্য। তাঁর সে কথাগুলিও উদ্ধৃত করি:

'বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল, একথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে, সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংস্রবের জোর তার পরে যতটা খাটে, এমন আর কোনো সময়েই নয়।'

---

*অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য নিজেও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং পরে শিক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে এ-মন্তব্য।—সম্পাদক।

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশ-বেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই জন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে উর্ধ্বের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন।'

রবীন্দ্রনাথ মানুষটি কেমন ছিলেন

শ্রীসুকুমার সেন

শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে কতটা আকীর্ণ হয়ে থাকেন? কবি তাঁর রচনার মধ্যে কতটা আর কিভাবে প্রতিবিম্বিত হন? এ প্রশ্নের একটা উত্তর রবীন্দ্রনাথ হাল্‌কা ও গম্ভীর দু ভাবেই দিয়েছেন।

'কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো⋯'

'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'

অর্থাৎ রচনায় কবি-মানুষটি প্রতিবিম্বিত নয় এবং কবি-মানুষের সাধারণ জীবন-কর্মে তাঁর কবিসত্তার প্রতিফলন আশা করা যায় না।

পুরোপুরি না হলেও এ কথা সত্য।

যে-মানুষের সংবেদনা আছে, যেমন কবি-শিল্পী, তাঁরা জলে-স্থলে অথবা আকাশে-জলে কিংবা স্থলে-আকাশে বিচরণকারী উভচর প্রাণীর মতো একই সঙ্গে দুই লোকে অধিষ্ঠান করতে পারেন। এক লোক কল্পনার, ভাবের অর্থাৎ অতিমর্ত্য ভূমির, আর এক লোক প্রতিদিনের জীবনধারণের, সংসারের ও সমাজের,—অর্থাৎ মর্ত্য ভূমির। প্রথম লোকে কবি-শিল্পী একা ও একাকী। দ্বিতীয় লোকে তিনি পাঁচজনের একজন, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। (তাঁর প্রতিভার ও মানসিক শক্তির কথা এখানে উঠ্‌বে না। সে বস্তুতে কবি-শিল্পী সাধারণ মানুষ নন।) কবি কাব্যের মধ্যে, শিল্পী শিল্পের মধ্যে যেটুকু ধরা দেন সেটুকুতে তাঁর অতিমর্ত্য ভূমির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। সে প্রকাশে তাঁর মর্ত্য ভূমির সত্তার ছায়া থাকতে পারে, অংশ থাকতে পারে। তার বেশি কিছু থাকে না। এমন কি তাঁর কল্পনা-ভাব সত্তার সামগ্রিক প্রকাশও থাকে না, থাকতে পারে না। কেননা সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টা বড়। একটু কিছু সৃষ্টি করতে গেলে অনেকখানি আয়োজন করতে হয়। সৃষ্টি সম্পূর্ণ হলে দেখা যায় যে তাতে সে আয়োজনের মোটা অংশ বাদ পড়েছে। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে এই ভাবটিই জগৎসৃষ্টির প্রসঙ্গে সেকালের ছাঁদে ব্যক্ত হয়েছে।

'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌'

'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'।

সুতরাং কবি-শিল্পী ব্যক্তিটিকে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় নিরীক্ষণ করতে গেলে তাঁর কাব্য-শিল্প থেকে তাঁকে যতটা সম্ভব সরিয়ে আনতে হবে। এ কাজ ভারি কঠিন। কবি-শিল্পী যদি দূর কালের মানুষ হন তবে তা অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। আর যদি নিকট কালের মানুষ হন তবে অন্য রকমের বাধা পাই। তাঁর পক্ষে অথবা বিপক্ষে পক্ষপাতিত্ব বাদ দেওয়া কঠিন এবং সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে যথা-সম্ভব বাইরে এনে দেখা আরও কঠিন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ কাজ তো অত্যন্ত দুরূহ। কেননা তাঁর মানুষ-জীবন শিল্পিজীবনের সোপান নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন অনেকটাই তাঁর নিজের সৃষ্টির দ্বারা পুষ্ট। এখানে রবির সঙ্গে রবীন্দ্রের তুলনা চলে। তেজ থেকে তফাৎ করে সূর্যকে খালি চোখে দেখা যায় না। তবে কালিলাগা কাঁচ দিয়ে দেখা যায়, দূরবীণে ছবিও তোলা যায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট কালের, প্রায় উপস্থিত কালের মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে খাঁটি খবর সবই জানা আছে এবং এখনও তাঁকে নিয়ে legend তৈরির কারখানা বড়ো করে ফাঁদা হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সৃষ্ট শিল্পের জ্যোতিঃক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখা অসম্ভব নয়। সে দেখার আবশ্যকতা ও মূল্য আছে। আবশ্যকতা খুব জরুরি মনে করি।

ইংরেজি করে বলতে গেলে যা Rabindra-craze, অর্থাৎ রবীন্দ্র-মাতনি, তা অকস্মাৎ ফেটে বেরিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। (যাঁরা সেদিনে কলকাতায় ছিলেন এবং তাঁর দেহ নিয়ে কাণ্ডকারখানা দেখেছিলেন তাঁরা বুঝবেন।) তারপর দাঁড়ালো দুটি নতুন মহোৎসবের দিন—২৫ বৈশাখ ও ২২ শ্রাবণ। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অভাবে ২২ শ্রাবণের মহোৎসব জমল না। ২৫ বৈশাখ দিন দিন জমজমাট হচ্ছে। (আশা ও আশঙ্কা করি যে এই অভিনব বাসন্তীপূজা শারদীয় সর্বজনীন ও কুলচরিত দুর্গোৎসবকে ক্রমশ ম্লান থেকে ম্লানতর করতে থাকবে।) তার পরে এই শুভ জন্মশতাব্দের দিন। এই যে রবীন্দ্র-পূজা চলছে, একে আমি নিন্দা বা কটাক্ষ করছি না। এর উপযোগিতা আছে। কিন্তু সে উপযোগিতাটুকু অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে ও গতানুগতিকতায় তলিয়ে গেছে।

ভারতবর্ষীয় মানসপ্রকৃতির একটা বিশিষ্টতা এই যে, আমরা ভাবকে রূপে না দেখলে স্বস্তি পাই না, আশ্বস্ত হই না। আমরা সৃষ্টিশক্তিকে মানুষের প্রতিরূপ দেবতা বানিয়ে পূজা করি এবং মানুষের মধ্যে যাঁরা মহৎ (—আমাদের ভাষায় ইংরেজি great manএর প্রতিশব্দ নেই; বড়লোক ও মহাপুরুষ অন্য জিনিস;

রবীন্দ্রনাথ মহামানব শব্দ তৈরি করেছিলেন বটে কিন্তু বিভিন্ন অর্থে—**great man** এবং **mankind** বা **humanity**)—তাঁদের আমরা দেবতা ক'রে মনের শিকেয় তুলে রেখে ফুল জল নৈবেদ্য দিয়ে তার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে যাই! রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই ব্যাপার চলছে। রবীন্দ্রনাথ তেত্রিশ কোটির বোধ করি কনিষ্ঠতম সংযোজন। তবে বর্তমান ক্ষণে তিনিই উজ্জ্বলতম দেবতা। (এ যা বললুম এ আমার নিজের মত। রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তীর কোন উদ্যোগকে ও উদ্যোক্তাকে আমি কিছুমাত্র দোষী করছি না। আমি নিজেও এ ব্যাপারে জড়িত আছি। মনে রাখবেন, আমার এই আলোচনায় উত্তমপুরুষ সর্বনামের একবচনকে বাদ দিই নি।)

এখন আমার মূল বক্তব্যে আসা যাক।

বৃহৎ সংসারে ঘরভরা বড়ো-ছোটো ছেলেমেয়ে। অথচ রবীন্দ্রনাথ শৈশবে নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই নিঃসঙ্গতা তাঁর মনের মধ্যে ব'সে গিয়েছিল। কৈশোরে তিনি বড়োদের বৈঠকে সাহিত্য-সঙ্গীতের আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, যৌবনে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, গীত-অভিনয়ে, সভাসমিতিতে, বৈষয়িক ও সাংসারিক কাজকর্মে মন ঢেলে দিয়েছেন। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁর নির্জন অবসর সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে এসেছে, তখন তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, পৃথিবীর এক কোণ থেকে আর এক কোণে গতায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁর নিঃসঙ্গতা সর্বদা অটুট ছিল। নিঃসঙ্গতা তাঁর আরক্ষ বাতাবরণের মতো ছিল—সেই নিঃসঙ্গতা তাঁর শক্তিকে অকাজে বিকীর্ণ হতে দেয়নি। নিঃসঙ্গ ব'লে রবীন্দ্রনাথ অমিশুক ছিলেন না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেশবার জন্যে তিনি উৎসুক হয়ে থাকতেন। অথচ আমরা জানি কারো সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার কারণ, তিনি সর্বদা গা ঢেলে দিয়ে আড্ডা দিতে পারতেন না, বন্ধুত্বের খাতিরে আবদারকে প্রশ্রয় দিতে পারতেন না এবং যা অন্যায় ও অসত্য বলে মানতেন, তা কোন বন্ধুর খাতিরে বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমাদের দেশে আমরা গায়ে না পড়ে একটু আল্‌গা থেকে বন্ধুত্ব করতে পারি না। আমরা হৃদয়ের অংশ একটু বেশি পরিমাণে ঢেলে দিই আর আত্মীয়তা করতে গিয়ে মাত্রা হারাই। রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতায় এ সহ্য হত না। ছেলেবেলা থেকে তিনি মুখচোরা ও লাজুক। তাই কারো সঙ্গে বাদবিবাদ করতেন না, আপনি সরে পড়তেন। তবে তিনি কখনো কারো উপর অবিচার করেননি, উপরন্তু সকলকেই প্রাপ্যের

বেশি দিয়েছেন। আপনারা সকলেই রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও চিঠিপত্র পড়েছেন, আশা করি। সুতরাং উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। (এবং উপস্থিত আলোচনায় অবাঞ্ছনীয়ও বটে।) রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতা ও নিঃস্পৃহতাকে তাঁর কোন কোন সহযোগী ও সমালোচক আভিজাত্যের দাম্ভিকতা বলে ভুল বুঝে তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলেন।

কিন্তু যেখানে কর্তব্যের রাশ তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল সেখানে তিনি অন্যায়ের প্রতি বজ্রপাণি। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পরিচালনায় তার পরিচয় বারবার পাওয়া গিয়েছিল। অসত্যের ও অন্যায়ের সঙ্গে কিছুতেই তিনি আপোস করেন নি। হয়ত অনবধানে অসর্কতায় অথবা ক্ষণিক দুর্বলতার বশে কখনো কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে উদ্যত হন নি,—এই আশঙ্কা তাঁর মনে শেষ পর্যন্ত জাগরূক ছিল। তাই মৃত্যুর দেড় বছর আগে লেখা একটি কবিতায় জীবনের হিসাব-নিকাশে সে কথা উল্লেখ করেছেন।

'বারবার আত্মপরাভব কত
দিয়ে গেছে মেরুদণ্ড করি নত ;
কদর্যের আক্রমণ ফিরে ফিরে
দিগন্ত গ্লানিতে দিল ঘিরে।
মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,
ছুটিনি করিতে প্রতিকার—
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।'

ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ পরিশ্রমী ছিলেন। ইস্কুলে পড়া তাঁর ধাতে সয়নি। পরীক্ষা পাশে তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না, বরং নিরুৎসাহ ছিল। যে বয়সে ছেলেরা পরীক্ষা পাশের জন্যে আগ্রহশীল হয়, সে বয়সে, অর্থাৎ কিশোরকালে—তাঁর মন পড়েছিল সাহিত্য ও সঙ্গীতে। তবে ইস্কুলের পড়া বন্ধ হলেও ঘরে পড়ার জোর কমেনি। যে সব বিষয় তখন কোনকালেই ইস্কুল-পাঠ্য ছিল না, সে সব বিষয়েও তিনি গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ নিতে লাগলেন কিংবা নিজে নিজেই পড়তে লাগলেন।

বাংলা ভাষার অধ্যয়নে ও অনুশীলনে তিনি যে বাল্যকাল থেকে কী পরিশ্রম করেছিলেন তা আমি একটি প্রবন্ধে বলেছি। আসল কথা, ইস্কুল পালানো ছেলে হয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়স পর্যন্ত জ্ঞান আহরণের জন্যে, কৌতূহল মেটাবার

জন্যে যে পরিমাণ অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করেছিলেন তা আমাদের দেশে খুব অল্পসংখ্যক জিজ্ঞাসু পণ্ডিতই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্ফুরণ তাঁর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর যথেষ্ট নির্ভর করেছিল। একথা মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে একটা অত্যন্ত বড়ো কথা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সে হ'ল এই যে, জীবনের শেষ নেই। অর্থাৎ প্রবাহরূপে জীবজীবন নিত্য। মানুষের কোন স্বর্গ নেই, কোন চরিতার্থতায় মানবজীবন পর্যবসিত হয় না। মানুষের স্বর্গলাভ, তার চরিতার্থতা—তার উদ্যমে, জীবনের তরঙ্গভঙ্গে দোল খেতে খেতে তার আত্মবোধের আনন্দসংবেদনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-ভাবনায় এই যে ভাবগভীর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এ কিছু অদ্ভুত বা উৎকট ব্যাপার নয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন বলেছিলেন

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন

তখন তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন যে জয় পরাজয় কিছু নয়, রণক্ষেত্রে নামলে সংগ্রামই বীরের কাজ এবং সেই কাজের সম্পাদনেই তার মোক্ষ, তার আনন্দ।

শারদোৎসবের উপনন্দ গীতার অর্জুনের মতো। সে যা কাজ বলে গ্রহণ করেছে, তার অনলস সম্পাদনের মধ্য দিয়েই ছুটির উল্লাস আর মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করেছে। ছুটির দিনে ছেলেরা দলবেঁধে স্ফূর্তি করতে বেরিয়েছে। উপনন্দকে তারা ডাক দিলে। সে বললে, আমি কাজ করছি। দলপতি সন্ন্যাসী বললেন, আজ তো কাজের দিন নয়। তুমি কি কাজ করছ ? উপনন্দ বললে, আমি পুঁথি লিখে গুরুর ঋণ শোধ করছি। শুনে ঠাকুরদাদা হায় হায় করে উঠল, সন্ন্যাসীকে বললে, শরৎকালের এমন প্রসন্ন প্রভাতে ছুটির দিনে 'ঐ ছেলেটি আজ ঋণ শোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায় ?' সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'বল কি, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে!...আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মত এমন শুভ্র ফুলটি কি আর কোথাও ফুটেছে; চেয়ে দেখ ত। লেখ, লেখ, বাবা, তুমি লেখ, আমি দেখি! তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখ্‌চ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্চ,—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা ত পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক!'

আধুনিক কালের বাঙালীর মধ্যে দুজনকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে উঁচু স্থান দিয়েছেন। একজন রাজা রামমোহন রায়, আর একজন বিদ্যাসাগর।

রামমোহনকে তিনি দেখেন নি। রামমোহনের জীবনকথা সবটা তাঁর জানাও ছিল না। তবুও রামমোহনের দৃষ্টির দূরপ্রসার এবং চিন্তার অগ্রসরতা তাঁকে সমসাময়িকদের মধ্যে অত্যন্ত বিশিষ্ট করে রেখেছে। যে সংসারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মানুষ-হওয়া, সে সংসারে ধর্মের যে হাওয়া বইত, সে হাওয়া উঠিয়েছিলেন রামমোহন। কিন্তু সে হাওয়া প্রবাহিত রেখেছিলেন কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগঠনে দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ খুব বেশি কাজ করেছিল। সে কথা রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি, এবং তার কারণ আছে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের যে প্রশংসা করেছেন তা খুবই ন্যায্য কিন্তু তার কিছু অংশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও প্রাপ্য।

বিদ্যাসাগর ছিলেন কাছের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেছিলেন। তাঁর জীবনকথা কিছুই তাঁর অজানা ছিলনা। আধুনিক কালের বাঙালীর মধ্যে (এবং ভারতীয়ের মধ্যে) বিদ্যাসাগরের অনন্যতা রবীন্দ্রনাথই আমাদের কাছে পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগে বিদ্যাসাগরের চারিত্র্যমূল্য ও তাঁর কৃতিত্ব কেউ সম্পূর্ণভাবে ও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে যে বুঝতে পেরেছিলেন, তার কারণ, তাঁর নিজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কিছু মিল ছিল। দু'জনের মধ্যে যে অমিলও যথেষ্ট, তা বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিলটুকু যে গভীর, তা আমরা লক্ষ্য করিনি।

সাহিত্যশিল্পী হিসাবে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের মিল গদ্য লেখায়। বাংলা গদ্যের ভিত গড়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তার সৌধ বানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

চারিত্র্যের প্রকর্ষে দু জনে যে এক শতাব্দের দুটি কোটি। ১৮৯১ সালের আগের পঞ্চাশ বছরে বিদ্যাসাগর শ্রেষ্ঠ বাঙালী, পরের পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বাঙালী।

বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের মতোই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তিনি কখনো ইস্কুল পালাননি বটে, কিন্তু বাল্যজীবনে তাঁর খুব বেশি সঙ্গী-সাথী ছিল, এমন বোধ হয় না। বিদ্যাসাগরও অসত্য অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপোস করতেন না। সেইজন্যে তাঁর জীবনে অনেকবার বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে।

বিদ্যাসাগরের কর্মনিষ্ঠা ও পরিশ্রম অতুলনীয়। বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি ছিল, তা কেউ জানে না। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত কি, তা আমরা কতকটা অনুমান করতে পারি, কিন্তু তা প্রচলিত কোন ধর্মমতের মধ্যে পড়ে না।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আর এক বিষয়ে মিল আছে। সে কথা আগেই বলা উচিত ছিল। দুজনেই কালিদাসের ভক্ত, বিশেষ করে মেঘদূতের।

সর্ব শেষে এই কথাটিই বলব যে রবীন্দ্রনাথ শক্ত সমর্থ চৌকস মানুষ ছিলেন, যেমনটি বিদ্যাসাগর ছাড়া আর জানা খ্যাত বাঙালীর সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা যায় না॥

রবীন্দ্রনাথ ও মুক্তি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের মানবতার ধারণার সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে যে অমরত্বের বিশ্বাস তাহারই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে মানবতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত তাঁহার মুক্তির বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের বিশ্বাসের সহিত তাঁহার মুক্তির বিশ্বাসও একই অদ্বয়বোধ হইতে জাত; কিন্তু এই মুক্তির বিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার অদ্বয়বোধ কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তাহাই লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টির সহিত জীবনের যে সাধনার পথ তাঁহার সহজাত প্রেরণায় তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহার ভিতরেই বেশ দেখা যায়, নিবৃত্তির পথ তাঁহার সাধনপথ নহে। সত্য-দর্শনের জন্য তিনি যে অহং ত্যাগ ও প্রাত্যহিকতার আবরণ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন তাহা শুধু একের বোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য; কিন্তু একের বোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে এই রূপের জগতে—সীমার জগতে—আনন্দ লীলার জগতে। চেষ্টা করিতে হইবে ইহার সব কিছুর ভিতর দিয়াই সেই একের স্পর্শ লাভ করিতে। সকলের ভিতর দিয়াই এই একের স্পর্শলাভের কবির এই যে বাসনা, তাহা তাঁহার জীবনে দুইটি ধারা গ্রহণ করিয়াছে,—একটি হইল সৌন্দর্যসাধনার মুক্তি, অপরটি হইল প্রেমসাধনার মুক্তি। উভয়ে পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী নহে, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রাণের প্রথম যাত্রাক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রাণের চরম প্রকাশ ঘটিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্যে; কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের বিকাশ এই সৌন্দর্যেই থামিয়া আছে—তাহার নূতন যাত্রা চলিয়াছে মানুষের মধ্যে—সেখানে সৌন্দর্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অনন্ত প্রেমে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই দুই দিকেই। সৌন্দর্যের ভিতর বিশ্বপ্রাণের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া—আবার প্রেমের ভিতর দিয়া নিখিল মানবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া। বহুদিন কবি নিজের মধ্যে এই

সৌন্দর্যের এবং প্রেমের একটি দোটানা অনুভব করিয়াছেন। সৌন্দর্যের আহ্বান তাঁহাকে অনেকখানি যেন মানববিমুখী করিয়া অশেষ আকর্ষণে প্রকৃতির দিকেই টানিয়া লইতে চাহিয়াছে,—আবার মানবের আহ্বানকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—প্রেমের প্রেরণায় 'সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'কেও অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া বিচিত্র লীলাময়ী অনন্ত রহস্যময়ী এক মোহিনীর যে সর্বনাশা আহ্বান, তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির 'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী'তে, 'গীতিমাল্যে'র 'বিদেশিনী' কবিতার মধ্যে, 'পূরবী'র লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়, 'বিচিত্রিতা'র 'ছায়াসঙ্গিনী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে এই রহস্যাবগুণ্ঠিতা নাম্নী যে তাহার চরম আকর্ষণে কবির সবটুকু হৃদয়কেই অধিকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বিশ্বসংসার হইতে তাঁহাকে একান্ত সুদূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহিয়াছিল—কবিও যে ক্ষণে ক্ষণে বিবাগী হইয়া তাহারই হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার মদির স্মৃতি শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে ব্যাকুল এবং উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে। জীবনে মানুষ যে-নারীর আকর্ষণে মত্ত হইয়া সব কিছু হইতে দূরে সরিয়া একমাত্র তাহারই রূপে হৃদয় ভরিতে চাহে, তাহার রূপকেই প্রেমে পরিণতি দান করিয়া তাহাকে আবার সংসারের মধ্যে লইয়া আসে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার এই অনন্ত সৌন্দর্য-পিপাসাকে ক্রমে ক্রমে সংসারের মধ্যে—কর্মময় জীবনের মধ্যেই সাদরে বরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টারই বাস্তব রূপ তাঁহার শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের এই ভিন্নমুখী টান একটি অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিল, এই সামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথের জীবনেরই গভীর সামঞ্জস্য, ইহার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য ও প্রেম তাঁহার জীবনে একটা একমুখী গতি লাভ করিল। সৌন্দর্যের আকর্ষণের মধ্যে যে সর্বদা একটা ঘর-পালানো ভাব ছিল তাহা পরিবর্তিত হইল ঘরের মধ্যেই সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায়—অর্থাৎ মানুষকে বাদ দিয়া সৌন্দর্য নয়, যতটা সম্ভব মানুষকে লইয়াই সৌন্দর্য।

এই যে সৌন্দর্য ও প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষ—এই উভয় জুড়িয়া অনন্ত মুক্তি। ইহারই আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ গান হইল 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'......। গানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে,

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মুক্তির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব উভয়কেই কিভাবে যুক্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে গানটির মধ্যে। গানটির প্রথম অংশে দেখিতে পাই—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ॥
দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে ॥

এই পর্যন্ত আসিয়াই শেষ হইলে ইহাকে ঘর-পালানো মুক্তি বলিতাম—অর্থাৎ মানুষকে ত্যাগ করিয়া শুধু প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি; কিন্তু গানটির পরের অর্ধে দেখিতে পাই—

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা,
আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা—
জীবন যেন সেই আহুতি মুক্তি-আশে ॥

এই দুই অর্ধ জুড়িয়া তবে তাঁহার অখণ্ড মুক্তি।

অনন্ত সৌন্দর্যপিপাসা এবং প্রেমপিপাসা লইয়াই রবীন্দ্রনাথ এক নূতন মুক্তির বাণী শুনাইলেন। আমরা সাধারণতঃ যতপ্রকার মুক্তির সহিত পরিচিত তাহা হইল এই তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া; কিন্তু তৃষ্ণাকে অনন্ত ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে হয়, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' এই কথাটাকেই সমগ্র জীবন ধরিয়া বলিতে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে।

এই যে 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদে'র কথা—এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-সাধনার সর্বাপেক্ষা বড় কথা। বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি কেন? রবীন্দ্রনাথের মতে সমগ্র সৃষ্টির বাণীই ত হইল এই এক বাণী। সৃষ্টি ত একদিকে পাকে পাকে বন্ধন—আবার সেই বন্ধনের ভিতর দিয়াই ত অনন্ত প্রকাশ—সেই অনন্ত প্রকাশেই অনন্ত মুক্তি। মুক্তির জন্যই ত বিধাতাপুরুষ এই সৃষ্টির বন্ধন গ্রহণ করিয়াছেন, 'আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে'। এই সৃষ্টির বন্ধন যদি গ্রহণ না করিতেন তবে আদিতে যিনি এক, তিনি ত অপ্রকাশে

আত্মচৈতন্যের অভাবে চিরকাল অসৎরূপে অবস্থান করিতেন। তিনি সৎ হইয়া উঠিবার জন্যই এক-স্বরূপতা ছাড়িয়া বহু হইলেন—এক অবর্ণ হইয়াও বহুধা শক্তিযোগে অনেক বর্ণকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সৃষ্টির অর্থই হইল আত্ম-সর্জন, আত্ম-ত্যাগ। নিজের মধ্যে যাহা কেবল সম্ভাবনারূপে নিহিত ছিল—অমূর্ত ছিল—তাহাকে রূপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে কেবলই মূর্তি দান করিয়া অনন্ত দেশে কালে ছড়াইয়া দেওয়া। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বিশ্বধাতার বিশ্বহোম, সমস্ত সৃষ্টিই হইল 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা', এ যজ্ঞে নিজেই নিজেকে শুধু আহুতি দিতেছেন রূপে রসে বর্ণে গন্ধে কেবলই আত্ম-সর্জন বা আত্ম-প্রকাশের ভিতর দিয়া; তাই এই যজ্ঞশালায় কেবল 'আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা'। এই আত্ম-ত্যাগের দ্বারাই ত আত্মবিকাশ। আত্ম-বিকাশেই ত সর্বাধিক আত্ম-উপলব্ধির আনন্দ—এই আনন্দই মুক্তির আনন্দ। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, মুক্তির বাণী তিনি কোনও শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিতে রাজি নন, মুক্তির বাণী তিনি গ্রহণ করিতে চান স্বয়ং নটরাজের নিকট হইতে।

আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
　　মহাকালের বিপুল নাচে।
দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
　　আপনাতে যার আপনি আছে।
যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি'
　　তারি নাচের প্রসাদ যাচে।

কবি তাহা হইলে নটরাজের নিকট হইতে এই দীক্ষা লাভ করিলেন, অনন্ত প্রকাশের ভিতর দিয়া নিজের সত্তায় নিহিত আছে যাহা কিছু সম্ভাবনা তাহাকে কেবল 'বাইরে ফেলা'তেই হইল মুক্তি। বন্ধনে বন্ধনে না জড়াইয়া ত প্রকাশ হয় না—বন্ধনের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশেই তাই মুক্তি।

শুনবি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ্ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে। [মুক্তিতত্ত্ব, নটরাজ]

'নটরাজ' ও তাঁহার 'ঋতুরঙ্গশালা'কেই কবি তাঁহার এই নূতন মুক্তিতত্ত্বের অভিনব শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন। বাহিরে বিশ্বজীবনের ভিতর দিয়া কেবলই প্রকাশের কেবলই মুক্তির বাণী মূর্ত হইয়া উঠিতেছে; এই মুক্তির লীলাকে যদি অন্তরে ধারণ করা যায় তবে মানুষের অন্তরও সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। এইজন্য 'নটরাজে'র সংক্ষিপ্ত প্রাক্-কথনে কবি বলিয়াছেন—

'নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বাহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকাশের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।'

'নটরাজে'র 'উদ্বোধন' কবিতাটিও এই মুক্তিতত্ত্বের নবসূক্ত; এখানেও কবির দীক্ষাগুরু নটরাজের নিকটেই প্রণতি—

নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের আসনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি;

ইহার পরেই প্রার্থনা—

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
... ...
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
... ...
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

নিরন্তর আত্ম-প্রকাশের নৃত্যচ্ছন্দে চঞ্চল নটরাজের এই নৃত্যচ্ছন্দটি হইল একটি জটিল ছন্দ, সে ছন্দে ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, জন্ম-মরণ সবই একটি বিরাট প্রবাহের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে। এইজন্যই কবি নটরাজের নৃত্যে যোগ দিবার উন্মুখতা লইয়া বার বার গাহিয়াছেন—'জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে'। ইহাকেই অন্যভাবে বলিয়াছেন, 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে'। দুই হাতের মন্দিরায় কখনো দুই সুর বাজে নাই, দুই মন্দিরার আঘাতে আঘাতে বাজিয়া ওঠে এক সুর—

তালে তালে সাঁঝ-সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই
ছন্দে নানান্ রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে—
হাসিকান্নার তান সেধে নে,

ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন
নাচন-সভার ডঙ্কাতে ॥

অন্য গানে বলিয়াছেন—

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে ॥
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥

নটরাজের এই অখণ্ড নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জন্ম ও মৃত্যুকে পরস্পরবিরোধী দুইটি গতি বলিয়া মনে হয় না, উভয় জুড়িয়া একই ছন্দ একই গতি—উভয়ে নিরন্তর আগাইয়া দিতেছে একই পথে—নিত্য নূতন সম্ভাবনায় প্রকাশের পথে। এই ভাবটিই একটি অপূর্ব উন্মাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে কবির 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে' গানটির মধ্যে। 'খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবার' যে আনন্দ তাহাও ত নিরন্তর 'পাগল-করা গানের তানে' ধাবমান প্রবাহে হইয়া উঠিবার আনন্দ। কবি একদিকে বলিতেছেন—

পাতিয়া কান শুনিস্ না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে।

এই 'জ্বলবার আনন্দ' কোথায়? আত্ম-প্রজ্বলনের মধ্য দিয়াই যে লিখিত হইবে আত্ম-জীবনের ইতিহাস—আবার সেই আত্ম-জীবনের অগ্নি-অক্ষরে লিখিত ইতিহাসেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে বিশ্বজীবনের যত ক্ষুদ্র হোক্ কোনও একটি প্রান্ত। আবার এই মরণবীণায় যে সুরের আনন্দ,—

সেই আনন্দ-চরণ-পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,

প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে— ।

ধরার বুকে এই যে ঋতুর নৃত্যে নৃত্যে বর্ণ-গীত-গন্ধের প্লাবন, এই প্লাবনের মধ্যে কিসের আনন্দ? এ আনন্দ জীবনের আনন্দ না মরণের আনন্দ? এ জীবনও বটে, মরণও বটে; কারণ জীবন ত কেবল আত্ম-প্রকাশ—আত্ম-ত্যাগ, তাহাকে জীবন না বলিয়া ত বলা যায়—'ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার, মরবারই আনন্দ'! সব ধারা একত্রিত করিয়া এই যে এক ছন্দ—এই ছন্দে যোগ দেওয়াতেই হইল মুক্তি। মুক্তির আশ্বাসে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই যোগের কথা কবি নৃত্যে যোগ দিবার রূপকল্পেও প্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গীতে যোগ দিবার রূপকল্পেও প্রকাশ করিয়াছেন। নৃত্য আর গীত যে এক সুরে এক তানেই বাঁধা। 'বিশ্বতানে'র মধ্যে যে 'ধ্রুবপদ' রহিয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে 'জীবনগানে'র সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে।

গগনে তব বিমল নীল
হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী
নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথ কূলে
যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর
নবীন আশা।
ফুলের মত সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন
মরিতে জানে।

এইখানেই একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। উপনিষদের একের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপলব্ধ একেকে যত করিয়াই মিলাইতে যান না কেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্ত এক কখনও নিশ্চল নিষ্ক্রিয় শান্ত সমাহিত এক নহেন,—রবীন্দ্রনাথের একের মধ্যে সর্বদাই একটা প্রাণ-প্রৈতি রহিয়াছে, সে এক নিত্য নৃত্যচঞ্চল নটরাজ। এই নটরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কবি এই যে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিলেন, চিত্তের ভিতর হইতে সর্বপ্রকারের আবরণ

সন্নাইয়া দিয়া নটরাজের এই নৃত্যলীলায় যোগ দিতে হইবে। এই যোগ কিরূপে সম্ভব? শুধু কি নিষ্ক্রিয় ভাবে লীলা দর্শন এবং লীলা আস্বাদন? কবি বলিবেন, নিষ্ক্রিয় দর্শনে এ-লীলার রহস্যে প্রবেশই করা যায় না, সৃষ্টিলীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে সৃষ্টির ভিতর দিয়াই। গুরু নটরাজ যেমন বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া নাচের খেলায় ভিতরকে কেবলই বাহিরে ফেলিতেছেন, শিষ্য কবিকেও তেমনই নিজের সৃষ্টির ভিতর দিয়া সুরে সুরে তালে তালে নিজেকে প্রকাশ করিয়া শতদলের মত একটু একটু করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা যে লীলা-রহস্যে প্রবেশ করিবার এবং নটরাজের নাচের খেলায় যোগ দিবার কোনও অধিকারই জন্মে না।

সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া, [পূরবী, মুক্তি]

কবি অনুভব করিয়াছেন সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের আভাস তখনই তাঁহার অন্তরে ধরা পড়িয়াছে যখন তাঁহার হৃদয়বীণাতে কোনও এক শুভ মুহূর্তে নামিয়া আসিয়াছে নটরাজের বিশ্ববীণার একটুকু সুর। হৃদয়ে যদি সেই সুর আসে—

তা হলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তানে তোমারে ভোলায়।
যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমার প্রাণের
আপন সংগীতে। [ঐ]

রবীন্দ্রনাথ এই যে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিলেন, এ মুক্তি একস্থানে যোগাসনে স্থিরবদ্ধ হইয়া লাভ করিবার নহে, 'চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে'; 'চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে', 'চঞ্চলের সর্বভোলা দানে' 'আঁধারে আলোকে, সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে' নিত্যকাল চলিতেছে যে মহাপথিক, তাহার আবার মন্দির, স্বর্গধাম, তীর্থ কোথায়? তাহার যে অবারিত দশদিক! মুক্তি কোথায়—এ-প্রশ্নের উত্তরে তাই কবি বলিবেন—

সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে যাওয়া কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ-ক্ষতি কান্না-হাসি,—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র; অস্ত সূর্য রক্তিম উত্তরী
তুলাইয়া চলে যায়, সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরি
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গনৃত্যচ্ছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে। [পরিশেষ, পান্থ]

'পরিশেষে'র 'মুক্তি' কবিতাটির ভিতরেও এই মুক্তির কথা বলিয়াছেন কবি। মুক্তির অর্থই হইল 'প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতন পীড়া হতে' মুক্ত হইয়া বিশ্বপ্রবাহের সহিত সহজযোগে যুক্ত হওয়া।

শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে-সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা 'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ,
আপনার সুন্দর সীমায়;—দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী'র সর্বত্রই রহিয়াছে এই মুক্তির বাণী। বনের তরুলতার ভিতর দিয়া এই মুক্তির বাণীকে কবি কি করিয়া লাভ করিয়াছেন 'বনবাণী'র ভূমিকায় কবি তাহা নিজেই চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

'ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলদেশে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।'

যে-কথা উচ্চারিত এই ভূমিকায়, ছন্দে ছন্দে প্রসারিত সেই কথা 'বনবাণী'র কবিতায় কবিতায়—বৃক্ষরোপণ উৎসবের গানগুলিতে। 'প্রান্তিকে'র ষষ্ঠ সংখ্যক কবিতাটির মধ্যেও দেখি এই মুক্তির কথা; এখানে মুক্তি-প্রার্থনা করিতেছেন কবি সেই সংসারের কাছেই যে সংসারকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইবার কথাই আমরা প্রায় সর্বত্র শুনিতে পাই মুক্তিবাদিগণের বাণীতে।

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, উর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎপ্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা-অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে; লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত।

এই জন্যই সংসারের কাছে কবির শেষ-প্রার্থনা—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও; পশ্চিমে যাবার মুখে

বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি ;…

জীবনের পাত্র রিক্ত করিয়া মুক্তি নয়—সংসারের অজস্র দাক্ষিণ্যে তাহাকে যত পূর্ণ করিয়া তোলা যায় ততই হইল কবির মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের এই যে মুক্তির বাসনা ইহা হইতে সর্বত্রই মানুষ একেবারে বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা বলিব না; বিশ্বপ্রকৃতি অনেক স্থলে মুখ্য হইয়া উঠিলেও অনেকস্থলে কবি যেখানে বিশ্বধারার কথা বলিয়াছেন, মানুষের জীবনধারা তাহার মধ্যেই বিধৃত; কবি যেখানে যেখানে বিশ্বসংসারের কথা বলিয়াছেন সেখানে তিনি মানুষের সুখদুঃখময় জীবনধারাকে লইয়াই সংসারের কথা বলিয়াছেন। কবি নটরাজের নৃত্যের কথা যেখানে বলিয়াছেন সেখানে সে নৃত্য ত শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে নয়—জগৎ ও জীবন উভয় জুড়িয়া এই নৃত্য। তথাপি এ-কথা মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে যেরূপ সৃষ্টিপ্রবাহে উদ্ভূত শ্রেষ্ঠধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, মুক্তির এই সকল বর্ণনার মধ্যে মানুষ তাহার সেই শ্রেষ্ঠধনের মূল্য লাভ করে নাই। কিন্তু কবির শেষ-যুগের লেখার মধ্যে মুক্তি-চিন্তাকে মানুষের দিকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখিতে পাই। সেখানে শুধু গানের সুরের সাহায্যে যোগের পন্থাই একমাত্র বা প্রধান হইয়া দেখা দেয় নাই, সেখানে কর্মযোগে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িবার কথা দেখা দিয়াছে। মানুষকে ত্যাগ করিয়া—সংসারের সকল প্রেমবন্ধনকে ত্যাগ করিয়া দেবতাকে যে লাভ করা যায় না, 'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতার মধ্যেই সে-কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা'—মায়াবাদীর দল বিজ্ঞ সাজিয়া ইহাকে 'ছেলেখেলা' বলিয়াছেন, কবি এই উপহাসের স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। 'গতি' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তিনি সুখদুঃখময় 'বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঙ্খলা'র রহস্যভেদ করিতে চাহেন না—

চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

'মুক্তি' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে!

পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্বমহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশ দিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।
ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন-হাসি আঁধার-আলোক,
বহে যাবে শূন্যপথে সকরুণ সুরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখ শোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ?

'আত্মসমর্পণ' কবিতায় দেখিতে পাই—

জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে

'চৈতালী'র বৈরাগ্য' কবিতাটি এই একই সুরে বাঁধা। গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী 'ইষ্টদেব লাগি', মায়ার ছলনা স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া, যখন বাহিরে যাত্রা করিলেন তখন—

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন 'হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়॥'

ইহা মানুষ সম্বন্ধে কবির একটি গভীর ভাবদৃষ্টিই ব্যঞ্জিত করে। 'কথা ও কাহিনী'র ভিতরকার 'দীন-দান' কবিতাটির মধ্যে যখন ভক্তের মুখে দেবতার জন্য স্বর্ণমন্দির নির্মাণকারী রাজার প্রতি নির্ভীক বাণী দেখিতে পাই—

সেদিন কহিলা ভগবান—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা মাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম ; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !' চলি গেলা সেইক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।

তখনও বুঝিতে পারি, ইহা ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে উচ্চারিত বাণী নহে, ইহা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবাহিত একটি গভীর ভাবধারারই অভিব্যক্তি। মানব-সেবা

অধ্যাত্ম-সাধনার অঙ্গমাত্র নয়, মানব-সেবাই যে অধ্যাত্ম-সাধনা সেই সত্যটিই এখানে বাণী-মূর্তি লাভ করিতে চাহিয়াছে। এই বোধেরই একটি ঘনীভূত এবং স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই 'গীতাঞ্জলি'র সেই প্রসিদ্ধ কবিতায়—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার 'পরে।

কর্মযোগের ভিতর দিয়া মানবতাবোধ যতই কবির নিকটে বাস্তব জীবনে সত্য হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাঁহার মুক্তির আদর্শও এই মানবতাবোধের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের মানবতা-বোধের বিকাশধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, মানুষ তাহার অপূর্ণতা সম্বন্ধে যত সচেতন হয় ততই তাহার মধ্যে একটি পূর্ণতার আদর্শ গড়িয়া উঠিতে থাকে; মহামানবতাকে লইয়া যে পূর্ণতার আদর্শ ইহাই মানুষের মহৎ জীবন-প্রেরণা, সকল সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি ওঠা-পড়াকে অতিক্রম করিয়া এই জীবন-প্রেরণা মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লয়। এই মহামানবতার পূর্ণতার মধ্যেই হইল মানুষের মহামুক্তি। 'পরিশেষে'র 'অপূর্ণ' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রি দিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে-মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

মহামানবতার পূর্ণতার আদর্শের মধ্যেই যে মানুষের মহামুক্তি রবীন্দ্রনাথের মনে এ-বাণী দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল কবির হিবার্ট বক্তৃতামালা 'The

Religion of Man' ভাষণে, আর, কমলা-বক্তৃতামালা 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে। সেই মহামানবকে নিজের মননের দ্বারা ও সৃষ্টির দ্বারা নিরন্তর জাগ্রত করিয়া তোলা—ব্যক্তিজীবনের মহৎ যাপন-প্রথা দ্বারা শাশ্বত মানুষের ভিতরকার এই মহামানবতাকে জাগ্রত বিকশিত করিয়া দেওয়া—নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা এই মহামানবের সহিত নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া লওয়া—ইহাই যে মানুষের মুক্তি—এ-কথা এই দুইটি ভাষণের মধ্যেই বারবার দৃঢ়প্রত্যয়ে উচ্চারিত হইয়াছে। মানব-সেবা যে শুধু মানব-সেবা নয়,—মানব সেবার মধ্যেই যে নিহিত মানুষের মহৎ অধ্যাত্ম-সাধনা কবির এই মুক্তির আদর্শ মানুষের মনে নূতন আশা ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। মানব-মুক্তির এই আদর্শের দ্বারা কবি বিশ্বমানবের মধ্যে আজ অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃত।

কবির এই যে মুক্তির আদর্শ ইহাকে কবি নানা প্রসঙ্গে উপনিষদের সঙ্গে নানাভাবে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যেটুকু মিল আমরা আবিষ্কার করিতে পারি না কেন তাহার সব সত্ত্বেও সৌন্দর্য ও প্রেমের মিলনে এই যে মুক্তির আদর্শ ইহা কবি-জীবনে উপনিষদেরই বিশেষ কোন বাণী বা ভাবধারারই একটা বিস্তারমাত্র এ কথা মনে করিলে আমরা ভুল করিব। এ-আদর্শ অনেকখানিই হইল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আদর্শ। তিনি কবি; জগৎ এবং জীবনের প্রতি তাঁহার অত্যন্তাসক্তি তাঁহার প্রকৃতিগত ধর্ম; আবার সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের প্রতি—অল্পকে তুচ্ছ করিয়া ভূমার প্রতি—যে তাঁহার আকর্ষণ ইহাকে তাঁহার একেবারে সহজাত প্রবৃত্তি বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি একটা সহজ পন্থায় নিজের মধ্যে এই দুইকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন—আজন্মের সেই চেষ্টাতেই বিবর্তিত কবির এই মুক্তির বাণী।

উপনিষদের মধ্যে মোহমুক্ত আবরণমুক্ত চিত্তে প্রকৃতির ভিতরেই সত্যের স্পর্শলাভ করিবার কথা কোথাও আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই—কোথাও আমরা আভাসে ইঙ্গিতে দেখিতে পাই। পরম সত্যের সহিত তাদাত্ম্যের দ্বারা সর্বভূতের সহিত নিজেকে এক করিয়া লইবার কথাও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সত্যের যে প্রকাশের রূপটা, শুধু তাহার ভিতর দিয়াই পরম সত্যকে ধরিতে এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে এ-কথা উপনিষদের নহে, রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর মধ্যে যেখানে এইজাতীয় কোনও একটু আভাস পাইয়াছেন, সেইখানেই নিজের জীবনবাণীর সমর্থন খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন

এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবন-প্রেরণাকে উপনিষদের বাণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে নূতন অর্থে বা ব্যঞ্জনায় গড়িয়া লইয়াছেন।

উপনিষদের ভিতরকার পরম এককে অনেক দার্শনিকই নেতিমার্গে গ্রহণ করিয়াছেন; যাঁহারা এরূপ করিয়াছেন তাঁহারা উপনিষদ্‌কে ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করিবার আগ্রহেই এরূপ করিয়াছেন তাহা বলিব না, তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাস এবং যুক্তি দ্বারা ধৃত বিশেষ একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই উপনিষদ্‌কে সম্পূর্ণ নেতিমার্গে গ্রহণ করিয়া পরম সত্যকে চিরনিশ্চল করিয়া রাখিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের আবার সবখানি মানসিক প্রবণতা পরম সত্যকে নটরাজ রূপ দান করিয়া তাহাকে চিরচঞ্চল করিয়া তোলা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আবার উপনিষদের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এই চিরচঞ্চলের রূপ; 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'কে যতটা পারেন এই চিরচঞ্চল নটরাজ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ-পথে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের সঙ্গে খুব বেশিদূর চলিতে পারেন নাই; এই 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'কে চিরচঞ্চল নটরাজ করিয়া তুলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের চেষ্টা অনেকখানি রবীন্দ্রনাথকে নিজের পথেই করিতে হইয়াছে।

লোক-সাহিত্য প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার পর এ'দেশের জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে এই জাতির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, অন্য কোন দেশে এই ভাবে জাতির সঙ্গে তাহার সাহিত্যের এই শ্রেণীর বিচ্ছেদ কোন দিনই ঘটিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। সেই জন্য প্রত্যেক জাতির সাহিত্য-চেতনার মধ্যেই ইহার লোক-সাহিত্যের ধারাটিও সক্রিয় বলিয়া অনুভব করা যায়। প্রত্যেক দেশে লোক-সাহিত্যই উচ্চতর সাহিত্য বা লিখিত সাহিত্যের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, বাংলা দেশে আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেই কেবল মাত্র ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এমন কি এ'দেশের মধ্য-যুগের সাহিত্যেও যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তবে তাহার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বৈষ্ণব কবিতাই হউক কিংবা মঙ্গলকাব্যই হউক, ইহাদের উভয়ের মধ্যেই বাঙ্গালীর লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ বিশেষ সক্রিয় রহিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা যে বাংলার লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের ভিত্তির উপর রচিত, এ'কথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটি মৌখিক প্রচলিত সাহিত্য-ধারার মধ্য দিয়াই যে মঙ্গলকাব্যেরও বিকাশ হইয়াছে, তাহাও সাধারণ ভাবেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইল, তাহার ভিত্তিমূলে বাংলার লোক-সাহিত্যের কোনও উপকরণেরই অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য রামায়ণ-মহাভারত কিংবা কোন কোন পুরাণ সে যুগের বাংলা কাব্য-রচনার ভিত্তি হইলেও এই সকল সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণের প্রেরণার সঙ্গেও বাঙ্গালীর সাধারণ জীবনের যোগ নিতান্ত নগণ্য ছিল, বিশেষতঃ সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ইহাদের ব্যবহার করা হইলেও ইহাদের মধ্য দিয়া যে চৈতন্য সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা দেশের ঐতিহ্য-নিরপেক্ষ ও কবির আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিক চেতনার ফল, —জাতীয় চৈতন্য-জাত নহে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং এই যুগের একজন কবি যদি তাঁহার একান্ত

রোমান্টিক কাব্য-সাধনার মধ্যেও এই দেশের জাতীয় রস-সম্পদের প্রতি কোন প্রকার কৌতূহল কিংবা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাও আমাদের আলোচনার বিষয়। কারণ, ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহার সম্পর্কে এই বিষয়টি আলোচনা-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক-সাহিত্যের বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিবার যে প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, সে যুগ কিংবা তাহার পরবর্তী কালেও বাংলাদেশের কোন অনুসন্ধানকারীর মধ্যেই তাহার কোন প্রভাব কার্যকরী হইতে পারে নাই। বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য লোক-সহিত্যের সংগ্রহ রেভাঃ লালবিহারী দের The Folk-tales of Bengal। ইহার বিষয়ে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহা দেশের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হইবার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ফলে ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে যে ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যখন দেশ-দেশান্তরের লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তখন পাশ্চাত্ত্য ভাষায় প্রত্যেক সংগ্রহেরই অনুবাদ প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূল পাঠটি ইহার নিজস্ব ভাষাতেও সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। মূল পাঠটি অন্ততঃ পড়িবার পক্ষে যাহাতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য সাধারণতঃ রোমান অক্ষরেই তাহা মুদ্রিত হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ সাঁওতাল উপকথার সংগ্রাহক রেভাঃ পি. ও. বোডিং এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে তাঁহার সংগৃহীত উপাদান ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক লোকশ্রুতি-বিষয়ক আলোচনা সম্ভব হইয়াছে। রেভাঃ লালবিহারী দে এই পথ অবলম্বন করেন নাই। এ'কথা সত্য যে বাংলা দেশের লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকগণ এই বিষয়ক কোন আন্তর্জাতিক নীতি অবলম্বন করিয়া কার্যে অগ্রসর হন নাই। ইহার প্রধান কারণ পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিৎ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ক যে গবেষণায় বহুকাল যাবৎই লিপ্ত আছেন, এ দেশের লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহকগণ তাহার কোন সংবাদ রাখিতেন না। রেভাঃ লালবিহারী দে যখন তাঁহার সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন বাংলা দেশে এই বিষয়ক কোন আলোচনারই সূত্রপাত হয় নাই, এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের আলোচনাসমূহ এ'দেশের সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজ-

লভ্য ছিল না। সুতরাং রেভাঃ দে কেবলমাত্র নিজের রসবোধের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার সংগ্রহকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এ' কথা সত্য যে, রেভাঃ দে তাঁহার সংগ্রহের মূল বাংলা রূপটি প্রকাশ না করিয়া ইহার একটি ইংরেজি অনুবাদমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ইংরেজি অনুবাদের মধ্যেও একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার ইংরেজি অনুবাদের ভিতর দিয়া মূল বাংলা রূপকথাগুলির রস যথা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। অবশ্য ইহা দ্বারা এই বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাঁহারা গবেষণা করিয়া থাকেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তথাপি ইহারও যে একটি রসগত আবেদন প্রকাশ পায় নাই, তাহা বলিবার উপায় নাই। যাঁহারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রূপকথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা রেভাঃ লালবিহারী দে'র বাংলা রূপকথা সংগ্রহকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

রেভাঃ দে তাঁহার সংগ্রহগুলি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিবার ফলে ইহার দ্বারা আরও কয়েকটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। যে যুগে এই সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হয়, সে যুগে ইংরেজি ভাষাই বাংলা দেশেরও শিক্ষিত সমাজের অনুশীলনের ভাষা ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে সে যুগে যখন বাংলা ভাষা নানা দিক দিয়া অবজ্ঞাত হইয়া ছিল, সেই যুগে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে এই সংগ্রহগুলি প্রকাশ না পাইলে সেদিন ইহাদের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইত না। কারণ, দেখা গেল রেভাঃ লালবিহারী দে'র সংগ্রহগুলি প্রকাশিত হইবার অল্পদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজেও এই বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের কেহ কেহ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার কার্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এ দেশে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ, প্রথম মিশনারী সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়তঃ ইংরেজ উচ্চ রাজকর্মচারী বা সিভিলিয়ন সম্প্রদায়। দেশীয় সংগ্রাহকদিগের সঙ্গে কোন প্রকার যোগ স্থাপন না করিয়াই স্বাধীনভাবে তাঁহারা এ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তবে মিশনারী সম্প্রদায়ের কার্যাবলী বাংলাদেশের অভ্যন্তর অপেক্ষা ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সক্রিয় ছিল; যে কয়জন উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারী বাংলা দেশের মধ্য হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন,

তাঁহাদের মধ্যে সিভিলিয়ন স্যার জর্জ গ্রীয়রসনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ইংরেজি অনুবাদসহ মাণিকচন্দ্র রাজার গানের মূল বাংলা সংগ্রহ দেবনাগরী হরপে যখন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তখন রেভাঃ লালবিহারী দে'রও কোনও সংগ্রহই প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যায়, বাংলা লোক-সাহিত্যের প্রথম সংগ্রহ একজন বিদেশী কর্তৃকই প্রকাশিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বাংলা লোক-সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ'কথাও সত্য যে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের কোন ধারা অনুসরণ করিয়া কিংবা এই দেশীয় তাঁহার পূর্ববর্তী কোন সংগ্রাহকের পথ অনুসরণ করিয়া তিনি এ'পথে অগ্রসর হন নাই। এই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব যে একটি চেতনা ছিল, কেবলমাত্র তাহাই সজাগ রাখিয়া তিনি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে আর একটি প্রধান কথা এই যে, তিনি বাংলার লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও আলোচনা বাংলা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। রেভাঃ লালবিহারী দে'র ইংরেজি অনুবাদ যেমন একদিক দিয়া দেশবিদেশে লোক-সাহিত্যের পণ্ডিতগোষ্ঠীর নিকট আবেদন সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের রচনা তাহা করিতে না পারিলেও বহু বাঙ্গালীর নিকট ইহার যে আবেদন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা একদিক দিয়া যেমন সুগভীর, অন্যদিক দিয়া তেমনই বহুদূরপ্রসারী। তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্যে—যাহা কিছু সুন্দর, নির্মল ও পবিত্র তাহার প্রতি একটি স্বাভাবিক আর্কষণ ছিল। লোক-সাহিত্যের স্বাভাবিকত্ব ও অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। সে কথা তিনি তাঁহার 'জীবনস্মৃতিতে' উল্লেখ করিয়াছেন। লোক-সাহিত্য বিষয়ক তাঁহার ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ হইবার বহু পূর্বেই তিনি তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে ১২৯২ সালে বাংলার একটি ছেলেভুলানো ছড়াকে ভিত্তি করিয়া যে কবিতাটির রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। কবিতাটির নাম 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এ'ল বান।' এই কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে তাঁহার 'জীবনস্মৃতিতে' যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে বাংলার এই সম্পদগুলি তাঁহার সাধনার মূলে কি সুগভীর প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল;

তিনি লিখিয়াছেন, 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে'য় এ'ল বান' তখন এই কয়টি ছত্র তাঁহার বাল্যকালের 'মেঘদূতে'র মত ছিল। তাঁহার মানস-পটে একটি ঘন মেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তাল তরঙ্গিত নদী মূর্তি-মান হইয়া দেখা দিত। বাংলাদেশের প্রকৃতি গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, বাংলার ছড়াগুলির মধ্যে প্রকৃতির যে সহজ পরিচয়টি অকৃত্রিম ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্বভাবতঃই তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই ছড়াটির কথা তিনি তাঁহার আরও পরবর্তী জীবনেও এইভাবে স্মরণ করিয়াছেন, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতি-প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত হইতেছে, অথচ এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।'

১৩০১ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখনও বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রপাত হইতে কয়েক বৎসর বাকি। কিন্তু পূর্ব হইতেই জাতির মনে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগ্রামের যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার রচনাগুলিই তাহার প্রমাণ। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার মধ্যে জাতির আত্ম-পরিচয় উপলব্ধির একটি উপায় দেখিতে পাইলেন। সেইজন্য সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই সাহিত্যের কোনও শাশ্বত নীতিমূলক বিষয় আলোচনা করিবার পরিবর্তে বাংলার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই বৎসরই তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' নামক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কোন কোন বিষয় প্রকাশিত হইলেও ছড়ার কোন সংগ্রহই প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা ছড়াগুলি নিজেই সংগ্রহ করিয়া ইহাদের সম্পর্কে তাঁহার উক্ত

প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিলেন তাহা সহজেই বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কেবলমাত্র আলোচনাই নহে, তিনি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ছড়ার একটি সংগ্রহও প্রকাশ করিলেন। বাংলা দেশে দেশী ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের ইতিপূর্বে প্রায় দশ-বারোটি প্রবাদের সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ছড়ার সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রকাশ করিলেন। এই সময়ই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় তিনি 'ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ' করিয়া বলিয়াছিলেন, 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ।'

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় মোহগ্রস্ত হইয়া আমরা যখন আমাদের গৃহচ্ছায়ায় অযত্নবর্ধিত সাহিত্য-সম্পদকে অবহেলা করিতেছিলাম, তখন রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাও ইহাদের মধ্য হইতে রসের সন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, ইহাদের যথার্থ রস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া ইহাদের উপর হইতে আমাদের উপেক্ষার ভাব দূর করিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কারণ, দেখিতে পাওয়া গেল, তাঁহার উক্ত প্রসঙ্গ ও সঙ্কলন প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চারিদিক হইতে এই বিষয়ক তথ্যের ব্যাপক অনুসন্ধান করা হইতে লাগিল। আমাদের সমাজের নিরক্ষর স্ত্রীজাতির মধ্যে মৌখিক প্রচলিত ছড়াগুলিও যে অনুশীলনের বিষয়, উপেক্ষার বিষয় নহে, সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের বিষয়, পরিবর্জনের বিষয় নহে, রবীন্দ্রনাথের মতন ব্যক্তিত্ব যখন তাহা তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ বলিষ্ঠ ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তখন এ বিষয়ে আর কাহারও সংশয় প্রকাশ করিবার কিছুই রহিল না। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ছড়াও প্রকাশিত হইতে লাগিল। স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলা হইতে সংগ্রহ করিয়া 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র এক অতি মূল্যবান সংগ্রহ প্রকাশিত করিলেন। স্বর্গত রজনীকান্ত গুপ্ত

'সাঁওতাল পরগনার ছড়া' সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলেন, কুঞ্জলাল রায় ও অম্বিকাচরণ গুপ্ত বর্ধমান ও হুগলী জেলার ছড়া সংগৃহীত করিয়া প্রকাশ করিলেন। সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতেও 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র এক অতি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। একে একে এই পথ অনুসরণ করিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরিদাস পালিত, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি। প্রত্যেকেই নিজেদের অঞ্চল হইলে নিজেদের চেষ্টায় ছড়া ও গান সংগ্রহ করিয়া কেবলমাত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নহে, অন্যান্য পত্রিকায়ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে, বাংলার অলিখিত এক বিচিত্র রসসম্পদ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্বপ্রকার উপেক্ষা জয় করিতে সক্ষম হইল। সেদিন রবীন্দ্রনাথের মতন ব্যক্তিত্ব যদি ইহাদের প্রতি এই মমতা প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর যেদিন আত্মসচেতনতা ফিরিয়া আসিত, সেদিন আর ইহাদের সন্ধান পাওয়া যাইত না; কারণ, নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সকল দেশেই আজ অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় মর্যাদা-বোধের বিকাশ ত্বরান্বিত হইতে পারিবে ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সমসাময়িক প্রত্যেক রচনাতেই তাঁহার বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক এই বিষয়ক সকল রচনার মধ্যেই তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' রচনাটি নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। সেই জন্য এই প্রবন্ধটির বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটির প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন—'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলী ছড়া প্রচলিত আছে কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।' লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তে কেবল ছড়ার উপরই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। কিন্তু সমাজ-তত্ত্ববিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্ কিংবা ভাষাতত্ত্ববিদ্ যে কারণে ছড়া সংগ্রহ ও তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগ্রহ সম্পর্কে সে পথ যে অনুসরণ করেন নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—'ছড়ার মধ্যে যে

একটি সহজ কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।'

পাশ্চাত্ত্যদেশে ছড়া যে ভাবে সংগৃহীত হইয়া আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার সম্পর্কে একটি যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে—এমন কি, সেখানে শব্দগ্রাহক যন্ত্র দ্বারা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ করিবার সকলেই পক্ষপাতী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রের পরিবর্তে কেবলমাত্র তাঁহার অনুভূতিশীল হৃদয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজ সকল ক্ষেত্রেই যেমন যন্ত্রের দাসত্ব করিতেছে, সহিত্যিক রস-বস্তু বিশ্লেষণ করিবার ক্ষেত্রেও সেই নীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই পথ অনুসরণ করেন নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভা কোন বিষয়েই এই প্রকার যান্ত্রিক নিয়ম অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী ছিল না। এখানেও তাহা করিতে পারে নাই। সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া হৃদয়কে অবরুদ্ধ রাখিয়া কেবলমাত্র মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখিলে তাহাতে যে সুফল পাওয়া যাইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশে দীর্ঘকাল যাবৎই লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হইয়া কেবলই রাশীকৃত হইতেছে, ইহাদের মধ্য হইতে শ্রেণীবিভাগ ও তালিকা প্রস্তুত করা ভিন্ন সেখানে আর যে বিশেষ কিছু হইতেছে, তাহা মনে হয় না। এই কার্য কায়িক শ্রমসাধ্য, কিন্তু সাহিত্যের মূল্য উপলব্ধিতে হৃদয়ের শক্তিই আমরা অনুভব করি, দেহের শক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ হৃদয় দিয়া হৃদয়ের সৃষ্টি উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইজন্য বৈজ্ঞানিকের নিকট ইহার আবেদন ব্যর্থ হইলেও হৃদয়বান সহিত্য-রসিকের নিকট তাহা কদাচ ব্যর্থ হয় নাই।

যাঁহারা জাতি-তত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্ব আলোচনার জন্য লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন, তাঁহারা যেখানে যেমনটি পান, সেখান হইতে অবিকল তাহাই সংগ্রহ করেন। সুতরাং এই কাজ যে কেহই করিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতিসাধারণ জন-মানসের এই রসোপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে নিজের সৌন্দর্যচেতনা ও নীতিবোধ সর্বদা সতর্ক রাখিয়াছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজের সংগৃহীত একটি ছড়া এই প্রকার অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> বোন্ কাঁদেন বোন্ কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
> সেই যে বোন্…… …

ছড়াটির অবশিষ্ট অংশ তিনি আর উদ্ধৃত করেন নাই। সেইজন্য তিনি পাঠকদিগের নিকট ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'এই খানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোন ভদ্র-কন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, অথচ সাধরণতঃ এরূপ কলহ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অন্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি। তথাপি সেই ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম—

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে।
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥'

'ভদ্র সমাজে অনুচ্চার্য' কোন্ কথার পরিবর্তে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'স্বামীখাকী' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন! অথচ বাংলা সাহিত্যের কোন কোন লেখক ইহা অপেক্ষাও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ জাতির অশ্লীল এবং গালিগালাজের ভাষা অবলম্বন করিয়াও গবেষণা করিয়া থাকেন,—এমন কি ইংরেজি ভাষায় slang বা ইতর ভাষার অভিধানও সংকলিত হইয়াছে। বাংলার একটি বিশিষ্ট প্রবাদ-সংগ্রহ হইতে কোন অশ্লীল প্রবাদ কিংবা ইতর ভাষা পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হয় নাই, কারণ ইহা বিজ্ঞানের পথ নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ তাঁহাকে এই পথে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছে, সেইজন্য তিনি হৃদয়ের পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আলোচনা কিংবা সংগ্রহ দ্বারা নৃতত্ত্ববিদের কোন কাজ হইবে না, কিন্তু বিদগ্ধজনের বৃহত্তর সমাজে ইহা সমাদর লাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথ যে

কেবল ছড়াগুলি সংগ্রহ ও আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি রোমাণ্টিক কবিতাও রচনা করিয়াছেন। ইহাতে শিশুর একটি স্বপ্ন-জগতের সঙ্গে একটি পরিণত মনের রসানুভূতি সার্থক সংযোগ লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতা রচিত হইয়াছে। তাঁহার 'সোনার তরী' কাব্য রচনার যুগ প্রধানতঃ 'ছেলে ভুলানো ছড়া' রচনার যুগ,—সেইজন্য সেই যুগেই এই শ্রেণীর কবিতা সর্বাধিক রচিত হয়। তাঁহার 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বিম্ববতী' কবিতাটি বাংলার একটি পরিচিত রূপকথার আধুনিক কাব্যরূপ। ইহার ভিতর দিয়া আধুনিক কাব্য-পাঠককে বাংলার একটি শাশ্বত রসরূপের সঙ্গে তিনি পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। ইংরেজ কবি কীট্‌স্ যেমন উনবিংশ শতাব্দীর লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার কল্পনায় প্রাচীন গ্রীসের জীবনকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা রচনার ভিতর দিয়া প্রাচীন বাংলার সুদূরবর্তী মনটিকে উদ্ধার করিয়াছেন। তারপর তাঁহার 'সোনার তরী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়া দুই যুগের দুইটি রোমাণ্টিক চিন্তাধারার গঙ্গা-যমুনার মিলন সার্থক করিয়াছেন।

প্রায় সমসাময়িক কালেই রবীন্দ্রনাথ 'কবি-সঙ্গীত' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং ইহা তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করা হয়। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার মধ্যবর্তীকালের রচনা হইলেও প্রকৃত লোক-সাহিত্য বিষয়ক রচনা নহে, এই দাবি তিনি নিজেও তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও করেন নাই। কারণ, কবি-সঙ্গীত যে লোক-সঙ্গীত নহে, তাহা তিনিও জানিতেন। কবি-সঙ্গীত এক-একজন পরিচিত কবিওয়ালার রচনা, লোক-সাহিত্যের মত নামধাম ও পরিচয়-হীন কবির রচনা নহে। নাগরিক (urban) জীবনে কবি-সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু পল্লীজীবনেই বাংলার লোক-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে। এই কথাটি বিশেষভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের 'কবি-সঙ্গীত' প্রবন্ধটি তাঁহার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে কবি-সঙ্গীতকে অনেকে লোক-সঙ্গীত বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন।

উক্ত প্রবন্ধটি রচনার তিন চার বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্যসাহিত্য' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইতিপূর্বে ছড়া লইয়া তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিলেও বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ লোক-সঙ্গীত লইয়া কিছুই

আলোচনা করেন নাই। এই প্রবন্ধটির ভিতর দিয়া তিনি যেন তাঁহার সেই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার জমিদারি দেখাশোনার জন্য বাংলার পল্লী-অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন, সেই যুগই তাঁহার সমৃদ্ধতম সাহিত্য রচনার যুগ। তখন একদিকে যেমন 'সোনার তরী', 'চিত্রা' রচিত হয়, আবার অন্যদিকে তেমনই তাঁহার 'গল্পগুচ্ছে'র অননুকরণীয় ছোটগল্পগুলি রচিত হয়। সেই যুগেই তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটকও রচিত হয় এবং দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার এই সমৃদ্ধসৃষ্টির প্রভাব অন্তরে নানাদিক হইতে অনুভব করা সত্ত্বেও তিনি সেই যুগে 'গ্রাম্য সাহিত্যে'র কথাও বিস্মৃত হইতেছেন না। সুতরাং লোক-সাহিত্যের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের অবসরের বিলাস মাত্র ছিল না, তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার সঙ্গে অখণ্ডভাবে জড়িত হইয়াছিল—তাঁহার সাধনার সিদ্ধির মধ্যেও ইহাদের পরিচয় প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি প্রধানতঃ পাবনা ও রাজসাহী জিলার পল্লী-অঞ্চলের লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গান, লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার বিশেষত্ব এই যে, এই সঙ্গীতগুলিকে ইহাদের নিজস্ব পটভূমিকার উপর প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ইহাদের রস যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার লোক-সাহিত্যের আলোচনা গ্রন্থাগারের পুঁথিলব্ধ জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, লোক-সাহিত্যের যেখানে যথার্থ প্রকাশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ লোক-জীবন বা পল্লীজীবন, সেখান হইতেই তিনি ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই জন্য ইহাদের যথার্থ সৌন্দর্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের রচিত নৃ-বিদ্যা কিংবা লোকশ্রুতিবিদ্যা (folklore) সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনামূলক কোন গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত না থাকিয়াও তাঁহার আলোচনায় এমন কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলেই এই বিষয়ে তাঁহার উপলব্ধি যে কত গভীর ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ছড়া কিংবা লোক-সাহিত্যের কোন বিষয়ই যে কেহ সচেতন ভাবে রচনা করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি তাঁহার নিজের মত করিয়া বুঝাইলেও ইহাতে আধুনিকতম লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণের বিজ্ঞানসম্মত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্যের সঙ্গে উচ্চতর সাহিত্যের সম্পর্ক নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের

দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে।' রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধ রচনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে একজন পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিৎ লোকসাহিত্য সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'It is like a forest tree with its roots deeply buried in the past but which continually put forth new branches, new leaves, new friuts'। দীর্ঘ কাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পথ ধরিয়া পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ আজ যে কথা জানিতে পারিয়াছেন, বহুদিন পূর্বেই সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে উপলব্ধি দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলাদেশের নহে, আধুনিক সকল দেশেরই লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎ। তাঁহার আলোচনাগুলি ইংরেজিতে প্রকাশিত হইলে তিনি এই বিষয়েও আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সৃষ্টি

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের আজীবন কাব্যসাধনার সহিত তাঁহার ছন্দ-সাধনা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। ছন্দ রবীন্দ্র-কাব্যের বাহন মাত্র নয়, কাব্যের আত্মার মূর্ত প্রকাশ, কবির উপলব্ধির প্রতীক। 'ছন্দে উঠিছে তারকা, ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে'; রবীন্দ্রনাথের মতে কবি-চিত্তের ছন্দ-স্পন্দনের প্রভাবেই কাব্যের ভাব ও ভাষা আহৃত হয়, কাব্যসত্তার সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার ভিতরেই তাঁহার জীবন-সাধনা তথা কাব্য-সাধনার সূত্র লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

১

অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু 'কবি-কাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড' প্রভৃতি বালরচনার মধ্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনই তাঁহার ছন্দ-সাধনারও কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন পর্যন্ত তিনি কবি-প্রসিদ্ধ মত ও ভাবের উপাদান সহযোগেই কাব্য রচনা করিতেছিলেন, এবং প্রচলিত ছন্দের বাঁধা পথেরই অনুসরণ করিতেছিলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের ও রবীন্দ্র-ছন্দের ইতিহাসে এই রচনাগুলির কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নাই।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যানুভূতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' এবং তাঁহার ছন্দ-সাধনারও প্রথম পর্বের সূত্রপাত হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে।' যে চঞ্চল রোম্যান্টিকতা, যে নৈরাশ্যমুখর ব্যাকুলতা, যে প্রকাশবেদনার দৈন্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' লক্ষণ, তাহা এই সময়কার ছন্দেও দেখিতে পাওয়া যায়। সনাতন রীতি ও প্রথার অনুবর্তন না করিয়া কবি এখন নিজস্ব একটা সাধনার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, ছন্দেও একটা নূতন কিছু করার প্রয়াস করিতেছেন, কিন্তু সে প্রয়াসের ফলে কোনরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সনাতন পয়ার ও ত্রিপদীর শ্লোকে তিনি আর সন্তুষ্ট নহেন। ছোট বড় চরণ

মিশাইয়া নূতন রকমের শ্লোক রচনার চেষ্টা করিতেছেন, কখনও বা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব সহযোগে চরণ সৃষ্টির প্রয়াস করিতেছেন, কিন্তু কোনটাই ঠিক দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিতেছে না, বুদ্বুদের মত সবই ভাসিয়া ভাসিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার ললিত-গীত-উচ্ছ্বাসের যথার্থ প্রকাশ যেন কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, বিশেষতঃ যুক্তবর্ণ যেন পদে পদে তাঁহাকে ব্যাহত করিতেছে। কখনও তাহাকে ভাঙিয়া দুটি ভিন্ন অক্ষর তৈয়ার করিতেছেন, কখনও বা শব্দের শুদ্ধ বানানের একটা কোমল সংস্করণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। তবে কবি সিদ্ধিলাভ না করিলেও সাধনার সূত্রপাত যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় এই সময়েই 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচিত হয়। ব্রজবুলি-তে রচিত বলিয়া এই পদগুলির হয়ত বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্থান না হইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার প্রবৃত্তি কোন্ দিকে, তাহার আভাস এইখানে কিছু কিছু পাওয়া যায়। যে ভাবে সুষম স্তবক রচনা এবং সুকৌশলে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এখানে ছন্দ-স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার উত্তরকালের ছন্দ-সাধনার গতি-নির্দেশ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্য-সাধনার আরম্ভ হয় 'প্রভাত-সঙ্গীত' রচনার সময়। এই সময়ই দেখি যে একটা নূতন দৃষ্টি দিয়া তিনি বিশ্বজগৎ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নৈরাশ্যের স্থলে একটা আনন্দোজ্জ্বল উপলব্ধি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এই সময়কার ছন্দ রচনাতেও কবির কতকগুলি নূতন উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ছন্দে পর্বের গুরুত্ব এখন তিনি বুঝিয়াছেন, এবং মূল পর্ব বজায় রাখিয়া কি ভাবে নূতন নূতন চরণ ও স্তবক রচনা করিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা যায়, সে-তত্ত্বটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিন ও চার মাত্রার পর্বাঙ্গ দিয়া সাত মাত্রায় বিষমমাত্রিক পর্ব তিনি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন এবং এই ভাবে তাঁহার উচ্ছল আনন্দ ছন্দে প্রকাশ করিতেছেন।

কিন্তু যুক্তবর্ণের ব্যবহারে এখনও তিনি পটুত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অল্পকাল পরেই রচিত 'কড়ি ও কোমলে' দেখিতে পাই যে যুক্তবর্ণ সহযোগে সুষম ছন্দ রচনার কৌশল তিনি অধিগত করিয়াছেন, ছন্দ রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব পূর্বাচার্যগণের চেয়ে কোন ক্রমেই অল্প নহে। 'কড়ি ও কোমলে'-ই দেখিতে পাই যে কবি ছড়ার ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যদিচ এই ছন্দের সম্ভাবনা

সম্পর্কে এখনও তিনি ততটা সচেতন হ'ন নাই। আট ও দশ মাত্রার দীর্ঘ পর্ব লইয়াই এই সময়ে তিনি পরীক্ষা চালাইতেছেন, এবং এই সূত্রে দীর্ঘতর চরণ ও নূতন 'পরিপাটী' (pattern) সহযোগে সনেটের একটা নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন।

ইহার পরবর্তী কাব্য 'মানসী' রচনার কালে রবীন্দ্র-কাব্যের ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ। এই সময়েই তাঁহার কাব্য সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসচেতন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ছন্দেও এই সময়ে তিনি এক অভিনব ধারার প্রবর্তন করেন, এবং সেই ধারাতেই আধুনিক বাংলা কাব্যের স্রোত প্রধানতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতির স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, এবং 'মানসী' কাব্যেই ইহার স্বরূপ প্রথম বিকশিত হয়। এই রীতিতে প্রত্যেকটি হলন্ত অক্ষরকে (closed syllable) দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরিয়া লইয়া কবি যুক্তবর্ণের ব্যবহার সমস্যার সমাধান করিলেন, এবং প্রায় নিস্তরঙ্গ বাংলা পর্ব ও পর্বাঙ্গে ছন্দহিল্লোল প্রবর্তন করিলেন। 'অতৃপ্ত যত / মহৎ বাসনা / গোপন মর্ম / দাহিনী, // আপনা-মাঝারে / শুষ্ক জীবন- / বাহিনী //' তাঁহার কাব্যে পরিস্ফুট রূপ গ্রহণ করিল।

কেবল বাংলা ধ্বনিপ্রধান রীতির প্রবর্তনই 'মানসী'র ছন্দের একমাত্র উল্লেখযোগ্য লক্ষণ নহে। সনাতন তানপ্রধান ছন্দের ব্যবহারেও কবি এখানে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ, 'অহল্যা' ও 'মেঘদূত' প্রভৃতি তানপ্রধান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মিত্রাক্ষর পয়ারের আধারে অমিতাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়া একটা অভিনব ছন্দ-পদ্ধতির প্রবর্তন করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানা বিচিত্র 'পরিপাটী'র স্তবকও এই সময়ে কবি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিই পরে বাংলা কাব্যে লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ধ্বনি-প্রধান ছন্দে ছয় মাত্রার পর্বের বিশেষ উপযোগিতাও কবি এই সময়ে আবিষ্কার করেন।

'মানসী'তে কবির যে ছন্দ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই পরবর্তী 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে বিকাশ লাভ করে। তবে এই সময়ে কবি অভিনব সৃষ্টিকর্ম অপেক্ষা পূর্ব সৃষ্টির মধ্যে যেগুলি সার্থক,—পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সেইগুলির প্রতিষ্ঠার দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন। দশ মাত্রার পর্ব ও আঠার

মাত্রার চরণের বহুল ব্যবহার এই সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—এবং অমিতাক্ষর মিত্রাক্ষরেই ইহার সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে 'চৈতালি'তে দেখা যায় যে, কবি সনাতন পয়ার প্রভৃতি ছন্দের দিকেই পুনরায় আকৃষ্ট হইয়াছেন, 'চৈতালি'র ধীরোদাত্ত সুরের সহিত এই ছন্দের সঙ্গতি আছে। পরবর্তী কাব্য 'কল্পনা'য় দেখিতে পাই যে, একটা বিদ্রোহ ও নব জীবনের বাণী ঘোষিত হইতেছে, এবং তাহার প্রকাশ হইয়াছে প্রধানতঃ মিত্রাক্ষর ছন্দে। কিন্তু এখনকার মিত্রাক্ষর ছন্দ সনাতন মিত্রাক্ষরের ন্যায় নিস্তেজ ও নিঃস্পন্দ নহে, ইহার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব 'ভৈরব হরষ' ধ্বনিত হইয়াছে, ইহার ধ্বনিমাত্রিক ছন্দেও কোমলকান্ত কূজনের স্থলে 'গুরুগর্জন' শ্রুত হইয়াছে, ইহার তানপ্রধান ছন্দে দেবকুমারের কোদণ্ড টঙ্কার ও 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর' বাজিয়া উঠিয়াছে। কোনও নূতন ধারার প্রবর্তন এখানে নাই, কিন্তু পরিচিত পর্ব ও চরণ, অনুপ্রাস ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার করিয়াই বাংলা ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তির চরমোৎকর্ষ কবি এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে যুক্তাক্ষরকে আগে ছন্দের নিগড় বলিয়া মনে করা হইত তাহা যে কি ভাবে ছন্দের দ্যুতিময় অলঙ্কারে রূপায়িত হইতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় বোধ হয় পাওয়া যায় 'কল্পনা'তে। সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতির সহিত সুসংহত শক্তির সমন্বয়ে 'কল্পনা' ছন্দ-গৌরবে মহীয়ান্ হইয়াছে।

৩

রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও ছন্দসাধনার একটা নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হয় 'ক্ষণিকা' রচনার সময়ে। 'ক্ষণিকা'য় যে একটা অভিনব ক্ষণবাদ বা সহজিয়া বাদ জীবনধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রকাশ দেখা যায় এই কাব্যের অভিনব ছন্দ-পদ্ধতিতে। যে 'অকারণ পুলক' এই সময়ে কবির হৃদয়-মন অধিকার করিয়াছিল, তাহারই স্বাভাবিক প্রতিরূপ দেখা দিল নূতন এক ছন্দ-রীতিতে। যে ছড়ার ছন্দ পূর্বে কেবল মাত্র ছেলে-ভুলানো পদ্য-তন্ত্র-মন্ত্র, খনার বচন এবং হাল্কা হাসি ও ব্যঙ্গ কবিতার বাহন মাত্র ছিল, তাহারই মর্মকথাটি অধিগত করিয়া কবি উচ্চাঙ্গের কবিতায় নূতন এক রীতি—বলপ্রধান রীতির (stressed metre) প্রবর্তন করিলেন। ছড়ার ছন্দের চরণ ও শ্লোক রচনার পরিধি ছিল অতি সংকীর্ণ; রবীন্দ্রনাথ বলপ্রধান ছন্দে নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ও নানা 'পরিপাটী'র স্তবক রচনা করিয়া ইহার ব্যঞ্জনাশক্তিকে বহু গুণে বর্ধিত

করিলেন। 'সরল হাসি, সজল চোখের' কথা, কবিহৃদয়ের গান স্বতঃস্ফুরিত হইয়া এই ছন্দেই তাহাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইল।

'ক্ষণিকা'র সমস্ত কবিতাই অবশ্য বলপ্রধান ছন্দে রচিত নহে, ধ্বনিপ্রধান ছন্দও এখানে আছে। কিন্তু এখানে কবি যুক্তাক্ষরের স্বল্প ব্যবহার করিয়া নূতন রীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। 'কল্পনা'র ঝংকার ও হিন্দোল 'ক্ষণিকা'র মাত্রাবৃত্তে নাই। তানপ্রধান ও অমিতাক্ষর ছন্দের ব্যবহার 'ক্ষণিকা'য় নাই। 'ক্ষণিকা'র পুলকচঞ্চল অভিনব সহজবাদের সহিত তান-প্রধান ছন্দের ধীর গম্ভীর গতির সঙ্গতি থাকিতে পারে না। 'গভীর স্বরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে' কবির কোন ইচ্ছা নাই, তাঁহার ভাব এখন লঘুগতি কথ্য ভাষায় ও চটুল ছড়ার ছন্দেই ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু 'ক্ষণিকা'র এই দৃষ্টি অল্পকালের মধ্যেই 'নৈবেদ্যে'র বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে মিশিয়া গেল। 'কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি দূরে করি দিবে বরষণ, মিলাবে চপল দরশন!' 'ক্ষণিকা'র বিক্ষিপ্ত উপলব্ধি গ্রথিত ও ঘনীভূত হইয়া একটা বিরাট্ আদর্শনিষ্ঠায় পরিণত হইল। তানপ্রধান ছন্দের গম্ভীর উদাত্ত স্বর আবার তাঁহার কাব্যে ধ্বনিত হইল, কিন্তু তাহার রূপ হইল পূর্বাপেক্ষা অনেক সরল। সনেট্ জাতীয় অনেক কবিতা তিনি এই সময়ে রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্তবকের বৈচিত্র্যের দিকে বা ছন্দহিল্লোলের দিকে এখন তিনি আর বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। 'নৈবেদ্যে'র এই সমস্ত ছন্দোগুণ পরবর্তী 'স্মরণ', 'উৎসর্গ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও আছে। কবির রচনায় এখন তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও বলপ্রধান—এই ত্রিধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিতেছে। আবশ্যক মত তিন রীতিতেই তিনি কাব্য লিখিতেছেন,—গম্ভীর উদাত্ত ভাবের জন্য তানপ্রধানে, সূক্ষ্ম অনুভূতির স্পন্দনের জন্য ধ্বনিপ্রধানে এবং স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের জন্য বলপ্রধানে।

ইহার পর 'শিশু' হইতে 'গীতালি' পর্যন্ত রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে বাস্তবাতীত উপলব্ধি ও গূঢ়াত্মবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়াছে বলপ্রধান রীতির ছন্দে। যে ছন্দকে পূর্বে কেবল মাত্র লঘুভাব ও রঙ্গব্যঙ্গের উপযুক্ত মনে করা হইত, তাহাই যে রবীন্দ্রনাথের নিকট গূঢ় সত্য ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির যোগ্য মাধ্যম বলিয়া প্রতিভাত হইল, ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। বলপ্রধান ছন্দের সারল্য বোধ হয় তাঁহার কাছে মন্ত্রের ন্যায় আবেদন করিত, ইহার স্বরাঘাতের পৌনঃপুনিকতার

মধ্যে তিনি বোধ হয় একটা অলৌকিক ইন্দ্রজালের প্রভাব অনুভব করিতেন। বলা বাহুল্য, বেদের সংহিতা, বাইবেলের Psalms ও Gospelsএর সারল্যের মধ্যে এই জাতীয় একটা অলৌকিকতা আছে; ধ্বনিপ্রধান ও তানপ্রধান ছন্দের যে বিপুল ঐশ্বর্য আছে তাহা স্বভাবতঃ মানবিক ও পার্থিব, অলৌকিকের স্পর্শ তাহার মধ্যে ফুটিয়ে উঠে না—কবি হয়ত এইরূপই অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তানপ্রধান বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দে কোনও কবিতা রচনা করেন নাই এমন নহে। কিন্তু যখনই কোন অপার্থিব বা অলৌকিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন, তখনই তাঁহার ভাষা হইয়াছে সরল, ভাব হইয়াছে যুক্তিবিরল, বর্ণনা হইয়াছে বাহুল্যবর্জিত এবং ছন্দ হইয়াছে বলপ্রধান। এই প্রসঙ্গে 'শিশু'র কবিতাগুলি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কবির চক্ষে শিশু মানবক মাত্র নহে; সে সংসারাতীত সত্যের ঋষি; তাহার স্বপ্ন, কল্পনা সেই পরম সত্যের আভাস। এই জন্য যখনই কাব্যে শিশুর মনোভাব কবি প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা যখনই তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কবি আসিয়াছেন, তখনই সরল ভাষায় ও বলপ্রধান ছন্দে তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন।

ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' রচনার সময়ে এক অভিনব ছন্দোবন্ধ সৃষ্টি করিলেন, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি এতই অপরূপ ও অভাবনীয় যে 'বলাকার ছন্দ' ভিন্ন তাহার অন্য কোন সংজ্ঞা অদ্যাপি দেওয়া হয় নাই। ছন্দের পরিভাষায় ইহাকে মিত্রাক্ষরযুক্ত বিষম অমিতাক্ষর তানপ্রধান ছন্দ বলা যাইতে পারে। যতি ও ছেদের বি-যোগ করিয়া মধুসূদন বাংলা তানপ্রধান ছন্দের যে সম্ভাবনা প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহারই এক চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে 'বলাকা'র ছন্দে। মধুসূদনের অমিতাক্ষরে যতির দিক্ দিয়া ঐক্য এবং ছেদের দিক্ দিয়া আবেগবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং এই উভয় সংকল্পের (motif) সমাবেশে য়ুরোপীয় Contrapuntal সঙ্গীতের ন্যায় একটা দোরোখা ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই দোরোখা ছন্দের জটিলতা বোধ হয় আমাদের স্বাভাবিক রুচির সহিত তেমন খাপ খায় না। অথচ ছেদের অবস্থান-বৈচিত্র্য না ঘটাইতে পারিলে, ছাঁচে ঢালা ছন্দের কাঠামোতে কবিতা রচনা করিলে, আবেগের সহজ স্পন্দন ও বৈচিত্র্যের প্রকাশ করা যায় না। 'বলাকা'র ছন্দে রবীন্দ্রনাথ যতির 'পরিপাটী'কে ছন্দের ভিত্তি না করিয়া শুদ্ধ ভাবপ্রবাহের

তরঙ্গের অনুসরণ করিয়া ছেদের-ই অবস্থান অনুযায়ী চরণ রচনা করিতে লাগিলেন, বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন সংখ্যক পর্ব লইয়া চরণ গঠন করিলেন, কেবল পরস্পর সন্নিহিত বা অদূরস্থ চরণে চরণে মিত্রাক্ষরের আশ্লেষ রাখিয়া পদ্যের ঝঙ্কার বজায় রাখিলেন। ফলে, ছেদ ও যতির বি-যোগ উঠিয়া গেল; ছন্দের গতি হইল একমুখী, তীব্র ও তরঙ্গভঙ্গিল। মধুসূদনের অমিতাক্ষরে যে **contrapuntal** গৌরব আছে তাহা রহিল না বটে, কিন্তু 'পরিপাটী'র বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করাতে পদ্যছন্দে গদ্যছন্দের 'তাণ্ডব ও তরল তালের' আভাস ফুটিয়া উঠিল। মিত্রাক্ষরের ব্যবহার ও 'পরিপাটী'র আভাস থাকার জন্য এ ছন্দকে ঠিক মুক্ত ছন্দ বলা যায় না; এ ছন্দে 'পরিপাটি' ও মুক্তছন্দ উভয়েরই লক্ষণাদি থাকায় এখানে ছন্দের এক অভূতপূর্ব অর্ধনারীশ্বর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বলাকা'য় কবির উপলব্ধির যে বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহারই মূর্ত রূপ দেখা যায় 'বলাকা'র ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রতিভার ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'বলাকা'র দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধিরই অনুবৃত্তি পাওয়া যায় পরবর্তী 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যদ্বয়ে। কিন্তু 'বলাকা'র ছন্দ এবং এই দুই কাব্যের ছন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, 'পলাতকা'য় 'বলাকা'র মুক্তবন্ধ ছন্দের-ই অনুসরণ করা হইয়াছে, কারণ, চরণের দৈর্ঘ্যের কোন নির্দিষ্ট পরিমিতি নাই, কোন স্তবকের 'পরিপাটি'র আভাস নাই। কিন্তু সামান্য একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, 'পলাতকা'র ছন্দ মুক্তবন্ধ নহে; ইহার প্রত্যেকটি চরণ চার মাত্রার বলপ্রধান পর্বে গঠিত, এবং প্রতি পংক্তিযুগল মিত্রাক্ষর ব্যবহারের দ্বারা আশ্লিষ্ট। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যেও চার মাত্রার বলপ্রধান পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সেখানে চরণের দৈর্ঘ নিরূপিত, স্তবকের 'পরিপাটী'র স্পষ্ট ব্যবহার সেখানে করা হইয়াছে।

'বলাকা'র ছন্দ সৃষ্টির স্বল্প পরেই যে কবি সমমাত্রিক ছন্দোবন্ধে প্রত্যাবর্তন করিলেন, ইহা একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। 'শিশু ভোলানাথে'র ছন্দ অবশ্য 'শিশু'র ছন্দেরই অনুরূপ, এবং যে কারণে কবি 'শিশু'তে ছড়ার ছন্দ বা বল-প্রধান ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই কারণেই 'শিশু ভোলানাথে' সেই ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সহজ ভাষা, সরল ছন্দ-ই শিশুর মুখে শোভা পায়; তাহা ছাড়া এই সারল্যের মধ্যে একটা অলৌকিকতার আভাস আছে, তাহাও এই সূত্রে ছড়ার ছন্দ ব্যবহারের অন্যতম কারণ। 'পলাতকা'র কবিতাগুলিতেও

কবি সাধারণ জীবনযাত্রার কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন; অসাধারণ একটা উপলব্ধির দীপ্তি প্রত্যেকটি কবিতার পরিশেষে ফুটিয়া উঠিলেও এই আবির্ভাবের আধার লৌকিক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা, ইহার পাত্র-পাত্রীরা এক একটি সুপরিচিত লোকচরিত্র। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাহাদের কথা ও কাহিনী লোক-ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ছড়ার ছন্দের স্তবক তিনি গ্রহণ করেন নাই, বিচিত্র দৈর্ঘ্যের চরণের পারম্পর্যের মাধ্যমে জীবনের বাস্তবতা, বন্ধুরতা ও বিষম গতির ব্যঞ্জনা করিয়াছেন।

বোধ হয়, আরও একটা গভীরতর কারণ আছে। 'বলাকা'র ছন্দ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার শ্রেষ্ঠ মৌলিক কীর্তি, কিন্তু ইহা বোধ হয় তাঁহার একটা *tour de force* বা 'অসাধ্য-সাধনি'; ইহা তাঁহার তপোলব্ধ ঐশ্বর্য, তাঁহার সহজ সম্পদ নহে। বিচিত্র অথচ সুষম সৌন্দর্যের প্রতিই তাঁহার প্রবণতা, বিষম ছন্দ বা তাণ্ডব লীলা তাঁহার স্বধর্ম নহে। তাঁহার জীবন-সাধনা ও ছন্দ-সাধনার ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মতো যাক যাক চুকে যত অসাধ্য-সাধনি'—

অন্তরাত্মার এই বাণীই বার বার তাঁহার সাধনার পথে দিক্ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যের পরবর্তী যুগের ইতিহাস হইতেও ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। এই যুগের পরিব্যাপ্তি মোটামুটি ভাবে 'পূরবী' রচনার সময় হইতে 'বিচিত্রিতা' রচনার সময় পর্যন্ত, 'পরিশেষে'র কয়েকটি কবিতাও এই যুগে রচিত। এই সময়ে কবির মনোজগতে একটা Indian Summer বা অকাল-বসন্তের আবির্ভাব ঘটে; মানবপ্রেম ও নিসর্গসৌন্দর্যের জয়গাথাই পুনশ্চ তাঁহার কাব্যের প্রধান উপজীব্য হয়। কোনও বাস্তবাতীত সত্তা নহে, বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্যই এখন কবির কাছে পরম সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই পরিবর্তনের পরিচয় কবির ছন্দেও প্রকট হইয়াছে। 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র বিষম ছন্দ এখন আর তাঁহার কাছে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না। 'বলাকা'র 'ঝড়ের ঝঙ্কারের' স্থলে বাজিয়া উঠিয়াছে 'শেষ রাগিণীর বীণ্'। কবি ফিরিয়াছেন সুষম ও সুমিত ছন্দের যুগে,—নানা শোভন স্তবক ও সুঠাম চরণ পুনরায় তাঁহার কাব্যের বাহন হইয়াছে। এই যুগের কিছু কিছু

কবিতা তানপ্রধান এবং কদাচ বলপ্রধান ছন্দে রচিত হইয়া থাকিলেও, ধ্বনি-প্রধান ছন্দ-ই এখন তাঁহার কবিতার প্রধান বাহন, এবং যে পুলক হিল্লোলে এখন কবির চিত্ত আন্দোলিত, তাহা ধ্বনিপ্রধান ছন্দেরই 'ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে' ব্যক্ত হইয়াছে। তবে যেখানে তাঁহার মননশীলতা ও চিন্তাসম্পদের পরিচয় আছে, সেখানে কবি তানপ্রধান ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন এবং অষ্টাদশ মাত্রার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরই হইয়াছে তাহার বাহন। কদাচ দুই-একটি কবিতায় 'বলাকা'র ছন্দের প্রয়োগ আছে; সেখানে পুলক-হিল্লোলের পরিবর্তে ধ্বনিত হইয়াছে একটা বাস্তবাতীত অভিজ্ঞতার অথবা একটা বাস্তব-দ্রোহী প্রেরণার সুর। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কবিতার মর্মবাণী তাহার ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—এ কথা রবীন্দ্র-কাব্যের সব যুগেই সত্য।

৫

ইহার পরে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-সাধনার ইতিহাসে একটা বৈপ্লবিক রীতির প্রবর্তন দেখা যায়। এই সময়ে তিনি গদ্যকবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বিষমগতি এবং 'পরিপাটী'র বন্ধন হইতে এক রকম মুক্ত হইলেও, তাহা পদ্যছন্দ। তাহার উপকরণ পদ্যের পর্ব, পদ্যছন্দের নির্দিষ্ট রীতিতেই প্রত্যেকটি পর্ব সুগঠিত। কিন্তু এই গদ্যকবিতার উপকরণ পদ্যের পর্ব নহে, সাধারণ গদ্যের-ই এক-একটি phrase বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি। এ ক্ষেত্রে পর্বের বা পর্বাঙ্গের মাত্রা, যতির অবস্থান ইত্যাদি কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তবে গদ্যকবিতায় এক-একটি পংক্তি ও তাহার এক-একটি বিভাগের দৈর্ঘ্য ও গুরুত্ব হইতে ভাবের আরোহ ও অবরোহের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং অন্য এক প্রকারের ছন্দের (rhythm) আভাস ফুটিয়া উঠে। পংক্তির প্রত্যেকটি বিভাগে স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে যে কয়েকটি শ্বাসাঘাত পড়ে, তাহার দ্বারা এক-একটি বিভাগের গুরুত্বের তারতম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কোনও নির্দিষ্ট 'পরিপাটী' নহে, কেবলমাত্র ভাবপ্রবাহের গতির অনুসরণেই পংক্তি ও বিভাগের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়া থাকে। 'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'ছুটির আয়োজন' বা 'শেষ সপ্তকে'র 'পঁচিশে বৈশাখ' প্রভৃতি রচনা গদ্যকবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু গদ্যকবিতা গদ্যের উপকরণে লেখা হইলেও তাহা কবিতা; শুধু যে

কবিতার বিশিষ্ট ভাব ইহাতে আছে তাহা নয়, কবিতার ভাব-রূপও গদ্যকবিতায় আছে। ছন্দোময় গদ্য ও গদ্যকবিতা এক নহে। ছন্দোময় গদ্যের বহু উৎকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম', 'স্বদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রকাশ্য সভায় তিনি যে সমস্ত ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতেও অনেকে একটা বিশিষ্ট ছন্দোগুণ লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু গদ্যের ছন্দ ও গদ্যকবিতার ছন্দ এক নহে। গদ্যছন্দের গতি মূলতঃ কুটিল; কাব্যছন্দের তথা গদ্য কবিতার ছন্দ মূলতঃ সরল। গদ্যছন্দের এক-একটি আবর্ত হইতেছে এক-একটি যুক্তিময় বাক্য; গদ্যকবিতার এক-একটি আবর্ত হইতেছে এক-একটি ভাবময় পংক্তি, অনুভূতির এক-একটি ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস। গদ্যছন্দে স্তবক রচনার কোন প্রবৃত্তি থাকে না, গদ্যের বাক্য-পরম্পরায় গঠিত হয় এক-একটি অনুচ্ছেদ; গদ্যকবিতায় স্তবকের গঠনরীতি বা তাহার আভাস থাকে। পদ্যের চরণের ন্যায় গদ্যকবিতার পংক্তিতে সাধারণতঃ দুইটি হইতে চারটি মাত্র বিভাগ থাকে, ছন্দোময় গদ্যে চারের অধিক বিভাগ প্রায়ই দেখা যায়। গদ্যকবিতায় পদ্যের সুস্পষ্ট 'পরিপাটী' না থাকিলেও তাহাতে একটা অব্যক্ত তালের ইঙ্গিত আছে, ছন্দোময় গদ্যে সুর থাকিলেও তাহাতে এরূপ কোন তালের আভাস নাই। ছন্দোময় গদ্য যুক্তির দ্বারা আর গদ্যকবিতা অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে রসানুভূতির যে সূক্ষ্ম স্পন্দন আছে, কবি তাহারই আভাস গদ্যকবিতায় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখানে পদ্যছন্দের শাসন তিনি মানিয়া চলেন নাই।

এইজন্য গদ্যকবিতা রচনা করা (এবং ঠিক মত পড়া) সুকঠিন। রবীন্দ্রনাথের পদ্যছন্দের অনুসরণ করিয়া বহু কবিই সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গদ্যকবিতার সার্থক অনুকরণ অদ্যাপি কেহই করিতে পারেন নাই। পদ্যছন্দের একটা আদর্শ আছে, সে আদর্শের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য আছে সে কথা সত্য, কিন্তু সে আদর্শের জগৎ বাস্তব জগৎ হইতে এক হিসাবে স্বতন্ত্র। সে জগতে আমাদের বাস্তব জগতের কথা উপাদান হিসাবে স্থান পাইতে পারে বটে, কিন্তু তখন সে কথায় অন্য রকমের একটা সুর আসিয়া পড়ে, পরিচিত জগৎ অভিনব একটা সৃষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তব জগতের যে একটা নিজস্ব অব্যক্ত সুর আছে, গদ্যকবিতায় তাহাই ধরিয়া রাখার চেষ্টা করা হয়। যে প্রেরণা হইতে পদ্যের উদ্ভব, তাহাতে গদ্যকবিতা রচনা করা যায় না। গদ্যকবিতার বস্তু পদ্যছন্দে ফেলিলে শুধু তাহার রূপ নয়, তাহার রসও অন্যবিধ

হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, 'অনেক কথা আছে যা কখনই মিলের কবিতায় লেখা চলে না।…গদ্যেও নয়, মিলেও নয়, একমাত্র গদ্য-কবিতাতেই যথার্থ সুন্দর ভাবে প্রকাশ হতে পারে এমন কথাও আছে। যখন গদ্যকবিতা লেখা হ'ত না, তখন সেগুলো লেখাই হ'ত না।…সমস্ত ছবিটা বাদ দিয়ে এতটুকু ভাবরস ছেঁকে তুলতে হোতো, তাতে বাদ পড়ত অনেক। …('পরিশেষ' কাব্যের) 'কিছু গোয়ালার গলি' অন্য কোন ছন্দেই চলত না,…লিখলে সে একেবারে অন্য জিনিষ হোতো, এ জিনিষ নয়।…কবিতার মতো লাইন না বেঁধে গদ্যের মতোও (গদ্যকবিতা) লেখা যেতে পারে, তবে পড়বার সুবিধার জন্য ফাঁক দেওয়া চাই, গদ্য-কবিতা পড়া শক্ত।'

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা রচনা করেন, সেই সময়ের উপলব্ধির সহিত এই অভিনব রীতির একটা সামঞ্জস্য আছে। এই যুগের রবীন্দ্রনাথ বাস্তব সত্যের দ্রষ্টা ও দার্শনিক। যথার্থ realism বা বাস্তবতা এই সময়েই তাঁহার রচনায় প্রকট হইয়াছে। কোন অতিবাস্তব সত্তা বা সৌন্দর্য এখন আর কবির প্রতিপাদ্য নহে, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই এখন তাঁহার প্রেরণার উৎস। তাহার 'অর্থ কিছু' বুঝিবার কোনও ক্ষমতা তাঁহার নাই, তাহার কোন ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করার মত ধৃষ্টতাও তাঁহার নাই, নিজের কোন কল্পনা বা আদর্শ তাহার উপর আরোপ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। নিজের কল্পনা ও আদর্শ পরিহার করিয়া একান্ত ভাবে বাস্তব বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি এই সময়ে যে প্রেরণা লাভ করিলেন, কোন রকম পদ্য ছন্দেই তাহার যোগ্য প্রকাশ হইতে পারে না। কারণ, পদ্য মানেই এক প্রকার রূপকল্পের অনুকরণ অর্থাৎ কোন আদর্শের অনুসরণ। এই জন্য গদ্যকবিতাই এখন হইয়াছে তাঁহার কাব্যসরস্বতীর বাহন।

৬

জীবনের শেষ সীমায় মৃত্যুর দেহলিতে পৌছিয়া কবি পুনশ্চ একটা অলৌকিক উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত হইলেন, 'নবজাতক' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত রচনার সময়ে তাঁহার কাব্যে এই উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবের বিচিত্র যবনিকা এখনও তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত; কিন্তু সে যবনিকার পশ্চাতে একটা আলোকের উদ্ভাসন তিনি লক্ষ্য করিতেছেন। যবনিকা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, কিন্তু এখনও তাহা অপসৃত হয় নাই, 'অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে—অনাহত স্বরে…সোনার ঘণ্টা' ঢং ঢং করিয়া বাজিতেছে, তাহারই একটা ক্ষীণ

প্রতিধ্বনি এখন তিনি শুনিতে পাইতেছেন। ফলে বাস্তব তাঁহার কাছে 'ছন্দ-ভাঙা অসংগতি' বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহার মন এখন বাস্তব ছাড়িয়া 'পরীর দেশে' 'গানের সুরের ডানা' মেলিয়া যাইতে উৎসুক।

ইহার ফলে তাঁহার ছন্দ-সাধনাতেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। কবি কেবল যে এখন পুনরায় বিচিত্র পদ্যছন্দে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন তাহা নয়, নূতন এক প্রকার ছন্দোবন্ধও তিনি প্রবর্তন করিলেন। ইহাতে গদ্য-কবিতার অবাধ গতির সহিত মিলিত হইয়াছে পদ্যছন্দের স্পন্দন। ইহার উপকরণ পদ্যের পর্ব, কিন্তু এই পর্বের সমাবেশের মধ্যে পদ্যের কোন রীতিই নাই। মিত্রাক্ষরও নাই, কোন স্তবক বা 'পরিপাটী'র আভাসও নাই। গদ্য-কবিতায় যে ভাবে অর্থসূচক শব্দসমষ্টির সমাবেশে এক-একটি পংক্তি গঠিত হয়, সেই ভাবেই এখানে পদ্যের পর্বের সমাবেশে এক-একটি চরণ রচিত হইয়াছে। ইহাই যথার্থ **free verse** বা মুক্ত ছন্দ; 'বলাকা'র ছন্দে যাহার সূচনা, ইহাতেই তাহার পরিশেষ। 'শেষ লেখা'র 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি কবিতা ইহার উদাহরণ। মুক্তি-সন্ধানী কবির শেষ লেখা যে মুক্তছন্দে রচিত হইবে, ইহাই বোধ হয় সমুচিত।

৭

রবীন্দ্রনাথের ছন্দসাধনার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হইল তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের মূল প্রবৃত্তি কি কি, সে বিষয়ে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন-ই বিচিত্রের সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। যাহা সনাতন ও চিরাচরিত তাহাকে তিনি আঁকড়াইয়া কখনই থাকেন নাই, নব নব রূপের সন্ধান-ই তিনি করিয়াছেন। কোনও প্রাচীন ছন্দোরীতি-ই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই, সর্বদাই তাহাকে নূতন একটা রূপ দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি নিজে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ঐক্য ও সৌষম্য অপেক্ষা বৈচিত্র্যই বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু কোনও বিশেষ ছন্দোরীতি-ই তাঁহার প্রতিভার চরম অভিব্যক্তি একথা বলা যায় না, যে বিচিত্রের তিনি সন্ধান করিয়াছেন নব নব রূপের মধ্যে তাহার আভাস লক্ষ্য করিলেও তাহার স্বরূপ তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহার মর্মবাণী কোন বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধে চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'অজানা হইতে অজানায়' চিরকালই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন।

জীবনে ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যপন্থী হইলেও তিনি ঠিক বিপ্লবপন্থী নহেন। তিনি পুরাতনকে ঢালিয়া সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে নূতন রূপ দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সনাতন পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোবন্ধ, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ও সনেট্ ইত্যাদি সকল কিছুর মূল তত্ত্বকে তিনি নব ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, বিস্তৃততর পরিধির মধ্যে বিকশিত করিয়াছেন। যে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির তিনি প্রবর্তন করেন, তাহার সম্ভাবনা প্রাচীন ছন্দোরীতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল। গদ্যকবিতা-ই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক সৃষ্টি, কিন্তু তাহাতেও পুরাতন ছন্দোবন্ধের অন্ততঃ একটা ভাবরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একেবারে সমস্ত রীতির এবং আদর্শ বা 'পরিপাটী'র বন্ধন হইতে মুক্ত কবিতা বোধ হয় তিনি কখনই রচনা করেন নাই, তাঁহার তথাকথিত মুক্তছন্দও সম্পূর্ণ ভাবে 'মুক্ত' নহে। 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির সাধনাই তিনি করিয়া গিয়াছেন, শুধু জীবনে নয়, ছন্দেও। প্রাচীন রীতির বন্ধন হইতে তাঁহার ছন্দ উত্তরোত্তর মুক্তির দিকে অগ্রসর হইলেও তাঁহার ছন্দ সর্বদাই নব নব বিচিত্র রূপকল্পের প্রভাব স্বীকার করিয়াছে। যদি কোনও ছন্দকে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ছন্দ বলিতে হয়, তবে বোধ হয় 'বলাকা'র ছন্দই সেই অভিধার যোগ্য। এখানে কোনও 'পরিপাটী'র একটা বাঁধা ছাঁচ নাই, কিন্তু পদ্যের মূল উপকরণ আছে এবং বহু বিচিত্র চরণের ও স্তবকের আভাস ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়া আবার নূতন কোন আভাসের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আকাশমার্গে উড্ডীন বলাকার ন্যায় এই ছন্দ মুক্তগতি, কিন্তু প্রাচীন পৃথিবীর আকর্ষণ সর্বদাই ইহার মধ্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্মুক্তির প্রতীক এই ছন্দেই যেন প্রকৃষ্ট ভাবে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত নূতন নূতন চরণ ও স্তবক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার গঠন-রীতি আলোচনা করিলে রবীন্দ্র-মানসের আর একটা প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যচপল ছন্দের দিকে তাঁহার একটা বিশেষ প্রবণতা আছে। এইজন্য ত্রিপদীর লক্ষণাক্রান্ত চরণের প্রতি তাঁহার একটা পক্ষপাত দেখা যায়। সম অপেক্ষা অসম বা বিষম গতি-ই তাঁহার রুচিকর। তিনি যে বহুবিধ স্তবক রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেগুলির বহুল ব্যবহার,—সেগুলি হয়, মধ্যক্ষামা, না হয়, জঘনচপলা। বলা বাহুল্য, নৃত্যছন্দের সহিত এই সমস্ত স্তবকের গঠনরীতির ও গতির একটা মিল আছে। যে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতির তিনি প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতেও পর্বের মধ্যে দ্বিমাত্রিক অক্ষর সংযোজনার ফলে একটা নৃত্যের হিন্দোল ফুটিয়া উঠে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রছন্দের লক্ষণাদি বিচার করিলে মনে হয় তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটা নারীসুলভ প্রবণতা ছিল। এই মন্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতার বা অক্ষমতার ইঙ্গিত নাই। হয়ত সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে বলা উচিত যে, নারী-প্রকৃতির মধ্যেই মানবচিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলির মহত্তর বিকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রছন্দের অনুপ্রাসবাহুল্য, ঝঙ্কারমুখরতা, নৃত্যচঞ্চলতা, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, গতিলালিত্য, সুরের তীব্রতা, আবেগের আরোহ ও অবরোহের ক্ষিপ্রতা ও আকস্মিকতা, শিহরণ ও দ্রুত স্পন্দন, বৈচিত্র্যমুখিতা ইত্যাদি অনেকগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণ একত্র মিলাইয়া বিবেচনা করিলে এই মতের সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। রবীন্দ্র-কাব্যে অনুভূতির গভীরতা, ভাবের গাম্ভীর্য, আদর্শের মহত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত গুণই অবশ্য আছে, কিন্তু তাঁহার কাব্যের রূপ ও প্রকাশভঙ্গির যে স্বকীয়তা আছে, তাহা নারীসুলভ। 'যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি'—সেই ভাবই রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

পরিভাষা

পরিভাষা পরিহার করে ছন্দের আলোচনা অসম্ভব। তাই প্রথমেই কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১

ইংরেজিতে যাকে বলে সিলেব্‌ল্, বাংলায় তাকে 'অক্ষর' বা 'বর্ণ' না বলে 'দল' বলা সংগত মনে করি। তাতে দ্ব্যর্থকতা-দোষ বর্জিত হয়। প্রচলিত অর্থে 'রাম' শব্দে দুই 'অক্ষর'। এক 'অক্ষর' বললে খটকা লাগে। এক 'দল' বললে সে আশঙ্কা থাকে না।

ছন্দের আলোচনায় প্রত্যেক শব্দের দলবিভাজন অত্যাবশ্যক। দলের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের উপরেই ছন্দের বৈচিত্র্য নির্ভর করে। তাই দলের আকৃতি ও প্রকৃতি নিরূপণও আবশ্যক। আকৃতিভেদে দল দ্বিবিধ—

১ যে-সব দলের অন্তে আশ্রিত স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে। যেমন—দৈ (=দই্), বৌ (= বউ্), নাই্, দাও্, বিং, দুঃ, ছন্, শিল্।

২ যে-সব দলের অন্তে উক্ত প্রকার আশ্রিত বর্ণ থাকে না। যেমন—ক. বি. তা।

এই দ্বিবিধ দলের জন্য দুটি সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক নাম চাই। আমরা নিম্নোক্ত দুটি নাম স্বীকার করে নিলাম—

রুদ্ধদল = আশ্রিতান্ত দল (closed syllable); মুক্তদল = অনাশ্রিতান্ত দল (open syllable)।

'ছন্দশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'—এই শব্দ-দুটিতে রুদ্ধদল আছে চারটি (ছন্, শিল্, বীন্, নাথ), আর মুক্তদলও আছে চারটি (দ, পী, র, দ্র)।

২

উচ্চারণভেদেও দল দ্বিবিধ—প্রসারিত ও অপ্রসারিত। কোনো দলের উচ্চারণকাল দীর্ঘ হলে তাকে বলি প্রসারিত, আর তা না হলে অপ্রসারিত। এ বিষয়ে বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়ম এই :

১ মুক্তদলের সাধারণ উচ্চারণ অপ্রসারিত।

যেমন—ক. বি. তা

২ মুক্তদল একক ও স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হলে প্রসারিত হয়। যেমন

১ গোলাপ ফুল | ফুটিয়ে আছে, | মধুপ হোথা | যাস নে ;
ফুলের মধু | লুটিতে গিয়ে | কাঁটার ঘা- | খাস নে।

—রবীন্দ্রনাথ : 'শৈশব-সংগীত', ফুলবালা।

২ শয়ন পরে | লুটায়ে প'ড়ে | ভাবিল রাজ | -বালা—
কে- পরালে | মালা।

—রবীন্দ্রনাথ : 'সোনার তরী', সুপ্তোত্থিতা।

প্রথম দৃষ্টান্তের 'ঘা' এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'কে', এই দুইটি একদল (monosyllabic) শব্দের উচ্চারণ প্রসারিত। এই অংশ দুটি পড়লে অনায়াসেই তা টের পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলায় উক্ত প্রকার মুক্তদল সাধারণতঃ একক বা স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয় না, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই উচ্চারিত হয়; তার উচ্চারণও প্রসারিত হয় না। যখন শুধু বলি, 'না'—তখন 'না' এর উচ্চারণ প্রসারিত। যখন বলি 'হবে না' কিংবা 'হয় তো হবে', তখন 'না' এবং 'তো'-এর উচ্চারণ অপ্রসারিত। কেননা, এগুলি তখন স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয় না, আগের বা পরের শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েই উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ এদের আসল রূপ তখন হয় 'হবেনা' এবং 'হয়তো'।

একক মুক্তদলের প্রসারিত বা দীর্ঘ উচ্চারণের আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

চাই : না | জুঁই : বেল | চাঁপা : এনে | দাও ;
আমি : কি তা | জানি : তুমি | পাও : কি না | পাও।

—কিরণধন : 'নতুন-খাতা', আবদারের আধঘণ্ট।।

এখানে প্রথম পর্বে 'না' এই একক মুক্তদলটির উচ্চারণ স্বতন্ত্র ; কেননা এটি উক্ত পর্বের দ্বিতীয় উপবিভাগে অবস্থিত, প্রথম উপবিভাগে অবস্থিত 'চাই'-এর সঙ্গে যুক্ত নয়। সেইজন্য 'না'-এর উচ্চারণ প্রসারিত বা দীর্ঘ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পংক্তির 'কি তা' ও 'কি না' এই দুই উপপর্বের মুক্তদলগুলি পরস্পর যুক্তরূপে উচ্চারিত। তাই এই মুক্তদলগুলির উচ্চারণ অপ্রসারিত। প্রথম 'না'-এর ও দ্বিতীয় 'না'-এর উচ্চারণগত আয়তনের পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, ছন্দের প্রয়োজন অন্য রকম হলে 'চাইনা', 'আমিকি', 'তাজানি', 'পাওকি', 'নাপাও' এরকম যুক্ত উচ্চারণ হতেও বাধা হোতো না।

ঝর্‌ : না- | ঝর্‌ : না | স্থন্‌ : দরী | ঝর্‌ : না-,
তর : লিত | চন্‌ : দ্রিকা | চন্‌ : দন | বর্‌ : না- ।
—সত্যেন্দ্রনাথ : 'বিদায়-আরতি', ঝর্না ।

পূর্বোক্ত 'চাই না' পর্বের 'না'এর মতো এখানেও 'না'গুলি পৃথক্‌ উপপর্বে অবস্থিত ; ফলে এগুলির উচ্চারণ স্বতন্ত্র, তাই প্রসারিত ।

নির্জন | প্রান্তরে | চলেছে কে | যাত্রী ?
ধূ ধূ ধূ ধূ | জোচ্ছনা | ঝকমকে | রাত্রি ।
—কিরণধন : 'নতুন-খাতা', অতিথি ।

এখানে দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বটির উচ্চারণরূপ 'ধূধূ : ধূধূ' এ রকম ; অর্থাৎ প্রত্যেকটি মুক্তদলই পরস্পর যুক্তরূপে উচ্চারিত, তাই অপ্রসারিত। যদি লেখা হোতো—

ধূ ধূ | জোচ্ছনা | ঝকমকে | রাত্রি

তাহলে এই পর্বটির উচ্চারণরূপ হোতো 'ধূ-: ধূ-', অর্থাৎ দুটো 'ধূ'ই হোতো একক ও প্রসারিত। যেমন

ঝাঁ ঝাঁ | রোদ্দুর | অগ্নির | বৃষ্টি,
জ্বলে পুড়ে | গেল বুঝি | ব্রহ্মার | সৃষ্টি ।
—কিরণধন : 'নতুন-খাতা', ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর ।

এখানে দুটো 'ঝাঁ'ই বিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারিত, তাই প্রসারিত।

চলি চলি | পা পা | টলি টলি | যায়,
গরবিনী | হেসে হেসে | আড়ে আড়ে | চায় ।
—রবীন্দ্রনাথ : 'শিশু', হাসিরাশি ।

এখানে 'না'-এর আয়ত উচ্চারণ কান এড়িয়ে যেতে পারে না।

ছন্দের প্রয়োজনে যদি কোনো মুক্তদল মূল শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহলেও তা প্রসারিত হয়—

গগনে গ | রজে মেঘ | ঘন বর | ষা-,
কূলে একা | বসে আছি | নাহি ভর | সা- ।
—রবীন্দ্রনাথ : 'সোনার তরী', সোনার তরী ।

এখানে 'ষা' ও 'সা' পৃথক্‌ পর্বে অবস্থিত, তাই বিচ্ছিন্ন ও প্রসারিত। পূর্বোদ্ধৃত 'ঝর্না' কবিতার 'না' পৃথক্‌ উপপর্বে অবস্থিত।

প্রসারিত মুক্তদলের দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই। এ প্রসঙ্গে শুধু দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন :

১ মুক্তদল একক বা বিচ্ছিন্নরূপে উচ্চারিত হলে প্রসারিত হয় বটে, কিন্তু বাংলা ছন্দে মুক্তদলের এ রকম প্রসারণ খুব কমই ঘটে থাকে। অধিকাংশ স্থলেই মুক্তদল অন্য দলের সঙ্গে যুক্তভাবেই উচ্চারিত হয়, তাই তার উচ্চারণও হয় অপ্রসারিত। মুক্তদলের অপ্রসারিত বা হ্রস্ব উচ্চারণটাই স্বাভাবিক, প্রসারণটা ব্যতিক্রম।

২ বাংলায় নিত্য দীর্ঘ স্বর নেই। সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব উচ্চারণই বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক। অবস্থাবিশেষে হ্রস্ব-দীর্ঘ উভয় প্রকার স্বরই বাংলায় প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম।

৩

মুক্তদলের উচ্চারণ-প্রসঙ্গটা অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ হয়ে গেল। রুদ্ধদলের উচ্চারণ-প্রসঙ্গটা সংক্ষেপেই সেরে ফেলা যাবে।

বাংলায় রুদ্ধদলের প্রসারিত ও অপ্রসারিত উচ্চারণ দুই-ই সমভাবে স্বাভাবিক। রুদ্ধদলেরও প্রসারণ ও অপ্রসারণ নির্ভর করে তার অবস্থানের উপরে এবং ভাব প্রকাশের বা ছন্দোরীতির প্রয়োজনের উপরে।

১ সাধারণতঃ শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ প্রসারিত এবং শব্দের আদি বা মধ্য-স্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ অপ্রসারিত। যেমন—'ছান্দসিক'-শব্দের 'ছান্' অপ্রসারিত, 'সিক' প্রসারিত; 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দে 'বীন্' অপ্রসারিত ও 'নাথ' প্রসারিত। জল, দিন প্রভৃতি একদল (monosyllabic) শব্দের রুদ্ধদলটি অন্তঃস্থিত বলেই স্বীকার্য।

২ কিন্তু শব্দের অন্তিম রুদ্ধদলের প্রসারণ সার্বত্রিক বা সর্বকালীন নয়। অন্তিম রুদ্ধদল অনেক সময়েই পরবর্তী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘতা হারায়। যেমন—বিষপান = বিশ্পান, কোন্‌দিন = কোন্দিন। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে প্রথম রুদ্ধদলটির সংকোচন ঘটেছে, কিন্তু দ্বিতীয় রুদ্ধদলটি প্রসারিতই আছে।

কিন্তু যদি প্রত্যেক শব্দকে বিচ্ছিন্ন ভাবে ফাঁক-ফাঁক করে অর্থাৎ বিরাম দিয়ে-দিয়ে বলি বা পড়ি, তবে প্রত্যেক শব্দেরই অন্তিম রুদ্ধদলটি প্রসারণের সুযোগ পায়। যেমন—বি-ষ্ পা-ন্, কো-ন্ দি-ন্।

৩ কোনো শব্দের উপরে যদি বিশেষ জোর দেবার প্রয়োজন হয় তবে

সে শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন ভাবেই উচ্চারণ করা হয় এবং তখনই ঐ শব্দের অন্তিম রুদ্ধদল প্রসারণের অবকাশ পায়। যেমন

> সে কহিল, | ভা-ই
> না-ই, না-ই, | নাই গো আমার | কিছুতে কাজ | না-ই।
>
> —রবীন্দ্রনাথ : 'ক্ষণিকা', কুলে।

এখানে প্রথম দুটি 'নাই'-এর প্রসারণ এবং তৃতীয় 'নাই'-এর সংকোচন সুস্পষ্ট। 'ভাই' এবং শেষ 'নাই' এ দুটিও প্রসারিত।

> চুড়ি চা-ই | চুড়ি চাই সে | হাঁকে,
> চীনের পুতুল | ঝুড়িতে তার | থাকে।
>
> —রবীন্দ্রনাথ : 'শিশু', বিচিত্র সাধ।

প্রথম ও দ্বিতীয় 'চাই'এর উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষিতব্য।

> 'সর্প নিয়ে | খেলার মত | আমি তোমায় | নিয়ে খেলি'—
> এই কথাটি | বলে তারে | ঢ-ক্ করে | গিলে ফেলি।
>
> —দ্বিজেন্দ্রলাল : 'আলেখ্য', মণ্ডপ।

এখানে 'ঢক্' প্রসারিত। প্রসারিত না হলে 'ঢক্ করে' যুক্ত হয়ে যাবে। নাই, চাই, ঢক্, পরবর্তী শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রসারিত। বিচ্ছিন্ন না করলে, অর্থাৎ পরবর্তী দলের সঙ্গে যুক্ত করলেই সংকুচিত হয়ে যাবে। 'নাই গো' এবং 'চাই সে', এ দুটিই তার দৃষ্টান্তস্থল।

৪ ছন্দের রীতিগত প্রয়োজনেও রুদ্ধদলের সংকোচন-প্রসারণ ঘটানো যায়। যথাস্থানে তা দেখানো যাবে।

অতএব বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম এই :

১ মুক্তদল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একক ভাবে উচ্চারিত হলে প্রসারিত হয়। কিন্তু এ রকম বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জাত প্রসারণ বিরল। অতএব মুক্তদলের যুক্ত প্রয়োগ ও হ্রস্বতাই স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম।

২ রুদ্ধদল শুধু পরবর্তী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই প্রসারিত হয়। এই প্রসারণও আবার অনেকাংশেই ভাব প্রকাশের তথা বলবার বা ছন্দের ভঙ্গির উপরে নির্ভর করে। অর্থাৎ রুদ্ধদলের প্রসারণ-সংকোচন অনেকাংশেই লেখক বা বক্তার ইচ্ছাধীন। বাংলায় এই প্রসারণ-সংকোচন প্রায় সমভাবেই ঘটে থাকে।

বাংলা ছন্দে প্রসারিত দলের উচ্চারণকালকে অপ্রসারিত দলের দ্বিগুণ বলে ধরে নেওয়া হয়। একটি অপ্রসারিত দলের উচ্চারণকালকে বলবো 'কলা' (mora)। সুতরাং

অপ্রসারিত দল = এক কলা
প্রসারিত দল = দুই কলা।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রেও 'কলা' শব্দের প্রয়োগ আছে।

পরিমিত ধ্বনি নিয়েই ছন্দের কারবার। সুতরাং ধ্বনি পরিমাপের একটি একক বা মাত্রা (unit of measure) চাই। বাংলা ছন্দে মাত্রাগণনার ত্রিবিধ রীতি প্রচলিত। যেমন

অরুণ্‌-আলোর্‌ | প্রথম্‌ পরশ্‌ | গাছে গাছে | লাগে,
কাঁপনে তার্‌ | তোরি যে সুর্‌ | পাতায়্‌ পাতায়্‌ | জাগে।

—রবীন্দ্রনাথ : 'শেষ লেখা', ৩।

এখানে মুক্ত-রুদ্ধ-নির্বিশেষে এক দল = এক মাত্রা। এই হিসাবে প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে চার মাত্রা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই মাত্রা। মাত্রা-গণনার এই রীতিকে বলি 'দলসংখ্যাত' রীতি। এই রীতির ছন্দের মাত্রাকে বলা যায় 'দলমাত্রা'।

নন্দিত | কণ্ঠের | হাস্যের | রোল
অম্বর | -তলে দিল | উল্লাস | -দোল।

—রবীন্দ্রনাথ : 'চিত্রবিচিত্র', উৎসব।

এখানে প্রত্যেক পর্বের দলসংখ্যা সমান নয়। এ ছন্দের মাত্রা-গণনা-রীতি দলসংখ্যাত নয়। একটু মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যাবে, এর প্রত্যেকটি রুদ্ধদলেরই উচ্চারণ প্রসারিত ও দুইকলা পরিমিত, আর মুক্তদল অপ্রসারিত ও এককলা-পরিমিত। এই ছন্দের রীতি অনুসারে এক কলা = এক মাত্রা। এই ছন্দের হিসাবে এর প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে চার কলা এবং অপূর্ণ পর্বে দুই কলা। মাত্রাগণনার এই রীতিকে বলি 'কলাসংখ্যাত' রীতি। এই রীতির ছন্দের মাত্রাকে বলতে পারি 'কলামাত্রা'।

আর এক রকমের ছন্দ আছে যার কলামাত্রাগণনার রীতিতে কিছু বিশিষ্টতা দেখা যায়। যেমন—

ভবিষ্য-ৎ | নাহি হেরে | মিথ্যা দুরা | শা-য়,
বর্তমা-ন্‌ | তরঙ্গে-র্‌ | চূড়া-য়্‌ চূ | ড়া-য়

নৃত্য করে | চলে যা-য়্ | আবেগে উল্ | লাসি,
উচ্ছৃঙ্খল্ | সে জীব-ন্ | সে-ও ভাল | বাসি।

—রবীন্দ্রনাথ : 'সোনার তরী', বসুন্ধরা।

এখানে প্রত্যেক দলকে একমাত্রা হিসাবে গণনা করে পর্বগুলির সমতা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এ-ছন্দের মাত্রাগণনারীতি দলসংখ্যাত নয়। প্রত্যেক রুদ্ধদলকে দুই কলা ও মুক্তদলকে এক কলা হিসাবে গণনা করলেও এর পর্বগুলিতে সমতা পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এ-ছন্দের মাত্রা-গণনা-রীতি পূর্বোক্ত রকমের কলাসংখ্যাতও নয়।

একটু মন দিয়ে শুনলে টের পাওয়া যাবে যে, এখানে শব্দের অন্তঃস্থিত রুদ্ধদল প্রসারিত (হাইফেন-চিহ্নিত) ও দুইকলা-পরিমিত। কিন্তু শব্দের আদিস্থিত বা মধ্যস্থিত রুদ্ধদল অপ্রসারিত ও এককলা-পরিমিত। মুক্তদল স্বভাবতই অপ্রসারিত ও এককলা-পরিমিত। এই হিসাবে গণনা করলে দেখা যাবে, এর প্রতি পূর্ণ পর্বে আছে চারকলা, আর অপূর্ণ পর্বে আছে দুইকলা। মাত্রাগণনার এই রীতিকে বলি 'বিশিষ্ট কলাসংখ্যাত' রীতি।

৫

মাত্রাগণনার রীতিভেদে ছন্দোরচনার রীতিও ত্রিবিধ—দলমাত্রিক রীতি, সরল কলামাত্রিক রীতি ও বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতি।

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, মাত্রাগণনারীতির যে ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, ছন্দোবন্ধের বিচারে অর্থাৎ বাহ্য আকৃতির বিচারে ঐ তিনটিই এক আকৃতির। মাত্রাবিন্যাসপদ্ধতিতে তিনটি দৃষ্টান্তই এক আকারের। প্রত্যেকটিতে মাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে চার-চার-চার-দুই এই ক্রমে। এই পদ্ধতিতে গঠিত ছন্দ-পঙ্ক্তিকে বলা হয় পয়ারবন্ধ। উপরের দৃষ্টান্ত-তিনটি রীতিভেদে ত্রিবিধ হলেও বন্ধবিচারে তিনটিই পয়ার—যথাক্রমে দলমাত্রিক, সরল কলামাত্রিক ও বিশিষ্ট কলামাত্রিক পয়ার। অর্থাৎ, মাত্রাগণনার রীতিভেদে ছন্দের রীতিভেদ বা প্রকৃতিভেদ, আর মাত্রাবিন্যাসের পদ্ধতিভেদে ছন্দের বন্ধভেদ বা আকৃতিভেদ।

রবীন্দ্ররচনায় সরল-কলামাত্রিক রীতি

আধুনিক বাংলা ছন্দের এই তিন রীতির মধ্যে সরল কলামাত্রিক রীতিটি একান্তরূপেই রবীন্দ্রনাথের দান। এই ছন্দোরীতিটি বাংলায় প্রচলিত হয় 'মানসী' কাব্য রচনার সময় (১৮৮৭-৯০) থেকে। মানসীর পূর্বে বাংলা

সাহিত্যে বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিভিন্ন লঘু প্রকৃতির রচনায় দলমাত্রিক রীতির ছন্দ কিছু কিছু প্রচলিত ছিল, তাও খুব কম। অন্য সর্ববিধ রচনারই বাহন ছিল বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে সরল কলামাত্রিক রীতির প্রবর্তন করেই নিরস্ত হয়েছেন তা নয়, তার বৈচিত্র্যসাধনও তাঁরই কীর্তি। আধুনিককালে এই রীতিই বাংলা গীতিকবিতার মুখ্যতম বাহন বলে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে এই বন্ধগত বৈচিত্র্যের সহায়তায় বাংলা গীতিকবিতার রূপবৈচিত্র্যে যে অজস্রতা দেখা দিয়েছে, তা সত্যি বিস্ময়কর। এই অজস্র বিচিত্রতার পরিচয় দানে প্রবৃত্ত না হয়ে এস্থলে তার প্রধান রূপভেদগুলির পরিচয় দিয়েই নিরস্ত হব।

সরল-কলাপর্বের আকার-ভেদ

কলাসংখ্যাভেদে সরল কলামাত্রিক রীতির পর্ব চার রকম—চতুষ্কল পর্ব (tetramoric), পঞ্চকল পর্ব (pentamoric), ষট্‌কল পর্ব (hexamoric) ও সপ্তকল পর্ব (heptamoric)। এই চতুর্বিধ পর্বেরও আবার দুইরূপ। একরূপে সংস্কৃত পদ্ধতিতে দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা স্বীকৃত হয়, এই রূপকে বলব প্রত্নরূপ অর্থাৎ archaic রূপ। দ্বিতীয় রূপে দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা স্বীকৃত হয় না, বাংলা উচ্চারণ-অনুসারে একমাত্রক বলেই গণ্য হয়; এই রূপকে বলব নব্যরূপ অর্থাৎ চলতি রূপ।

সংস্কৃত 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'জাতি' ছন্দ এবং বাংলা প্রত্ন-কলামাত্রিক রীতির ছন্দ বস্তুতঃ অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই রীতিতে বাংলার পর্বগঠনবৈচিত্র্য সংস্কৃত বা প্রাকৃতের চেয়ে অনেক বেশি। দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় প্রত্ন-কলামাত্রিক রীতির ছন্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় গান রচনায়, কখনও কখনও হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনেও এই রীতিকে কাজে লাগানো হয়; পাঠ বা আবৃত্তিযোগ্য কবিতায় এই রীতি চলে না।

এবার বিভিন্ন আয়তনের সরল কলামাত্রিক পর্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

চতুষ্কল পর্ব

প্রাচীন সাহিত্য 'মাত্রাবৃত্ত', 'জাতি' বা সরল কলামাত্রিক রীতির ছন্দে চতুষ্কল পর্বের প্রয়োগই সর্বাধিক। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দ-কাব্যে, চতুষ্কল পর্বের বহুলতা সুপরিচিত। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাস প্রমুখ

বাংলার ব্রজবুলি কবিরাও এ বিষয়ে জয়দেবেরই অনুগামী। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী কাব্যেই এই প্রাচীন ধারার শেষ অনুবর্তন বলা যায়।

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য ;
কলয়িত মলয়ে সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ।
—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ৯।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘন ঘন গর্জিত মেহ ;
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত
থরহর কম্পত দেহ।
—'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', ১৩।

জয়দেব-বিদ্যাপতি-প্রমুখ কবিরা চতুষ্কল পর্বের যে ছন্দোবন্ধ সব চেয়ে বেশি করে ব্যবহার করতেন, তারই প্রতিরূপ দেখতে পাই উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত-দুটিতে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী কাব্যের অধিকাংশ রচনাই এই আদর্শে গঠিত।

বলা বাহুল্য এ হচ্ছে সরল চতুষ্কল পর্বের প্রত্নরূপ। 'জনগণমন'—ইত্যাদি জাতীয় সংগীতটিও এই ছাঁদেই গড়া।

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি
পূর্ব উদয় গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ
নবজীবনরস ঢালে।

'গাহে' শব্দের 'হে' দলটির উচ্চারণ অপ্রসারিত অর্থাৎ একমাত্রক। পদাবলী-সাহিত্যে এরকম ব্যতিক্রম পদে পদেই পাওয়া যায়।

নব্য চতুষ্কল পর্বের দৃষ্টান্ত এই :

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধু-মঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুন-রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।
—গীতবিতান ২, গীতসংখ্যা ১৯৯

'পাত্রে' ও 'রাত্রে' শব্দের দুটি 'ত্রে'ই প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক। এই প্রসারণের হেতু পৃথক্ উপপর্বে অবস্থান ও স্বতন্ত্র উচ্চারণ।

নব্য চতুষ্কল পর্বের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় 'মানসী' কাব্যে। যথা—

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত-কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়।
—'মানসী', নিষ্ফল উপহার (১৮৮৮)।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানসী কাব্যে এই চতুষ্কল পর্বের প্রয়োগ খুবই কম। শুধু তাই নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যেই সরল চতুষ্কল পর্বের প্রয়োগ অন্যান্য পর্বের তুলনায় বিরল। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনায় এরকম পর্বের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু তাও মুখ্যতঃ লঘু রচনায় বা গীতি রচনায়। অথচ জয়দেব-বিদ্যাপতি-প্রমুখ কবিদের রচনায় চতুষ্কল পর্বই সর্বাধিক প্রচলিত। এমন কি, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মুখ্য বাহনও এই চতুষ্কল পর্ব।

বোধ করি সত্যেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এই নব্য চতুষ্কল পর্বকে উচ্চাঙ্গের বাংলা গীতিকবিতার বাহনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার বহুল-প্রয়োগের আদর্শ স্থাপন করেন। পূর্বোল্লিখিত 'ঝর্না' কবিতাটিই তার অন্যতম নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষ বয়সের রচনা থেকে সরল চতুষ্কল পর্বের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

এতদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
নানা রং-করা।...
ঋতুতে ঋতুতে
আকাশের উৎসব-দূতে
এনে দিত পল্লব-পল্লীতে তার
কখনো পা-টিপে চলা হালকা হওয়ার,
কখনো বা ফাগুনের অস্থির এলোমেলো চাল
জোগাইত নাচনের তাল।
জীবনের রস আজ মজ্জায় বহে,
বাহিরে প্রকাশ তার নহে।...
সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে,
সেথা যাত্রার কালে যাত্রার পাত্রটি পূরে

সদয় অতীত কিছু সঞ্চয় দান করে তারে
পিপাসার গ্লানি মিটাবারে।

—'নবজাতক', শেষ বেলা (১৯৪০)।

এই সরল চতুষ্কল পর্বের রচনাটিতে যে বলিষ্ঠ ও বেগবান্ মুক্তক-বন্ধের চাল দেখা দিয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তা অনন্যসাধারণ। সরল চতুষ্কল পর্বের এই বিশেষ ভঙ্গির মধ্যে বাংলা ছন্দের একটি নূতন পরিণতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

পঞ্চকল পর্ব

১

জয়দেবের পূর্ববর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে পঞ্চকল পর্বের নিদর্শন আছে বলে মনে হয় না। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে পঞ্চকলপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দেও আছে। জয়দেব সম্ভবতঃ প্রাকৃত আদর্শেই পঞ্চকলপর্বিক ছন্দ রচনা করেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্যে কিংবা গীতগোবিন্দকাব্যে পঞ্চকল পর্বের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বিরল। গীতগোবিন্দকাব্যের চব্বিশটি গীতের মধ্যে মাত্র তিনটি গীত (১৩, ১৯, ২১) পঞ্চকলপর্বিক ছন্দে রচিত। অধিকাংশ গীতেরই বাহন চতুষ্কল পর্ব। বৈষ্ণব পদাবলীতেও পঞ্চকল পর্বের নিদর্শন খুব কম। যে কয়টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। শশিশেখরের—

তুঙ্গমণি-মন্দিরে ঘনবিজুরি সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা

ইত্যাদি রচনাটি যে জয়দেবের—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম্

—ইত্যাদি গীতটির (১৯ সংখ্যক) আদর্শে রচিত একথা সুবিদিত।

২

খাঁটি বাংলায় সরল পঞ্চকলপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত নেই রবীন্দ্রপূর্ব যুগের সাহিত্যে। অথচ বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে রচিত পঞ্চকল পর্বে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন

ওরে দেখি তাহারে। সেই ত দ্বারে। প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরুশিখরী। করেতে ধরি। রহে সুখীমন॥

তাহা	নিরখি তারা	মেঘের ধারা	হেন বর্ষে বাণ।
তাহে	বানরগণে	বিন্ধি সঘনে	কৈলা খান খান॥
তবে	কুপিত মতি	বানর তভি	বৃক্ষশিলা মারি।
করে	কুলিশ দন্ত	সেনার অন্ত	গভীর হাঁকারি॥···
তবে	সমর জিতি	বানর পতি	করি সিংহনাদ।
দিল	আপন সখা	নিকটে দেখা	মনেতে আহ্লাদ॥
শুনি	তাহার বাণী	শ্রীরঘুমণি	করি প্রশংসন।
দিলা	বাহু পসারি	হৃদয় ভরি	তারে আলিঙ্গন॥

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সাহিত্য-সংসদ্), লঙ্কাকাণ্ড, বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন।

এই ছন্দোবন্ধে অভিনবত্ব সুস্পষ্ট। বোধ করি এইজন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোনো কোনো সংস্করণে এই ছন্দকে 'নর্তক ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। উক্ত উদ্ধৃতিটুকু আবৃত্তি করলেই এই নামের সার্থকতা বোঝা যাবে। এই দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির পূর্বে একটি করে 'অতিপর্ব' (anacrusis) স্থান পেয়েছে। তাতে এই ছন্দে একটি বিশেষ ধরনের দোলা সৃষ্টির সহায়তা হয়েছে। এর প্রতি-পংক্তিতে আছে তিন পর্ব এবং এই তিন পর্বের কলাসংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ, পাঁচ ও ছয়। কিন্তু মাত্রা-গণনার রীতি সরলা নয়, বিশিষ্ট। অর্থাৎ শব্দের অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদলের উচ্চারণ অপ্রসারিত ও এককলা-পরিমিত। তাতে ছন্দের মসৃণতা ব্যাহত হয়েছে। পদে পদেহ যুক্তাক্ষরের উপলখণ্ডে আহত হয়ে নর্তনের তাল কেটে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় পর্বে পাঁচ কলার পরে একটি প্রত্যাশিত যতির অভাবেও ছন্দের সৌষম্য নষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেখানেই তৃতীয় পর্বে পাঁচ কলার পরে হাঁফ ছাড়ার অবকাশ ঘটেছে সেখানেই ছন্দও নিখুঁত হয়েছে। যেমন

তারা পলায়ে যায় | পাছে না চায় | বারণ শোনে | না-।

পূর্বোদ্ধৃত লাইনগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই এই লাইনটির উৎকর্ষ উপলব্ধি হবে। বলা বাহুল্য, এখানে প্রথম 'না' অপ্রসারিত, কিন্তু দ্বিতীয় 'না' প্রসারিত ও দুই-কলা-পরিমিত। যদি উক্ত দৃষ্টান্তটির শেষাংশ সর্বত্রই পাঁচ+দুই-কলা-পরিমিত হোতো, তাহলে এই নর্তক ছন্দটির নৃত্যসৌন্দর্য উৎকৃষ্টতর হোতো। এ স্থলে এ সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও পঞ্চকল পর্বের দৃষ্টান্ত আছে :

গোপী-সমাজে ব্রজের মাঝে।
এমন কাজে মরিহে লাজে॥···

বাঁকা ত্রিভঙ্গ কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ ॥···
মিনতি করি চরণে ধরি।
কি কর হরি মরমে মরি ॥
পাপ আয়ানে শুনিলে কানে।
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে ॥···
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী।
আমি রমণী প্রমাদ গণি ॥
নিদয় বাঁশি হৃদয়-ফাঁসি।
করে উদাসী ছুটিয়া আসি ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা।

এই ছন্দোবন্ধের পরিসর সংকীর্ণ। তাতে পর-পর চার পর্বে একই মিল দেবার সংকল্প ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এখানেও মাত্রাগণনা-রীতি সরল নয়, বিশিষ্ট। ফলে যুক্তাক্ষরের চড়ায় ঠেকে ছন্দের প্রবাহ অনেক স্থলেই বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

অবিকল এই বন্ধেরই আর-একটি দৃষ্টান্ত আছে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়। তার থেকেও একটু অংশ উদ্ধৃত করি :

ব্রিটিসগণে অভয়-মনে।
শিখের সনে সেজেছে রণে ॥···
স্বরূপ বটে সকলে রটে।
শতদ্রু তটে পাছে কি ঘটে ॥
তোমার কার্য নহে নিবার্য।
পাইবে ধার্য শিখের রাজ্য ॥
না হয় ভঙ্গ রণতরঙ্গ।
শোণিত-রঙ্গ শোভিত অঙ্গ ॥···
সমর-স্থলে কামান-কলে।
বিপক্ষ দলে বধিবে বলে ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়।

এখানে শতদ্রু ও বিপক্ষ এই দুটি শব্দের রুদ্ধদল ছন্দকে বন্ধুর করে তুলেছে, তা সকলেই অনুভব করবেন। কিন্তু মধ্যের চারটি লাইনে সে বন্ধুরতা অনুভূত

হয় না। তার কারণ প্রতি পর্বেই একটি রুদ্ধদল থাকাতে ছন্দের সমতা রক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া, একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে যে, এসব স্থলে রুদ্ধ দলগুলি আমাদের রসনায় স্বভাবতই প্রলম্বিত ভঙ্গিতেই উচ্চারিত হয়। ফলে পর্বগুলিরও আয়তনবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ এই পর্বগুলি পাঁচকলা-পরিমিত না হয়ে আমাদের উচ্চারণে ছয়কলা-পরিমিত হয়ে যায়, যদিও কবি নিজে এগুলিকে অক্ষরের হিসাবে পাঁচমাত্রার পর্ব বলেই ধরে নিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রকতা ঈশ্বর গুপ্তের কানে ধরা পড়লেও তাঁর জ্ঞানে ধরা পড়েনি! যথাস্থানে তার আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। যা হোক, তাঁর কান আর জ্ঞানের এই বিরোধের ফলে তিনি অধিকাংশ স্থলেই কানের প্রেরণায় পঞ্চকল পর্বের রচনায় যুক্তাক্ষর বর্জন করেই চলেছেন; নেহাত দায়ে ঠেকে মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষর রেখেছেন (যেমন শতদ্রু, বিপক্ষ)। যেখানে জ্ঞানের অলক্ষ্যে কান ছয়কলার পর্ব রচনায় সায় দিয়েছে (যেমন—ধার্য-কার্য, ভঙ্গ-রঙ্গ), সেসব স্থলে দুই হাতে যুক্তাক্ষরের আমদানি করেছেন তিনি।

আসল কথা এই। বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে পাঁচকলার পর্ব কানের সায় পায় না। তাই রবীন্দ্রপূর্ব যুগে বাংলায় পাঁচকলা পর্বের দৃষ্টান্ত এত বিরল।

৩

রবীন্দ্রনাথের হাতেই পাঁচকলার পর্ব সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও 'মানসী'-যুগেরই কীর্তি। কিন্তু মানসী রচনার বহু পূর্ব থেকেই পাঁচকলা-পর্বের প্রতি তাঁর আসক্তি দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত এই:

আঁধার শাখা উজল করি
হরিত পাতা ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতী-বালা
    আছিস কেন ফুটিয়া?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা,
    শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হয়ে মধুপ কভু
    আসেনা হেথা ছুটিয়া।

—'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১), পঞ্চম সর্গ।

এরকম আরও দৃষ্টান্ত আছে 'শৈশবসংগীত' প্রভৃতি কাব্যে। কিন্তু এস্থলে আর উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানসীপূর্ব যুগে

রবীন্দ্রনাথ পাঁচকলা পর্বের রচনায় অতি সযত্নে যুক্তাক্ষর পরিহার করে চলেছেন। কেননা, সরল কলামাত্রিক রীতির কৌশলটি তখনও তাঁর আয়ত্ত হয়নি। সে কৌশল আয়ত্ত হবার পরে পাঁচকলাপর্বের ছন্দে রুদ্ধদল প্রয়োগের বাহুল্য দ্বারা যে উত্তাল ছন্দতরঙ্গের উদ্‌ভব ঘটেছে তাঁর হাতে, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তারিয়া মৃত্যু-স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্‌ যাহা
সঙ্গী পরানের
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রায়
সিন্ধু মাঝে লুটে।

—'মানসী', দুরন্ত আশা (১৮৮৮)।

উপরের দৃষ্টান্ত দুটি একই রীতিতে রচিত। অথচ রুদ্ধদলের বাহুল্যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে ছন্দতরঙ্গ কেমন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে, তাই লক্ষণীয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মাত্র সাত বৎসরের ব্যবধানে পাঁচকলাপর্বের ছন্দে এরকম আশ্চর্য বিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল।

আমরা দেখেছি সংস্কৃত, প্রাকৃত, ব্রজবুলি ও বাংলা, সব ভাষাতেই পঞ্চকল পর্বের প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকে যে দৃষ্টান্তগুলি তুলেছি, তাও একান্তই অগঠিত ও পরিপাট্যহীন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই পর্বের বাহুল্য, পারিপাট্য ও বৈচিত্র্যই একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় বিষয়। এই পঞ্চকল পর্বের প্রবর্তনের ফলে বাংলা ছন্দ—তথা গীতি-কবিতার ভাণ্ডার যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্যায়ের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এবার পরিণত বয়সের রচনা থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়॥
চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ-আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধভেলা ভাসায় বাতাসেতে
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায়।

—'গীতবিতান', দ্বিতীয় খণ্ড, বিচিত্র ৯৩।

কোথা　　বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার　　চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো　　হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি
তখন　　আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি;
তখন　　ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা-হোথায়—
আহা　　আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

—'গীতবিতান', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রেম ৩২৭।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে অতিপর্ব (anacrusis) এবং চলতি ভাষার প্রয়োগ লক্ষিতব্য। এ দুটিই গান।

৪

পূর্বে বলেছি গানে প্রত্নরীতির প্রয়োগ স্বীকার্য। দেববন্দনা-রচনাতেও তাই। মদনমোহনের রচনা থেকে প্রত্নরীতির পঞ্চকল পর্বের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বাণ খর | শাণ সূক্ষ্ম | পাণ বর | পাণিনী।
ঘোর রণ | রঙ্গ ঘন | ঘুঙঘুর নি | নাদিনী॥
কুণ্ড কর | বাল নৃক | -পাল কর | -কারিণী।
দৈত্য দল | -হীন বল | জীবন সং | -হারিণী॥…
রত্নে কর | যত্ন হে স | -পত্ন ভয় | হারিণী।
দেহি মদ | -নায় দৃঢ় | ভক্তিময়ি | তারিণী॥

—'বাসবদত্তা' (১৮৩৬) যোগমায়া স্তব।

এখানে 'রত্নে' এবং 'হে' শব্দের এ-কার লঘুপ্রযত্নে উচ্চার্য। নতুবা ছন্দসংগতি রক্ষিত হবে না। এরকম স্খলন প্রত্নরীতির রচনায় বিরল নয়, বিশেষতঃ মধ্যযুগের পদাবলী-সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিরচনাতেও পঞ্চকল পর্বের প্রত্নরূপের নিদর্শন আছে। যথা—

রাজরা | জেন্দ্র জয় | জয়তু জয় | হে,
ব্যাপ্ত পর | -তাপ তব | বিশ্বময় হে।
দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজন-দর্পহর দীপ্ত তরবারী,
সংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে।

—শারদোৎসব (১৯০৮), দ্বিতীয় দৃশ্য।

শুভ্র নব | শঙ্খ তব | গগন ভরি' | বাজে,

ধ্বনিল শুভ | জাগরণ | -গীত।

অরুণ রুচি | আসনে | চরণ তব | রাজে

মম হৃদয় | -কমল বিক | -শিত।

গ্রহণ কর | তারে

তিমির পর | -পারে,

বিমলতর | পুণ্য কর | -পরশ হর | -ষিত ॥

—'তপতী' (১৯২৯), ৪।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'বিকশিত' ও 'হরষিত' শব্দের শি ও ষি এ দুটি দলের উচ্চারণ দীর্ঘ, ছন্দের খাতিরে। গানে এরকম ছন্দোগত ত্রুটি উপেক্ষণীয় বলে গণ্য হয়।

৫

এবার রবীন্দ্রজীবনের একেবারে শেষের পর্যায়ের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে পঞ্চকল পর্বের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।—

বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে

অন্ধবেগে ঝঞ্ঝা বায়ু ঝংকারিয়া আসে

ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।

ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,

যুগযুগের তাপসদের সাধন ধন যত

দানবপদ-দলনে হল গুঁড়া।

তোমরা এস তরুণ জাতি সবে

মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীর-রবে

তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।

রক্তে রাঙা ভাঙন ধরা পথে

দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিশ্বজয়ী রথে,

পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।…

বাঁচাতে নিজ প্রাণ

বলীর পদে দুর্বলেরে করোনা বলিদান ॥

—'নবজাতক', আহ্বান (১৯৪০)।

বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম থেকে শেষ স্তর পর্যন্তই এই পঞ্চকল পর্বের বাহুল্য।

কিন্তু তার চেয়েও বহুলতর প্রয়োগ ষট্‌কল পর্বের। এবার তারই একটু পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হব।

ষট্‌কল পর্ব

সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে ষট্‌কল পর্বে সম্ভাব্যতার পূর্বাভাস আছে, কিন্তু লঘুগুরুক্রম-নিরপেক্ষ সচ্ছন্দগতি যথার্থ ষট্‌কল পর্বের নিদর্শন নেই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যেও নেই। সুপরিস্ফুট যথার্থ ষট্‌কল পর্বের আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ব্রজবুলি রচনায়। গোবিন্দদাস, শেখর, জগদানন্দ-প্রমুখ কবিদের রচনায় তার নিদর্শন আছে। ভারতচন্দ্রের রচনাতেও সরল রীতির ষট্‌কল পর্বের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

জয়তি জননী | অন্নদা।
গিরিশ নয়ন | -নর্মদা॥
অখিল ভুবন | -ভক্ত ভক্ত | -ভক্তি মুক্তি | -শর্মদা।
করবিলাসিত | -রত্ন দধী | -পানপাত্র | সারদা॥
তরুণ কিরণ | -কমল কোষ | -নিহিত চরণ | -চারদা
ভবনি পতিত | ভারতস্থ | ভবজলনিধি | -পারদা॥

—অন্নদামঙ্গল (৩য় খণ্ড), ভবানন্দের কাশী গমন।

বলা বাহুল্য, এটি প্রত্নরীতিতে রচিত। অতএব দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রকতা সর্বত্র স্বীকার্য। সে হিসাবে দুই জায়গায় ব্যতিক্রম ঘটেছে—জননী এবং দধী শব্দের ঈ-কারের দীর্ঘতা রক্ষিত হয়নি।

মদনমোহনের রচনাতেও প্রত্ন-রীতির ষট্‌কল পর্বের নিদর্শন আছে।—

ভো ভবসুত | কুরু সন্তত | তুরিতং দ্রুত | দূরম্।
রণ পণ্ডিত | গুণ মণ্ডিত | সুখভণ্ডিত | —পূরম্॥
ভূষিত মণি-গণ্ডিত ফণি-মণ্ডিতমণি-বন্ধম্।
গুণ গুণ নদ-বসু ষট্‌পদ-সূচিতমদগন্ধম্॥
চঞ্চল চল-মণিকুণ্ডল-কিঙ্কিনীকল-নাদম্।
রাজিত রজ পদনীরজ মদন ব্রজ পাদম্॥

—'বাসবদত্তা', গণেশবন্দনা।

এটির ভাষা সংস্কৃত। 'মদন ব্রজ' কথা-দুটি সংস্কৃত ভঙ্গিতে সংহতরূপে (অর্থাৎ 'মদনব্রজ'রূপে) উচ্চার্য। নতুবা এই পর্বে এককলা কম হবে। সংস্কৃত ভাষায় ষট্‌কল পর্বের আর কোনো দৃষ্টান্ত দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

মধুসূদনের রচনা থেকেও প্রত্ন ষট্‌কল পর্বের একটি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করি।—

করিয়া রণ, শত্রু নিধন,
রাজনবর রাজে।

পুলকে সব হইল মগন,
উৎসব-রত যত পুরজন,
জয়-জয়-রব-পূর্ণ গগন,
নৌবত ঘন বাজে ॥

—'পদ্মাবতী নাটক', ৪।১।

প্রথম দুটি দৃষ্টান্ত দেবতার স্তব, তৃতীয়টি গান। এ সব ক্ষেত্রেই প্রত্নরীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

এই প্রত্ন ষট্‌কল পর্বের সুষ্ঠুতম পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গীতি রচনায়। যথা—

নূতন যুগ-সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির-রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।...
জনগণপথ তব জয় রথ-চক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি' দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।...
কোটি মৌন-কণ্ঠ পূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

—'গীতবিতান' (১ম খণ্ড), স্বদেশ ১৬।

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংসবিকট দন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ লঙ্ঘন লঘু মায়া,
তব খনিখনিত্র নখবিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধন কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র ॥

—'মুক্তধারা' (১৯২২)।

এখানে ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে 'বক্ষো'র ও-কার এবং 'শতঘ্নী' ঈ-কারের উচ্চারণ লঘু।

আর একটি নমুনা—

> ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত
> বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।…
> দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি
> তব মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি
> তব শুভ সংগীত-রাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
> শান্ত হে মুক্ত হে হে অনন্ত পুণ্য
> করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

বাংলা সাহিত্যে এগুলির তুলনা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আসল কৃতিত্ব প্রত্ন ষট্‌কল পর্বের প্রয়োগে নয়, নব্য ষট্‌কল পর্বের প্রবর্তনে।

২

বাংলায় নব্য ষট্‌কল পর্বের জয়যাত্রা শুরু হয় মানসী রচনার সময় থেকে। মানসী কাব্যেই রবীন্দ্রনাথ শব্দের অপ্রান্তবর্তী রুদ্ধদলকে দুই কলামাত্রা বলে গণনা করে ছন্দ রচনার নূতন রীতি প্রবর্তন করেন। এই কাব্যের ছন্দখ্যাতির এটাই মূল কারণ। যে-সব কবিতায় এই রীতির স্পষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়, তার মধ্যে 'ভুল-ভাঙা' কবিতাটিই কালের বিচারে অগ্রবর্তী। এই কবিতাটি থেকে উক্ত নূতন ছন্দোরীতির নিদর্শন স্বরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

> বসন্ত নাহি | এ ধরায় আর | আগের মত,
> জ্যোৎস্না যামিনী | যৌবনহারা | জীবন-হত।
>
> —'মানসী', ভুল-ভাঙা (বৈশাখ, ১৮৮৭)।

কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এই কবিতাটি নব্য-কলামাত্রিক ছন্দোরীতির প্রথম নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে না। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই গৌরব প্রাপ্য 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের অন্তর্গত 'বিরহ' কবিতাটির। এই কবিতাটি থেকেও একটি অংশ তুলে দিচ্ছি—

> কত শারদ যামিনী | হইবে বিফল | বসন্ত যাবে | চলিয়া।
> কত উদিবে তপন | আশার স্বপন | প্রভাতে যাইবে | ছলিয়া॥
> এই যৌবন কত | রাখিব বাঁধিয়া | মরিব কাঁদিয়া | রে।
> সেই চরণ পাইলে | মরণ মাগিব | সাধিয়া সাধিয়া | রে॥
>
> —'কড়ি ও কোমল', বিরহ।

এই 'বিরহ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ১২৯৩ (১৮৮৬) সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়। অর্থাৎ 'বিরহ' কবিতাটি 'ভুল-ভাঙা'র কয়েক

মাস অগ্রবর্তী। সুতরাং এই নূতন ছন্দোরীতির ইতিহাসে অগ্রণীত্বের খ্যাতি প্রাপ্য এই 'বিরহ' কবিতাটিরই।

কিন্তু কাব্য হিসাবে 'কড়ি ও কোমল' এ গৌরবের অধিকারী নয়। কেননা, এই কাব্যের অন্য কোনো কবিতাতেই এই নূতন ছন্দোরীতি স্বীকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে মানসী কাব্য থেকেই উক্ত ছন্দোরীতি অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। তা ছাড়া, একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যায় উক্ত 'বিরহ' কবিতাটি শুধু ছন্দে নয়, ভাবের বিচারেও মানসী কাব্যেরই প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলির সমগোত্রীয়। অর্থাৎ ছন্দ ও ভাবের বিচারে 'বিরহ' কবিতার যথার্থ স্থান মানসী কাব্যেই, 'কড়ি ও কোমলে' নয়। কয়েক মাসের অগ্রবর্তিতার ফলে এটি দৈবক্রমে স্বস্থানে ভ্রষ্ট হয়ে 'কড়ি ও কোমলে' স্থান পেয়েছে। সুতরাং এই নূতন ছন্দোরীতি-প্রবর্তনের খ্যাতি মানসী কাব্যেরই প্রাপ্য, একথা বলা অসমীচীন নয়।

৩

কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, মানসীপূর্ব বাংলা ছন্দের মধ্যেই যদি এই নব্যকলামাত্রিক রীতির স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকতো তবে মানসী কাব্যে ওই নূতন রীতি প্রবর্তিত হতে পারতো না। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দের একটি স্বাভাবিক প্রবণতাকে সচেতনভাবে স্বীকার করে শিল্প-রচনার কাজে লাগিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের কৃতীত্ব এখানেই। তিনি কৃত্রিমভাবে একটি নূতন রীতি গড়েন নি।

এই প্রবণতার ইতিহাসটাও একটু বিচার করে দেখা প্রয়োজন। সে ইতিহাস বিচার করা যায় দুদিক থেকে। একদিকে প্রত্নরীতির রচনায় দীর্ঘ-স্বরের হ্রস্বত্বপ্রবণতা। চর্যাগীতির আমল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সমস্ত প্রত্নরীতির রচনাতেই প্রায়শঃ দীর্ঘস্বরের লঘুত্ব প্রাপ্তিরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায়। বর্তমান আলোচনাতেও যেসব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যেও যেখানেই এই জাতীয় ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে সেখানেই সেগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখানে নূতন নিদর্শন দেখানো নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘস্বরের লঘুতাকে বাংলার স্বাভাবিক নিয়ম বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এটাই নব্য-কলামাত্রিক রীতির প্রথম সূত্র। বাংলা ছন্দের, বিশেষতঃ ছয়মাত্রা পর্বের, আর-এক প্রবণতা রুদ্ধদলের গুরুত্ব-প্রাপ্তির দিকে। আধুনিককালের অনেক কবির রচনাতেই এই প্রবণতার অনেক নিদর্শন আছে। এস্থলে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

হেমচন্দ্র ছিলেন তৎকালীন কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর বিখ্যাত 'ভারত-সংগীত' (১৮৭০) কবিতার একটি অংশ এই—

'নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা ॥'

কবিতাটি জ্ঞানতঃ অক্ষরের হিসাবে রচিত। তাই 'শৃঙ্গ' শব্দে দুই এবং 'উচ্ছ্বাস' ও 'শৃঙ্খলে' শব্দে তিনমাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু 'বিংশতি' শব্দে হয়েছে চারমাত্রা। এই ব্যতিক্রম ঘটতেই পারতো না, যদি বাংলাভাষার ধ্বনিপ্রবণতা ও বাঙালির কানের সায় তার অনুকূলে না থাকতো। বস্তুতঃ এখানে ছন্দরচনার প্রচলিত প্রথা ও চোখের পাহারা এড়িয়ে ভাষার প্রবণতা ও কানের সায়ই জয়ী হয়েছেন।

হেমচন্দ্রের রচনা থেকে আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কুট করতালি কবন্ধ তালিছে, ডাকিনী দুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ হাসিছে বাজায়ে গালে।
ঊর্ধ্ব চরণে প্রেত নাচিছে বৃক্ষ হেলিছে ভূঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট্ তাণ্ডবে, কাশ উড়িছে ফুঁয়ে।…
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে যেথা মুণ্ড ঝুলায়ে শ্মশানকরাল-বেশ।

—'ছায়াময়ী' (১৮৮০), প্রস্তাবনা।

এখানে ত্রিবিধ রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। 'প্রেত' ও 'কাশ' শব্দে প্রত্নরীতি অনুসারে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ। 'কবন্ধ' ও 'তাণ্ডবে' শব্দে মাত্রাগণনা হয়েছে বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে ; অর্থাৎ এই দুই শব্দে রুদ্ধদলের অপ্রসারিত উচ্চারণ। আর, বিল্ব, ব্রহ্ম, ঊর্ধ্ব, বৃক্ষ, ক্ষুব্ধ, চণ্ড, মুণ্ড, এই শব্দগুলিতে মাত্রাগণনা হয়েছে সরল কলামাত্রিক রীতিতে, অর্থাৎ এই শব্দগুলিতে রুদ্ধদলের উচ্চারণ প্রসারিত। এখানে বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা স্বীকৃত হয়েছে, তাই এই শব্দগুলিতে কানের সায়ও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে 'প্রেত' ও 'কাশ' শব্দে স্বরের দীর্ঘতা এবং 'কবন্ধ' ও 'তাণ্ডবে' শব্দে রুদ্ধদলের হ্রস্বতা বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী, তাই এসব স্থলে কাজের সমর্থনও পাওয়া যায় না। ফলে আবৃত্তি করবার সময়ে এসব স্থলেই ছন্দের তাল কেটে যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রচনাটিতে হেমচন্দ্র নব্যকলামাত্রিক রীতির খুব কাছাকাছি এসেও ওই

কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেন নি। যদি পারতেন তবে 'ছায়াময়ী' কাব্যই নব্য-কলামাত্রিক রীতির উৎসভূমি বলে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হত।

নব্য ষট্কলপর্ব রচনার কৌশলটি মধুসূদনের কানেও প্রায় ধরা দিয়েছিল। তার প্রমাণ আছে তাঁর রচিত 'দেবদানবীয়ম্'—নামক এই কৌতুক রচনাটিতে—

কাব্যকথানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ দেবি।
কহো কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে
মনীষিবৃন্দে এ সুবঙ্গ দেশে?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো,
অমৃতরূপে তব কৃপাবারি
দেহ জননি গো, ঢালি এ পেটে।

এই রচনাটুকুতে নব্য ষট্কল পর্বের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট। ভাবীকালে দেবী বীণাপাণির কোন্ ছন্দ পছন্দ হবে এবং বাংলাদেশের মনীষীবৃন্দকে কোন্ ছন্দ 'মনানন্দ' দেবে, মধুসূদন তা জানতেন না বটে, কিন্তু তারই পূর্বরূপ সূচিত হয়েছে এই কয়টি লাইনে। নূতন ছন্দোবীণা বাজিয়ে নূতন করে যশস্বী হবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটল না বটে, কিন্তু বাংলা গীতিচ্ছন্দের ভাবী পরিণতি কিরূপ হবে, তা যে আভাসে তাঁর কানে ও অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'মনানন্দ' ও 'সুবঙ্গ' শব্দে এক কলা করে বেশি হয়েছে; 'বীণা' শব্দের ঈ-কার দীর্ঘ এবং 'অমৃত' শব্দের উচ্চারণ 'অম্রিত' বলে স্বীকৃত হয়েছে। অন্য সর্বত্র নব্য ষট্কল পর্বের রীতি অব্যাহত আছে। মধুসূদনের শ্রুতিবোধের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়।

৪

এ বিষয়ে বোধ করি ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-৫৯) কৃতিত্বই সর্বাধিক। তাঁর স্বাভাবিক শ্রুতিবোধ তাঁকে নব্য ষট্কল পর্বের রচনাকৌশল আবিষ্কারের এত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল যে, তা ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই একথার সার্থকতা সহজেই বোঝা যাবে। দৃষ্টান্তগুলি সবই 'বোধেন্দুবিকাস নাটক' থেকে গৃহীত।

মন রে আমার
একি ভ্রান্তি তোমার।

ভাবনা কেন রে ?
ভাবনা কেন রে
অরূপ স্বরূপসার ?
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এসব সৃষ্টি,
যে জন দিয়াছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার ॥···
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ,
রাশিরাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বারবার ভ্রমে বার ॥
—বোধেন্দুবিকাস (১৮৬৩), মঙ্গলাচরণ, পৃ. ১ ।

একমাত্র 'বসন্ত' শব্দটিতে নব্যষট্কল রীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে। অন্যত্র সর্বত্র রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নূতন রীতি অতি সুষ্ঠু প্রয়োগ এই রচনাটিকে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। বোধেন্দুবিকাস নাটকের এটিই প্রথম সংগীত এবং বোধ করি নব্য ষট্কল রীতির প্রথম নজির।

এবার বোধেন্দুবিকাস নাটকের তৃতীয় অঙ্ক থেকে ছুটি গীত উদ্ধৃত করি।

কে রে বামা, বারিদ বরণী,
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ,
চরণ শরণ লয় ॥
বামা হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ-হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,

কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে
ছলিছে ভুবনময়।
কে রে   ললিত রসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হোয়ে শবাসনা বামা বিবসনা
আসবে মগনা রয়॥
—'বোধেন্দুবিকাস' (১৮৬৩), তৃতীয় অঙ্ক, পৃ. ১১১।

এ রচনাটিতে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রথম স্তবকে কে, 'বামা' শব্দের বা, 'ভালে' শব্দের ভা এবং দ্বিতীয় স্তবকে 'ভূপ' শব্দের ভূ এবং সব কয়টি 'রূপ' শব্দের রূ—এই দীর্ঘস্বরান্ত দলগুলিতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ প্রত্নরীতি অনুসারে, অন্যত্র হ্রস্ব উচ্চারণ বাংলার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে। অর্থাৎ এই দুই স্তবকে নব্য ষট্‌কল রীতি স্বীকৃতি পায় নি, নব্য-প্রত্নের মিশ্রণ ঘটেছে। পরবর্তী অংশে হুহুঙ্কার, বিপক্ষ ও লাবণ্য, এই তিন শব্দে নব্যরীতি স্বীকৃতি পায়নি, ফলে এই শব্দের তিনটি রুদ্ধদল (হুঙ্, পক্, বণ্) ছন্দের ধ্বনি প্রবাহে বন্ধুরতা দোষ ঘটিয়েছে। ওই তিন স্থানেই আমাদের কান পীড়িত হয়। এই শ্রুতিকটুতা ঈশ্বর গুপ্তের কানেও ধরা পড়েছিল বলে মনে হয়। তাই তিনি এই রচনাটিতে শব্দ মধ্যবর্তী রুদ্ধদল যথা সম্ভব পরিহার করে চলেছেন। এটা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। কিন্তু উক্ত প্রকার রুদ্ধদলের অভাবে যে তরঙ্গহীন সমতলতা দেখা দেয়, তাতেও ছন্দের সৌন্দর্যহানি তথা শক্তিহানি ঘটে। এ কথাও ঈশ্বর গুপ্তের সহজাত শ্রুতিবোধের কাছে সহজেই ধরা পড়েছিল বলে মনে হয়। তাই দেখি বোধেন্দুবিকাসের তৃতীয় অঙ্কেই অনুরূপ আর-একটি গীতে উক্ত প্রকার তিনটি দোষই পরিহার করে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সহিত রুদ্ধদলসমৃদ্ধ তরঙ্গমুখর নব্য ষট্‌কল পর্বের ছন্দ রচনা করেছেন—

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুবেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥

কে রে করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহারো স্বামিনী, ভুবন-ভামিনী
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী
দামিনী-জড়িত-হাস।
কে রে যোগিনী সঙ্গে রুধির-রঙ্গে
রণতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে
কুটিলাপাঙ্গে তিমির-অঙ্গে
করিছে তিমির নাশ॥
আহা যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব
চরণ সরোজ পড়িয়ে শর্ব
করিছে সর্বনাশ।
দেখি নিকটে মরণ কর রে স্মরণ
মরণহরণ অভয় চরণ;
নিবিড় নবীন নীরদ বরণ
মানসে কর প্রকাশ॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (১৮৬৩), তৃতীয় অঙ্ক, পৃ ১১৩।

এখানে প্রথম দুই লাইনে কে, 'বামা' শব্দের বা, এ, এবং 'মানুষী' শব্দের মা—এই চারটি মাত্র দলে দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ গানের প্রয়োজনে; অন্য সর্বত্র দীর্ঘস্বরের লঘু উচ্চারণ বাংলার স্বাভাবিক রীতিতে। কিন্তু পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, রচনাটির সর্বত্র রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নব্য কলামাত্রিক রীতি নিখুঁত ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। রুদ্ধদলগুলি ধ্বনি-প্রবাহকে ব্যাহত ত করেই নি, বরং তাকে অতি আশ্চর্যরূপে তরঙ্গিত করে তুলেছে। ঘন ঘন রুদ্ধদলের ধ্বনি-সংঘাতে এই রচনাটিতে ছন্দ-সংগীত ঝংকৃত হয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যের ছন্দ-ঝংকারের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে ঈশ্বর গুপ্ত সচেতন শিল্পীরূপে এ কাজ করেন নি; তিনি তাঁর সহজাত শ্রুতিনৈপুণ্যের দ্বারা চালিত হয়েই এই অপূর্ব ছন্দসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। তাই দেখি তিনি বোধেন্দুবিকাস নাটকেরই পরবর্তী অঙ্কগুলিতে এই নূতন রীতিকে অব্যাহত রাখতে পারেন নি। যেখানেই তিনি প্রচলিত প্রথার দ্বারা চালিত হয়েছেন, সেখানেই তাঁর রচনা ছন্দের এই নব সৌন্দর্য থেকে

বঞ্চিত হয়েছে। আর, যেখানেই তাঁর কান প্রথার কড়া নজর এড়িয়ে তাঁকে স্বভাবের পথে চালিত করেছে সেখানেই এই সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে। আর একটা দৃষ্টান্ত দিই—

মরকতমণি মণ্ডল মণ্ডিত
মোহন মুকুট-মুখসুশোভিত,
মথুরামহীপ-মুকুন্দ মাধব,
মধুর মুরলিধর হে।...
পরমানন্দ-প্রেম প্রসঙ্গ,
প্রমোদ পীযুষ-পূরিত অঙ্গ,
পতিতপাবন প্রণত পালক,
পরম পুরুষ পরহে॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (১৯০১), পঞ্চম অঙ্ক, পৃ ১৮১।

প্রথম স্তবকে রুদ্ধদলের মর্যাদা রক্ষিত হয় নি প্রথার প্রভাবে। অথচ দ্বিতীয় স্তবকে রক্ষিত হয়েছে সহজাত শ্রুতিরুচির প্রেরণায়। এই শ্রুতিরুচির প্রভাব ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় দেখা দিয়েছিল বহু পূর্বেই।

তোমার কার্য নহে নিবার্য।
পাইবে ধার্য শিখের রাজ্য॥
না হয় ভঙ্গ রণতরঙ্গ
শোণিত রঙ্গ-শোভিত অঙ্গ॥

—ফিরোজপুরের যুদ্ধে জয়।

এই অংশটুকু নব্য ষট্‌কল পর্বের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর গুপ্তের কানে এই ছন্দের মাধুর্য ধরা দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর জ্ঞানে এটি সাবেক রীতির পাঁচ মাত্রা পর্বের ছন্দ বলেই প্রতিভাত হয়েছিল—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে পঞ্চকল পর্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে। ফিরোজপুর যুদ্ধের তারিখ ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং নব্য ষট্‌কল পর্বের প্রেরণা বাংলার কবির কানে দেখা দেয় সেই সময় থেকেই, একথা বলা অসংগত নয়। তবে এই সময়কার প্রেরণা খুবই পরোক্ষ ও ক্ষীণ, তাতেও সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বোধেন্দুবিকাস রচনার সময়ে কবির কানে যে আভাস জেগে ওঠে তা তাঁর সচেতন অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারলেও তার প্রবলতাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বোধেন্দুবিকাস প্রথমতঃ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য কোনো কোনো অংশে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পুনর্লিখিত হয়। অতঃপর ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) কয়েক বৎসর পরে তাঁর ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক এই নাটকের প্রথম তিন অঙ্ক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালে। বোধেন্দুবিকাসের শেষ তিন অঙ্ক (চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ) কখন প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানি না। ১৯০১ সালে প্রকাশিত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে বোধেন্দুবিকাস নাটকের ছয় অঙ্কই সমগ্র ভাবে প্রকাশিত হয়। অতএব মানসী-যুগে নব্য কলামাত্রিক রীতি প্রবর্তনের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বোধেন্দুবিকাস নাটক থেকে উক্ত নূতন রীতিতে ছন্দ রচনার প্রেরণা পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

তথাপি একটি সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিতা-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১২৯২ (ইংরেজি ১৮৮৫) সালের আশ্বিন মাসে। ওই কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার দোষ গুণের বিচার প্রসঙ্গে তাঁকে 'শব্দের প্রতিযোগি শূন্য অধিপতি' এবং 'অপূর্ব শব্দকৌশলী' বলে অভিহিত করেন এবং ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার দোষ-গুণের নিদর্শন স্বরূপ বোধেন্দুবিকাসের তৃতীয় অঙ্ক হতে দুটি গীত উদ্ধৃত করেন। 'কে রে বামা' ইত্যাদি যে দুটি রচনা অপূর্ব ছন্দ কৌশলের নিদর্শনের হিসাবে আমরা উদ্ধৃত করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুটি রচনাই উদ্ধৃত করেছেন ঈশ্বর গুপ্তের অপূর্ব শব্দ কৌশলের দৃষ্টান্ত হিসাবে। অর্থাৎ ওই রচনা দুটির শব্দ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, ও-দুটির ছন্দোনৈপুণ্যের প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু ওই ছন্দ যে অলক্ষিত ভাবেই তাঁর কানের সায় পেয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই।

তৎকালে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহের বঙ্কিম রচিত এই ভূমিকাটি কি রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়ে নি? না পড়াই অস্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যখ্যাতির চরম সীমায় উপনীত, আর রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উভয়ের তৎকালীন পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাও সুবিদিত। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ সে সময়েই পড়েছিলেন, একথা মনে করা অসমীচীন নয়। যদি পড়ে থাকেন, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত রচনা-দুটির শুধু শব্দকৌশল নয়, ছন্দকৌশলও তাঁর শ্রুতিরসবোধের কাছে সহজেই ধরা

পড়েছিল, এ কথাও মনে করতে পারি। ১২৯০ (ইংরেজি ১৮৮৩) সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্ধুদূত' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গভীর ছন্দ-সচেতন তার পরিচয় দিয়েছিলেন। সে বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। সুতরাং ১৮৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ যদি ঈশ্বর গুপ্তের উল্লিখিত রচনা থেকে নূতন ছন্দের প্রেরণা পেয়ে থাকেন, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। তাতে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বেরও হানি ঘটে না। ঈশ্বর গুপ্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই নূতন ছন্দোরীতির পথ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে তার মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ যদি ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত একটি নবরীতির নিদর্শন পেয়েই নূতন পথ নির্মাণে অগ্রসর হয়ে থাকেন, তবে সে কৃতিত্ব তাঁরই। তৎকালে হেমচন্দ্র প্রমুখ অন্য কবিরা তো সে পথ নির্মাণে অগ্রসর হতে পারেন নি।

যা হক, এ কথা সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের অপূর্ব রচনা নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর একটি কবিতা সাহিত্য-সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেন ১৮৮৫ সালের শেষ দিকে, আর তার কয়েক মাস পরেই ১৮৮৬ সালের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথের 'বিরহ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় নূতন ছন্দোরীতির অগ্রদূতরূপে। এই দুয়ের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি না তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা কঠিন।

৬

আমরা দেখলাম হেমচন্দ্রের 'ছায়াময়ী' কাব্যে (১৮৮২), মধুসূদনের 'দেবদানবীয়ম্' নামক কৌতুক রচনাটিতে এবং তারও বহু পূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের বোধেন্দুবিকাস নাটকে বাংলা নব্য ষট্‌কল পর্বিক ছন্দের পূর্বাভাস সূচিত হয়। তার আবির্ভাব হয় প্রচলিত প্রথার নিষেধ এড়িয়ে বাংলাভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা ও বাঙালির কানের পরোক্ষ সমর্থনের জোরে ব্যতিক্রমের রূপ ধরে। বাংলাভাষার ও বাঙালি কানের সায় যদি না থাকতো তাহলে ও-সব ব্যতিক্রম ঘটতেই পারতো না। এক সময়ে যা দেখা দেয় ব্যতিক্রম রূপে, প্রথার কড়া পাহারা এড়িয়ে—কালক্রমে তাই দেখা দেয় নিয়ম হয়ে অসামান্য মনস্বিতা বা প্রতিভার আনুকূল্যের জোরে। নব্য ষট্‌কল পর্ব ঈশ্বর গুপ্ত-মধুসূদন-হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিদের রচনার মাঝে মাঝেই দেখা দিচ্ছিল ব্যতিক্রম রূপে প্রচলিত রীতির অসতর্কতার ছিদ্রপথে। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যতিক্রম গুলিকেই সাদরে বরণ করে নিয়ে শিল্পমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আশৈশব সংগীতচর্চা, জয়দেব বিদ্যাপতি প্রমুখ কবিদের রচনার

সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সর্বোপরি তাঁর সহজাত শ্রুতিরুচি তাঁর কানকে প্রথম থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিল এই নব্য রীতিকে বরণ করে নেবার পক্ষে। একেই বলা যায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ। অন্ততঃ বাংলা নব্য ষট্‌কল পর্বের পক্ষে যে একথা সত্য তাতে সন্দেহ নেই।

এবার রবীন্দ্র-রচনা থেকে একটি নব্য ষট্‌কলপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ,
বাহু বাড়াইব তপনে॥

—'চিত্রা' (১৮৯৬), নগর সংগীত।

বোধেন্দুবিকাসের তৃতীয় অঙ্ক থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় রচনাটির সঙ্গে এই রচনাটির ছন্দোগত সাদৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর। 'ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন,' বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যে অন্ততঃ ছন্দের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে সত্য তাতে সন্দেহ নেই।

সপ্তকল পর্ব

রবীন্দ্র-সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ বাহন নব্য ষট্‌কল পর্বের ছন্দ। লক্ষ্য করবার বিষয়, ঈশ্বর গুপ্তও শুধু গীতি-রচনাতেই ষট্‌কল-পর্বিক ছন্দ রচনার প্রতি 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ' হয়েছিলেন।

বাংলা গীতিকবিতায় ষট্‌কল পর্বের পরেই পঞ্চকল পর্বের স্থান। চতুষ্কল পর্বের স্থান তারও নিচে, অন্ততঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যে। আর সপ্তকল পর্বের স্থান সকলের শেষে। অতএব সপ্তকল পর্বের আলোচনাটা সংক্ষেপেই সমাপ্ত করব।

সংস্কৃত সাহিত্যে সপ্তকল পর্বের প্রয়োগ নেই বললেই হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের একটি মাত্র গীতে (সপ্তম) সপ্তকল পর্বের আভাস আছে। কিন্তু সেটিকেও বিশুদ্ধ কলামাত্রিক বলে বর্ণনা করা চলে না। প্রাকৃত সাহিত্যে

সাতকলামাত্রা পর্বের প্রয়োগ আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে এ ছন্দের প্রয়োগ বিরল হয়ে আসে। অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়স থেকেই সাতকলার পর্ব রচনা করেছেন। কিন্তু জীবনের কোন পর্যায়েই তিনি সাতকলার পর্বকে বিশেষ প্রাধান্য দেন নি। বস্তুতঃ তাঁর হাতে চারকলা, পাঁচকলা, ও ছয়কলার পর্ব যে উৎকর্ষ লাভ করেছে, সাতকলার পর্ব কখনও সে উৎকর্ষের অধিকারী হতে পারে নি। এখানে দু-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত তুলে দিলেই বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁঝে,
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন গুন স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও চলে গেলে সময় হল তারো,
ফুটিল তব পূজাতরে॥

—'উৎসর্গ' (১৯১৪), ৪৩।

জীবন মরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো-ছায়া করিছে কোলাকুলি,
আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।

আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশাপাশি নূতন পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে ॥

—রচনাবলী ১৫ : সংযোজন, জীবনমরণ (১৯২৮)।

রুদ্ধদলের বিরলতায় এ দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্টরূপে তরঙ্গিত হয়ে উঠতে পারে নি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের হাতে চারকলা, পাঁচকলা ও ছয়কলা পর্বের রচনা যে অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গিতে লীলায়িত হয়ে উঠেছে, সাতকলা পর্বের রচনায় সে তরঙ্গলীলা ফুটে উঠতে পারে নি।

কিন্তু এই সাতকলার পর্বই প্রত্ন-পদ্ধতির রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাতে যে বলিষ্ঠ মাধুর্য অর্জন করেছে, বাংলা সাহিত্যে তারও তুলনা নেই।

মাতৃ মন্দির | পুণ্য অঙ্গন | কর মহোজ্জ্বল | আজ হে,
বর পুত্রসংঘরি | রাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ | বাজ হে |
ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে।...
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়-পুণ্য সৌরভ
এস তেজঃ সূর্য-উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর-মাঝ হে।
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম, জয় তপস্বী রাজ হে ॥

—গীতবিতান, প্রথমখণ্ড (১৩৫৮), স্বদেশ, ১৭।

যে বলিষ্ঠ ভাবগাম্ভীর্য এই গীতিরচনাটিকে দীপ্ত মহিমায় মণ্ডিত করেছে, এই সপ্তকল পর্বের ছন্দটিও তার যোগ্য বাহনের মর্যাদা অর্জন করেছে। এটাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। বস্তুতঃ প্রকাশশক্তির গৌরবে সাতকলা পর্বের ছন্দ যে অন্য কোনো পর্বের অপেক্ষা হীন নয়, এই দৃষ্টান্তটিই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

ধ্যানময় অতীত ভারতের সমগ্র অধ্যাত্মসত্তা যেন করুণোজ্জ্বল রসমূর্তিতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমাবিষ্ট ও আবির্ভূত। কোনো এক বৈশাখী প্রভাতে আকাশ সেদিন আলোকিত হিল্লোলিত,—শঙ্খধ্বনি-মুখরিত! মানুষকে নতুন আশার রঙে রঞ্জিত করে যুগরবি রবীন্দ্রনাথের উদয় হোলো। যে প্রণব ঝংকারে সকল জগৎ রূপায়িত, তারই সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন তিনি মানুষের চির-পবিত্র, চিরবিরহবিধুর হৃদয়-বীণার গান। সে দিন অপূর্ব মিলন-মন্ত্রে—কালবৈশাখীর তাণ্ডবের মধ্যেও,—আসন্ন সৃষ্টির মূলে গীতাঞ্জলির নব-জীবন-রস সিঞ্চিত হোলো।

অতীতের বাল্মীকি-প্রতিভা যেন বর্তমানের নবযুগ-রবিরূপে প্রাচীর আকাশ রঙীন করে,—শতবীণাবেণুরবে শঙ্খধ্বনি সহযোগে উদিত হলেন। কোনো এক গ্রীষ্মের প্রভাতে শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ শ্যাম তপোবনে আমি ক্লাসে বাল্মীকি-স্তব পড়াচ্ছিলাম। গুরুদেব পিছনে দুটি হাত রেখে, ঈষৎ আনত মুখে পাশেই পায়চারি করছিলেন। পড়ানো শেষ হ'লে হেসে বলেছিলেন, 'আমি বাল্মীকির গঙ্গাস্তব বড় ভালবাসি—প্রায়ই পড়ি।'

বুধবারের উপাসনা-আসরে রঙীন-কাঁচের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত স্বর্ণকিরণের আভায় গুরুদেবের সৌম্য-গম্ভীর মূর্তি অতীত ভারতের কোনো ঋষি-পুরুষের বলে মনে হোতো! তাঁর ঝংকৃত উপাসনা-বাণীর মধ্যে যেন বিশ্বের গভীর ঐক্যের সুর মন্দ্রিত হয়ে উঠতো।

প্রকৃতির সন্তান রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-ভবনের ছাদে বসে দেখতেন উপরে অনন্ত নীলাকাশ কার যেন মহিমময় কৃপায় ভরপুর; নিচে শাল-তমাল-আমলকী-বন যেন দখিন হাওয়ায় সৌরভ ছড়িয়ে গভীর সে কোন্ ধ্যানে মগ্ন। মহর্ষির হাতে,—প্রকৃতির স্নেহময় ক্রোড়ে তাঁর ভিতরটা যে ভাবে গড়ে উঠেছিল,—যে ভাবে তিনি অন্তরের মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই ভাবেই তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সাজিয়ে তুলেছিলেন! সুদূর-প্রসারিত সেই ফাঁকা মাঠে ঢেউ-খেলানো রাঙামাটির ডাঙ্গাতে শাল-আমলকী-

আম্রবনে তাঁরই সেই সারস্বত সুর যেন নিয়ত বাজছে। তাঁর আশ্রমে,—শিক্ষা-সাধন ও স্বাবলম্বী সেবাজীবনের জ্ঞানোদয়-কেন্দ্রে প্রাচীন ঋষির তপোবনের হাওয়া বইতো নিরন্তর।

শিক্ষায় আনন্দের উৎস-সন্ধানে, নতুন পরিবেশ-সৃষ্টিতে, মানুষের ধ্যানময় অন্তরের বীণাবাদনের সঙ্গে সৃষ্টির গভীর ঐক্য-সাধনই সত্য-শিব-সুন্দরের আনন্দ-উচ্ছল অভিব্যক্তি! সেই ধ্যানময় সুর কেউ ধরতে পারুক আর নাই পারুক, অজ্ঞাত অবচেতন স্তরে সকলেরই মনে মনে তার প্রভাব আছে।

এ-কথায় কোনোরকম প্রতিবাদের আশঙ্কা নেই যে, মানুষমাত্রেরই চরিত্র আদিতে বোধ হয় অবচেতন স্তরেই (subconscious region) সুপ্ত থাকে। বাহ্য সংস্পর্শে বা লঘুগুরু প্রতিঘাতে সেখান থেকেই একটু একটু করে হয় তার উদ্বোধন। মনে আছে, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন-সোসাইটির এক সভায় রবীন্দ্র-শিক্ষার এই নিগূঢ় মন্ত্রটি আমি যখন ব্যাখ্যা করি, তখন অধ্যাপক গডফ্রে টমসন একে 'এক অভিনব চিন্তা' বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে সকালে বা বিকেলে রম্য পরিবেশের মধ্যে অধ্যয়ন-ব্যবস্থা, মন্দিরের ধ্যানশান্ত পারিপার্শ্বিকে অথবা মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রস্ফুটিত শালফুলের সৌরভ, সংগীত এবং উপাসনার অনাবিল আনন্দ,—কষ্টসহিষ্ণুতা ও সেবা-নীতির মধ্য দিয়ে চরিত্রের উন্মেষ ঘটানোই শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-প্রণালীর মূল কথা। গান, ছবি-আঁকা বা কবিতা-পাঠের আসল উদ্দেশ্য ভেতরের সুপ্ত ব্যক্তিত্বকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে বা অবস্থা-সংঘাতে জাগ্রত করে তোলা।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে, তখন কুসুমবর্ষী শালবীথিতে আচার্য রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বেড়াতে-বেড়াতে অল্পক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে অধ্যাপনা শুনতেন, মাঝে মাঝে ক্লাসে এসে বসতেন, কখনও বা বই চেয়ে নিয়ে নিজে পড়া দেখিয়ে দিতেন। মনে আছে, সেদিন বটতলাতে ক্লাস চলছিল। সবুজে রক্তাভায় মিশ্রিত বটের কচি পাতায় প্রাতঃসূর্যের কিরণ যেন পিছলে পড়ছিল। গুরুদেব এসে স্মিতমুখে বইখানি আমার হাত থেকে নিলেন, নিয়ে বললেন : আমি কেমন পড়াই একটু দেখো।

এই সময় রমাপ্রসাদ চন্দ এবং কয়েকজন বিদেশী অতিথি শান্তিনিকেতন দেখতে এসেছেন। আমার ক্লাশে ওয়ার্ডসোয়ার্থের Skylark অবলম্বনে গুরুদেবের আশ্চর্য পড়ানোর কৌশল দেখে রমাপ্রসাদবাবু বললেন—'গুরুদেব দেখছি কবির চেয়ে শিক্ষক হলেই ভাল হোতো।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের কথাটা উল্লেখ না করে পারছি না। সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ তখন নর্ম্যাল স্কুলে—গ্যালারীতে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে 'singing merrily-merrily'র স্থলে 'সিঙিং মেলালিং মেলালিং' বলে পড়তেন। সেই নর্ম্যাল স্কুলের কথা উঠেছিল সেবার। প্রেসিডেন্সি কলেজের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে আমি কলেজে গিয়েছিলুম। অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার মহলানবীশ ছিলেন সে-সভায়। চায়ের টেবিল সাজানো হয়েছে। নানা লোকের সমাবেশ। তারই মধ্যে অধ্যক্ষ মহলানবীশ এগিয়ে এসে বললেন—'গুরুদেব তো শুনেছি নর্ম্যাল স্কুলে পড়েছিলেন—তাঁর ভর্তির তারিখ তোমার স্কুলের কাগজপত্রের মধ্যে একটু খুঁজে দেখো তো।'

ক্যালকাটা নর্ম্যাল স্কুলে ফিরে গিয়ে তাই নথিপত্র ঘাঁটতে লাগলাম। কিন্তু যে বছর উনি ভর্তি হয়েছিলেন, সে বছরের রেজিষ্টারটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল কেবল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের হাতে লেখা খানকতক নোটিস আর নির্দেশনামা। এ থেকে বোঝা গেল সেই সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে রবীন্দ্রনাথ নর্ম্যাল স্কুলে পড়েছিলেন।*

আমাদের শিক্ষণ-ব্যবস্থাতে রবীন্দ্রনাথ যোগ করে গেছেন প্রাচীন তপোবনের আনন্দ-সুন্দর সুরটি। তাঁর উদ্ভাবিত এই আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবেশের মাঝেই পূর্ণ মানবতার সফল উদ্বোধন সম্ভব।

তাই যেদিন সকালে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে গুরুদেবের দীর্ঘ ক্ষৌম আলখাল্লা-পরিহিত, স্বপ্নময়, স্ফুরিত-পদ্মলোচন-শোভিত, বহু দুর্লভ ঋষি মূর্তি দেখলাম,—উপাসনা-মন্দিরের সিংহদুয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে, থেমে-থেমে, শান্ত ভাবে মৃদু-মন্দ্রিত সুরে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন তিনি, আর সেই উদাত্ত গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির আহ্বানে শীতের কুয়াশাঢাকা আশ্রম-জীবনে আস্তে আস্তে জাগছে প্রাণের স্পন্দন,—তখন মনে হয়েছিল কোনো স্বর্গীয় দেবদূত বুঝি বিশ্বের কলুষ ও জড়তা দূর করে পরিপূর্ণ মানবসত্তার উদ্বোধন-গীতি গাইছেন! আজ রবীন্দ্র-শতাব্দীর পুণ্য পাদপীঠে শত প্রদীপের প্রোজ্জ্বল আলোকমালার মধ্যে সেই বিশ্বমানবাত্মার শুভ-আবাহন হোক। মনে মনে গান জেগে ওঠে—তুমি কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধরায় আস···!

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন নর্ম্যাল স্কুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনো সেখানে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করেননি। তিনি যখন সে-স্কুলে প্রবেশ করেন, বিদ্যাসাগর তখন অন্য কর্মে মন দিয়েছেন। এইটিই এ-প্রসঙ্গে প্রচলিত এবং সম্ভবতঃ অভ্রান্ত তথ্য। —সম্পাদক

উত্তরায়ণের ঘরটি ছোটদের কাছে বড় লোভনীয় ছিল। কোনো কোনো দিন দুপুরের আহারের পর গুরুদেব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ডেকে গল্পের ক্লাশ বসাতেন। গল্প বা আর কিছু বলা হলে,—তাদের মুখ দিয়েই তা বার করে নিয়ে গুরুদেব তাদের খাতায় সেগুলি লিখিয়ে নিতেন। গল্পগুজব-হাসি-আনন্দের মধ্যে ঘণ্টাগুলো এমন কেটে যেত যে, ছেলেমেয়েরা বুঝতেই পারত না যে সেটাও একটা ক্লাশ। ছোটদের সঙ্গে কবি সমান বন্ধুর মত নিঃসংকোচে মিশতেন।

একদিন অলিখিত এক নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা হোলো। ছেলেমেয়েরা গল্পের প্লটটি জেনে নিয়ে আপন আপন ভূমিকা অনুযায়ী নিজেরাই সংলাপ রচনা করলে। গুরুদেব কাছে বসে থেকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। তারপর সেটির রূপ দেওয়া হয়। মলয় তখন উঁচু ক্লাশে উঠেছে। কিছুদিন হোলো নতুন 'ফাল্গুনী' নাটক প্রকাশিত হয়েছে সে-সময়টায়। 'ফাল্গুনী' দেখে সে বলে উঠলো—'ও মুশাই, ওসব আমাদেরই লেখা, গুরুদেবের নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে!' শান্তিনিকেতনে শিক্ষকদের তখন 'মুশাই' বলা হোতো।

একদিন বিকেলে উত্তরায়ণের ঘরে বসে গুরুদেব রানু মুখুজ্জের ছবি আঁকা দেখছিলেন। আমি গেলে বললেন—'তোমার ছাত্রী তো তুমি ক্লাশে যা-কিছু পড়াও সবই এসে আবৃত্তি করে। শেয়ালকাঁটা গাছের ফুলগুলো কেমন আঁকছে দেখো।'

আমি বললুম, 'তা তো হোলো, কিন্তু ঘরের চারিদিকে যে শেয়ালকাঁটার বন হয়ে উঠেছে।'

তিনি বললেন—'ও গাছের ফুল আমার বড় ভালো লাগে; তাই রেখেছি।' মনে পড়লো, কবি একদিন আমাকে বলেছিলেন—'বাগানের গোলাপের তুলনায় নিঃশব্দে গন্ধবিলানো বনের অনাদৃত মল্লিকা ফুলটিও কোনো অংশে কম নয়।' তাই বুঝি তিনি পাখিদের খাওয়ানোর সময় উড়ে আসা ঝাঁক ঝাঁক কাককেও তাড়াতে পারতেন না!

গ্রীষ্মের ছুটিতে উত্তরায়ণের সামনে খোলা জায়গায় বসে কবিগুরু তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরে আলোচনা করতেন। এই ক্লাশে তিনি কি অবস্থায় কবিতাগুলির জন্ম হয়েছিল এবং কীই বা তাদের সরলার্থ, সে-কথা বুঝিয়ে দিতেন। বাইরের সমালোচকরা যে তাঁর কবিতাকে গভীর দার্শনিক জটিলতার মধ্যে ফেলবে, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। অবিশ্যি এমনও হয়েছে যে, কবি নিজেই নিজের কবিতার অর্থ পরে বুঝতে পারতেন না! যাই হোক,

এই ক্লাশগুলিতে কবির রচনা সঠিক বুঝতে পারবার সুযোগ পেতুম আমরা। আইরিশ অধ্যাপক কলিন্‌স্‌,—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁর এই সব গ্রীষ্ম-ক্লাশের পাঠ শুনতেন। ড্রইং ক্লাশের পাশেই ছিল তৎকালীন গানের ক্লাশ। আমি একদিন গানের ক্লাশের জন্যে খোলকরতালের কথা জিগেস করতে গুরুদেব বললেন—'ছেলেমেয়েরা কোনোকিছু না চাওয়া পর্যন্ত আমি তাদের কোনো জিনিস দিই না। প্রথমে স্কুল বসলে তারা গানের সমিতি খুলতে চাইল; আমি বললাম—কোনো আপত্তি নেই। দু'দিনও পুরো কাটেনি—তারা এসে বললে, হারমোনিয়াম চাই। আমি বললাম—তথাস্তু। রামকুমার বুদ্ধিমন্ত সিং ওদের মণিপুরী নাচ শেখাচ্ছেন। তাঁর খোলকরতাল না হলে চলছে না, তাই ওগুলো আনা হয়েছে। এই বুদ্ধিমন্ত সিং ছিলেন আশ্রমের একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি। সম্পর্কে তিনি মণিপুরের রাজা টিকেন্দ্রজিতের ভাইপো হতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি নাচগান কারুশিল্প নিয়েই আত্মগোপন করে থাকতেন। শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের প্রথম সূত্রপাত হয় এঁরই উৎসাহে। ইনি কোনো-কোনো দিন আমাদের সঙ্গে মাঠে বেড়াতে যেতেন। পথের মধ্যেই হয়তো 'আয় আয়রে পাগল, তোর মিছা কথার ঘুরপাকে' বলে তুড়ি দিয়ে, পাক খেয়ে খেয়ে নাচ শুরু করে দিতেন।

একদিন ছুটির সকালে রান্নাঘরের দক্ষিণে বিধুশেখর শাস্ত্রীমশাই আর আমি গুরুদেবের সঙ্গে পায়চারি করছিলাম। একটি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে গুরুদেব শাস্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। তারপর শাস্ত্রীমশাই কোনো কাজে চলে গেলে আমি কৌতূহলবশে গুরুদেবকে জিগেস করেছিলাম—'আপনার উপাসনা-পদ্ধতিটা কেমন জানতে ইচ্ছা করে। আপনি কি যোগপ্রাণায়াম করেন?' তিনি হেসে বললেন, 'আমার বাঁধাধরা কোনো সাধনা নেই। তবে শেষ রাতটা আমি ধ্যানে কাটাই। ঐসময়ে অনেক সত্যই মনে এসে উদয় হয়। সত্যের সেই আলো কখন যে আসে, আর কখন যে যায়, তা বলতে পারি না।'

একদিন রাত দুটোর সময় আশ্রমের কুটির থেকে আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। দূরে শুধু একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। জগদানন্দ বাবু বাইরে শালতলায় খাটিয়া পেতে ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতা দেখছেন। এমন সময় দেখি কে যেন হন হন করে এগিয়ে আসছেন। আরে, এ যে স্বয়ং গুরুদেব! সেই গভীর রাতেই কবি চলেছেন দীনেন্দ্রনাথের ভবনের দিকে—মনে হঠাৎ একটা গান এসেছে তাঁর—তারই সুরটা 'দিনু'কে ধরিয়ে দিতে হবে!

রবীন্দ্র-নাট্যে অভিব্যক্তিবাদ

শ্রীঅশোক সেন

ইউরোপীয় নাটকে অভিব্যক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দেয় ১৯১০ সালে—এবং ১৯২৪ অবধি এই ধারায় নাট্য রচনা চলতে থাকে। এর পর পশ্চিমের নাট্যকারেরা বুঝতে পারেন,—পৃথিবীর যে সোনালী ভবিষ্যতের ছবি তাঁরা একদিন কল্পনার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন,—যথাসময়ে তার রূপায়ণ হোলো সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। এই ব্যর্থতার ফলেই তাঁদের আন্দোলন ভেঙে যায়। এ-বিষয়ে ও-দেশী সমালোচকেরা লিখেছেন: The hatred of war and the hope that after the war a new and better world would be built up became the central idea of Expressionism. The troubled time after the War involved the failure of their ideals and a breakdown of the movement was inevitable. That stabilisation of Europe along lines that did not correspond to their hopes brought the movement to an end about 1924. [Expressionism—By Samuel and Thomas.]

রবীন্দ্রনাথের চারটি নাটক—অর্থাৎ মুক্তধারা [বৈশাখ ১৩২৯ (১৯২২)], রক্তকরবী [১৩৩৩ (১৯২৬)], কালের যাত্রা—রথের রশি [৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ (১৯৩২)], তাসের দেশ [ভাদ্র, ১৩৪০ (১৯৩৩)]—এই তাসের দেশ তাঁর 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র (প্রথম প্রকাশ ১৮৯২) নাট্যরূপ—এই চারখানি নাটকই সম্পূর্ণ expressionistic style-এ লেখা।

অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, আগে থেকেই প্ল্যান করে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধারার নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় পৃথিবীর সব দেশেই শিল্পীদের চিন্তাধারাটা একই গতিতে, একটা নির্ধারিত পথ ধরে চলেছে। সহজ কথায় একে বলতে হয় collective activity displayed by writers and artists of the world.

সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদের আবির্ভাবের কথা মনে পড়ে: জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমাদের চোখে পড়বে যে, সাহিত্যে নানা ধরনের

শ্রেণীগত এবং আন্দোলনগত বিভেদ সৃষ্টির দ্বারাই পণ্ডিতেরা জার্মান সাহিত্যের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় বিভেদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে Storm & Stress, Classicism, Romanticism, Young Germany, Naturalism, Impressionism, Neo-Romanticism প্রভৃতি শিল্পাদর্শের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ। বিবর্তনের দিক দিয়ে এর পরের যুগটাই হোলো Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদের যুগ।

১৯১০ সাল থেকে ১৯২৪ সাল,—অর্থাৎ প্রায় পনের বছর অবধি এই নতুন আন্দোলনটি পুরোদমে চলেছিল। এই কয়েক বছর ইউরোপে দারুন দুর্যোগের সময় গেছে—মাঝে আবার ঘটে গেল সর্বনাশা প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের আগে থেকেই একজাতীয় চিন্তাশীল লেখক দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা তদানীন্তন মানুষের জীবনধারা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দেশের শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে একটা বিরাট অনাচার লক্ষ্য করে, এসবের ভেতরে একটা আমূল পরিবর্তন আনবার প্রয়োজনীয়তা মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলেন। অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের কাছে বিষবৎ লাগছিল নিও-রোমান্টিক স্কুলের রচনা-পদ্ধতি—'its cult of the past, its mystic adoration of nature, its worship of the aesthetic personality, its dissection of the soul, its aristocratic approach to art'—R. Hinton Thomas : Expressionism.

অভিব্যক্তিবাদীরা চাইলেন জীবনকে এবং সমস্ত জাগতিক সমস্যাকে সত্যের আলোকে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে পূর্ণভাবে দেখতে। সৌন্দর্যকে জীবন থেকে আলগা করে নিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টাটাই যে একটা অবাস্তবতা এবং এক ধরনের escapism,—তাঁদের নিজেদের রচনায় এই সত্যের ওপরেই তাঁরা জোর দিতে লাগলেন। তাই বলে, তাঁরা কিন্তু বাস্তববাদী বা naturalists ছিলেন না। তাঁদের লেখবার ভঙ্গিটা ছিল সাংকেতিক।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীর দল যেন আগে থেকেই অনুভব করেছিলেন যে, এক মহাসংকটের সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। সেই হিসেবে তাঁরাই যেন ইঙ্গিত দেন আসন্ন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে। স্বভাবতঃই—যুদ্ধের সময়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জীবনে এই শ্রেণীর লেখকদের প্রভাব খুব বেশি ভাবেই পড়তে থাকে। যুদ্ধ নারকীয় ব্যাপার এবং তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়; যুদ্ধের শেষে পৃথিবী আবার নতুন ভাবে, সুন্দরতর ভাবে গড়ে উঠবে—এই ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

তাঁদের ঘোষণা। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যুদ্ধ যখন শেষ হোলো, তখন দেখা গেল যে অভিব্যক্তিবাদীদের নির্ধারিত আদর্শ পথে পৃথিবী মোটেই এগিয়ে চলছে না! ফলে, তাঁদের আন্দোলনটা আপনা থেকেই ভাঙতে শুরু করে—এবং ১৯২৪ সালে সে-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়।

কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটলেও যে ভাবধারার মূলে রয়েছে সত্য, তা কখনো সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হতে পারে না। তাই আজও ইউরোপে 'ওয়েটিং ফর গোডো' এবং 'লুক্ ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার'-এর মতো নাটক দিনের পর দিন মঞ্চস্থ হয়ে লোকের চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নাটকের জনপ্রিয়তাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

যাক্—আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক্। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে মানুষ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার পাকা গাঁথুনি গড়ে তুলতে গিয়ে, ধর্ম, ব্যক্তিসত্তা, হৃদয়, আত্মা সব কিছুকেই বিসর্জন দিয়ে নিজেকে করে ফেলেছিল কলে-তৈরী পুতুলের মতন। এই সব পুতুল-মানুষদের বর্ণনা দিতে গিয়ে T. S. Eliot লিখেছিলেন:

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw! Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In dry cellar......ইত্যাদি

চেক নাট্যকার চাপেক, জার্মান নাট্যকার কাইজার, টোলার ও হাসেন ক্লেভার তাঁদের কয়েকটি বিখ্যাত নাটক লিখেছেন expressionistic style-এ। আমেরিকান নাট্যকারদের মধ্যে ও'নিল তাঁর The Hairy Ape-এ, সোফি Machinal-এ, জন হাওয়ার্ড লস্ন Roger Bloomer ও Processional-এ ট্রেডওয়েল এবং এল্মার রাইস্ The Adding Machine-এ—আর, The Subway নাটকে অভিব্যক্তিবাদী রচনা-কৌশলেরই আশ্রয় নিয়েছেন।

সাধারণতঃ এ ধরনের নাটকে পাত্র-পাত্রীরা হয় যন্ত্রযুগের মানুষ। নাট্যকার তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে এই সব মানুষের ভেতরকার আসল চেহারাটা সবার সামনে তুলে ধরেন। আজকের সমাজ ও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার কথাটাও তাঁরা ইঙ্গিতে-ইশারায় স্পষ্ট করে তুলে ধরেন পাঠক এবং দর্শকদের কাছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই চাপেকের R. U. R., কাইজারের Gas, রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি এবং তাসের দেশ নাটকের কথা বিচার করে দেখা দরকার। রক্তকরবীতে ভাবের বাহক হিসেবেই সংকেতের ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে লেখার ধারাটা expressionistic,—symbolistic নয়।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী জীবনের প্রতিলিপিকার নন,—তিনি হচ্ছেন জীবনের ভাষ্যকার। অর্থাৎ চিরাচরিত নিয়মে কাহিনীর ওপর প্রাধান্য দিয়ে, তিনি নাট্য রচনা করেন না বা ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা দেওয়াটাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। চরিত্র বা ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরাটাই হোলো তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

'মুক্তধারা' নাটকে দেখি, যন্ত্ররাজ বিভূতি যন্ত্রের বিকৃত ব্যবহারে শুধু শিবতরাইয়ের প্রজাদেরই সর্বনাশ কারণ ঘটান নি,—এই যন্ত্র তৈরি করতে গিয়ে উত্তরকূটের প্রজাদেরও বহু দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে—এমন কি অনেককে প্রাণ পর্যন্ত বলি দিতে হয়েছে। এই সব অত্যাচারের স্বরূপকে দুটি ছোটো সংকেতের সাহায্যে কবি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে ধরেছেন—অম্বার বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনি—'সুমন, আমার সুমন ……'—এবং বটুকের সাবধান-বাণী—'সাবধান বাবা, যেওনা ওপরে…বলি দেবে…নরবলি'। এই রকম কৌশলপূর্ণ সংকেতের ব্যবহার দেখেছি একমাত্র ইউরিপিডিসের The Trojan Women নাটকে। যুদ্ধের যে নিষ্ঠুর বাস্তবতার দিকটা হোমার তাঁর মহাকাব্যে বিস্তৃত ভাবে সংগীতের মাধ্যমে পরিবেষণ করেছেন, ইউরিপিডিস তাকেই আশ্চর্য কলাকৌশলে ছোট্ট একটি সিম্বলের ভেতর দিয়ে রূপায়িত করেছেন—'একটি বিষাদময়ী একাকিনী নারীমূর্তি এবং তার বক্ষলগ্ন মৃত শিশুর চিত্রে'—'in the lovely figure of a pitiful old woman, sitting on the ground with a dead child in her arms'। 'মুক্তধারা' নাটকটি পড়তে গিয়ে আমার বারবার Shakespeare-এর Measure for Measureএর নিচের এই লাইনগুলি মনে পড়ে :

> '...drest in a little brief authority,
> most ignorant of what he is most assured.

His glassy essence—like an angry ape
plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep'.

অভিব্যক্তিবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এল্‌মার রাইস বলেছেন—'Expressionism attempts to go beyond mere representation and to arrive at interpretation. The author attempts not so much to depict events faithfully as to convey to the spectator what seems to be their inner significance. To achieve this end, the dramatist often finds it expedient to depart entirely from objective reality and to employ symbols, condensations and a dozen devices which to the conservative must seem arbitrarily fantastic.'

সাহিত্য, সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কলাশিল্প প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই অভিব্যক্তিবাদের ব্যবহার হয়েছে। শিল্পের যে কোনো বিভাগেই মানুষ যখন সৃষ্টির উদ্দাম প্রেরণায় নিবিড়ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়েছে, তখনই তাকে এই expressionistic style-এর সাহায্য নিতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিও এই জাতের। কবি নিজেই তাঁর ছবি সম্বন্ধে বলেছেন: 'People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent, even as my pictures are. It is for them to express and not to explain.'

আগেই বলা হয়েছে—ক্যামেরাতে যেভাবে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিলিপি উৎপাদন করা হয়, তাকে আর্ট বলে না। শিল্পী তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রকৃতিকে যে-ভাবে ফুটিয়ে তোলেন, তাকেই বলা হয় শিল্প। এ বিষয়ে Herbert Read লিখে গেছেন:

'But it should always be remembered that the appeal of art is not to conscious perception at all, but to intuitive apprehension. A work of art is not present in thought, but in feeling, it is a symbol rather than a direct statement of truth.

প্রথম এই 'অভিব্যক্তিবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেন ফরাসী চিত্রশিল্পী Julienn Auguste Hervei। ১৯০১ সালে তিনি প্যারিসে Salon De Independant-এ 'Expressionismes' এই নাম দিয়ে আটটি ছবির প্রদর্শনী করেন। তখন থেকেই এ-কথার প্রয়োগ ঘটেছে। তবে, সাধারণ্যে এই শব্দটির প্রচলন হয় অবশ্য আরো অনেক পরে।

ললিতকলার ক্ষেত্রে প্রথম এ-শব্দটির প্রচলন শুরু করেন Wilhelm Worringer। 'স্টার্ম' পত্রিকার আগস্ট সংখ্যায় তাঁর 'Young Parisian Synthetists and Expressioninsts, Cezanne, Van Gogh, Matisse' নামে এক প্রবন্ধ বের হয়। সাহিত্যে কিন্তু এ-শব্দের ব্যবহার শুরু হয় আরো অনেক পরে,—১৯১৪ সালে। Kasimir Edschmid-এর মতে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কয়েকটি গল্প 'Die Sechs Mundungen' প্রকাশিত হয় এবং সমালোচকেরা সে-সব গল্প expressionistic style-এ লেখা বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এ-সম্বন্ধে তিনি একথাও বলেছেন যে, তখন পর্যন্ত তাঁর নিজের expressionism সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না!

আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার—কথাশিল্পে এবং চিত্রকলায় অভিব্যক্তিবাদ (expressionism) যে ভাবাভিব্যক্তিবাদের (Impressionism) বিরুদ্ধ স্টাইল,—সে-হিসেবেও খানিকটা দ্রুত প্রচার পায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, অভিব্যক্তিবাদীরা ফোটোগ্রাফারের কাজ করেন না, তাঁরা হচ্ছেন সত্যিকার দ্রষ্টা। ভাবরাজ্যে যা চিরন্তন, তাই নিয়েই তাঁদের চির-কালের কারবার। ক্ষণিক সম্বন্ধে সময় নষ্ট করবার মতন বাড়তি সময় বা উৎসাহ তাঁদের নেই। আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে, অযথা সুদীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা কোনো জিনিসকে বোঝাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টাও তাঁরা করেন না। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের এবং অনুভূতির সাহায্যেই তাঁরা তাঁদের শিল্প-সৃষ্টিকে সার্থক এবং প্রাণবন্ত করে তোলেন। জীবনের অথবা প্রকৃতির প্রতিলিপিকার তাঁরা নন্। তাঁরা হচ্ছেন মনে-প্রাণে শিল্পী এবং মনে-প্রাণে স্রষ্টা! এই আলোতে 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী' নাটক দুটি পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সাহিত্য আর সুনাট্য হিসেবে নাটক দুটির স্থান কত উচ্চে। প্রত্যেকটি চরিত্র প্রাণবন্ত এবং সার্থক। সে-হিসেবে 'তাসের দেশ' নাটকটি কিন্তু ততোটা সার্থক নয়। তার কারণ, এ নাটকে অভিব্যক্তিবাদকে ছাপিয়ে উঠেছে তত্ত্বের বিরাট বোঝা!

ভাবাভিব্যক্তিবাদীদের প্রধান প্রচেষ্টা হোলো কোনো বস্তু বা ঘটনার যে ধারণা বা impression তাঁদের মনের পর্দায় ধরা দিয়েছে, তারই একটা সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী চেষ্টা করেন ঐ বস্তু বা ঘটনার অন্তর্লীন স্বরূপকে সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করতে। এ বিষয়ে Kasimir Edschuid বলেছেন—'A house is no longer merely a subject for an artist, consisting of stone, ugly or beautiful ; it has to be looked at until its true form has been recognised, until it is liberated from the muffled restraint of a false reality, until everything that is latent in it is expressed'.

মানুষ সম্বন্ধেও তাই—অসংবদ্ধ বাহ্যিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার না করে, তার আসল মনুষ্যত্বের যাচাই করাটাই অভিব্যক্তিবাদীর কাজ। 'Everything else is 'facade', showing a 'bourgeois' attitude that is to be destroyed with its superficial judgments of right or wrong. Once the bourgeois mask is torn away, the link with eternity given to every human being will be revealed'. [Samuel & Thomas].

'রক্তকরবী' নাটকে অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, অতিরিক্ত বস্তুতন্ত্রবাদ কী ভাবে মানুষকে আলোর জগৎ থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! যা সহজ, যা সুন্দর, যা প্রাণময়, সে সবকে ত্যাগ করে মানুষ মৃত এবং জড়বস্তুর সাধনায় মেতে উঠেছে। মিথ্যা মরীচিকায় ভুলে সে যেন ক্রমাগত অন্ধকারের ভেতরেই চলে যাচ্ছে। 'রক্তকরবীর' রাজা এক জায়গায় বলেছেন, 'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না।' এখানে অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ধনতন্ত্র-পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ যে শক্তি অর্জন করতে ব্যস্ত, সেই শক্তিই বোঝা হয়ে ক্রমাগত তাকে পিষে ফেলছে।

বিশুর একটি সংলাপে আছে—'যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরেও অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে।' অর্থাৎ কবি ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন যে, যান্ত্রিক যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মানুষের সৌন্দর্য অনুভূতির ক্ষমতা ক্রমশঃ

লুপ্ত হয়ে যায় এবং যান্ত্রিক মানুষ সব কিছুরই মূল্য ঠিক করে বাস্তব উপযোগিতা অনুসারে।

'রক্তকরবী' নাটকে তদানীন্তন রাষ্ট্র-শাসনের বিকৃত রূপটাও অতি সুস্পষ্ট ভাবে কবি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বিশেষতঃ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির পাশবিক শাসনের নারকীয় স্বরূপটি আভাসে-ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্যুরোক্রেসিতে যেমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ শাসকদের নানা পর্যায় আছে। সবার উপরে রাজা—তারপর ক্রমে ক্রমে বড়, মেজ, ছোটো সর্দার! এর তলায় আছে মোড়ল, গুপ্তচর প্রভৃতি,—আছে প্রচারের ব্যবস্থা।

'রথের রশি' নাটকটিও অভিব্যক্তিবাদী স্টাইলে লেখা। 'কালের যাত্রা'র সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বিবর্তিত রূপের একটা চমৎকার ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এই নাটকে।

নাটকটির মূল বক্তব্য হোলো—কালের রথ অচল হয়েছে। কারণ কালের সঙ্গে তাল রেখে জীবন আর এগিয়ে যেতে পারছে না। যারা এতকাল এই রথ চালাচ্ছিল, তারা বিকৃত ভাবে কালের ব্যবহার করেছে বলেই কালের অগ্রগতিতে বাধা পড়েছে—জীবনের সংগীতে ছন্দপতন ঘটেছে। শূদ্রের দলকে অপাংক্তেয় করে রাখবার ফলেই ঘটেছে এই মহা সর্বনাশ। সেইজন্যেই যেই শূদ্রেরা এসে রথের রশিতে হাত দিল, অমনি ঘটল বিকৃত অবস্থার অবসান এবং মহাকালের রথ পুনরায় সচল হোলো।

কিন্তু এইখানেই কি কালের যাত্রার শেষ সমাধান? এই নাটকের কবি উত্তর দেন—'তারপরে কোন্ এক যুগে কোন্ এক দিন আসবে উল্‌টোরথের পালা। তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।'

পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'রথের রশি'র মতন সত্যিকার প্রগতিবাদী নাটক খুব কমই দেখা যায়।

'তাসের দেশ' নাটকটিও এই একই ধরনে লেখা। জর্জ কাইজারের Gas-এর মতন এ-নাটকের চরিত্রগুলিও নামহীন এবং অবাস্তব। নাটকের ঘটনাবলীও অবাস্তব। এই প্রসঙ্গে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সমালোচক Richard Samuel-এর মন্তব্য পুনরায় প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—'The Expressionist dramatist is not concerned with depicting life as it reveals itself to his senses. He is not interested in verisimilitude. He exaggerates and generalises in order to convey his 'idea'.

He defines the stage as a magnifying glass'। 'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে-ইশারায় যেন আমাদের সনাতনপন্থী, নির্জীব, অলস, বিশেষত্ব-হীন, পরিবর্তন-পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষেরই ছবি দেখিয়েছেন। আবার এই একই বক্তব্য বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকে এবং তাঁর নানা কবিতায়—অভিব্যক্তিবাদী ভঙ্গিতে।

হাস্যকৌতুকময় রবীন্দ্র-নাট্য-প্রদেশ

শ্রীপুলিনবিহারী দাস

'রসিকতার ফলাফল'-এর উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'আর যাহাই করি লোককে হাসাইবার চেষ্টা করিব না।'

অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে গিয়ে সেদিন তাঁর 'ক্ষণভঙ্গুর মাথার খুলিটা' কারও কারও লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছিল। আর তাদের এই লক্ষ্য সম্পর্কে অবিশ্বাসের কোনো হেতু না পেয়ে তাঁর মন বলছিল,—'বাসা বদলাইতে হইবে, আমার রচনার ভাষাও বদলানো আবশ্যক।'

আমাদের সৌভাগ্য—রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সংকল্পকে সার্থক হতে দেন নি। তাঁর হাতে রচনার ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, বাসাও তিনি বদল করেছেন বহুবার, —কিন্তু লোক হাসানোর চেষ্টা থেকে কখনো বিরত হননি তিনি।

তিনি এই 'রসিকতার ফলাফল' লিখেছিলেন 'ভারতী'-তে ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে। এর কিছু আগে 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকাদ্বয়ের আবির্ভাব ঘটে—শ্রাবণ ১২৯১-তে। হিন্দুধর্মকে যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না-করতে পারলে বিলুপ্তির হাত থেকে তাকে রক্ষা করা অসম্ভব বলে সেদিন কারও কারও মনে হয়েছিল। আবার সেকালের হিন্দুধর্মের যুক্তিহীনতার পথ বেয়ে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মধর্ম নিজেদের প্রসারপরিধি বাড়িয়ে তুলছিল। তাই, হিন্দুধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার দিকে অতি প্রবল ঝোঁক সেদিন দেখা গেল একটি প্রভাবশালী দলের মধ্যে! এঁদের বক্তব্যের বাহন ছিল 'প্রচার' আর 'নবজীবন'। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই প্রয়াসের বিষয়ে ইঙ্গিত করে লিখে গেছেন :

'সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।' এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনস্মৃতিতে যা বলা হয়েছে—সেই 'কলিকাতায় গদাধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয়' উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় এঁর অভ্যুদয়ের সময় ১২৯১ সাল। শশধর তর্কচূড়ামণি, শিষ্য চন্দ্রনাথ বসু

ইত্যাদি কয়েকজন 'নবজীবন, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মারফত 'আর্যামি' ও নবোদ্ভূত 'বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম' প্রচার করছিলেন তখন।

আবেগ যদিও কবিতার উৎস বলে স্বীকৃত, তবু অতিস্ফীত কোনো রকম আবেগ রবীন্দ্র-চিত্তের যুক্তিপ্রবাহকে কখনোই আবিলতায় আচ্ছন্ন করতে পারেনি। যুক্তিবাদের নামে একপক্ষ সেদিন যুক্তিহীনতার যে হাস্যকর পরিচয় দিচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা নীরবে মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদ না করে পারেননি তিনি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উপহাস করে যাওয়াটাই ছিল এর যোগ্য প্রত্যুত্তর। রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই অস্ত্রেরই আশ্রয় নিয়ে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। 'সঞ্জীবনী', 'বালক', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর সেদিনকার সে-প্রতিবাদের বাহন হয়। এই প্রতিবাদের সূত্র ধরে—এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর মতান্তর ঘটেছিল। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকের কাছে এ-সংবাদ অজানা নয়। অবশ্য একথাও স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কখনো তর্কচূড়ামণির শিষ্যত্ব স্বীকার করেননি।

সে-দিনের এ মসীযুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি কথা অবশ্যই মনে পড়বে। সমাজচিত্তে যুক্তির প্রতিষ্ঠা—এইটিই ছিল এ-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ও তাৎক্ষণিক ফল। জীবনের শুরুতে এই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখে নিতে পেরেছিলেন অন্ধ সংস্কারের আর অচল-বুদ্ধির মার আমাদের ওপর কতখানি! তিনি বুঝেছিলেন যে, সারাজীবন তাঁকে এরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে। এটি দ্বিতীয় ফল। আর এর গৌণ ফল—একদল লোকের অসংগত ক্ষেপামির ধাক্কায় কৌতুক-রসের উৎসরণ! সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আকাশে কৌতুকরসের অনতিস্পষ্ট দিগন্তটি সেদিন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গ-পরিহাস-কৌতুকের গাঢ় রঙে এবং গভীর রেখায় আঁকা এক অভিনব সৃষ্টির উপহার পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

লড়াইয়ের যখন সূচনা, তিনি তখন যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর বয়স তখন তেইশ-চোব্বিশ। কাব্যের দিক থেকে সেটা 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ। 'কড়ি ও কোমল'এর পরিচয় দিয়েছেন কবি একে 'নবযৌবনের রচনা' বলে। 'আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা' কড়ি ও কোমলের কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল—এ সংবাদও কবি দিয়েছেন। যৌবনধর্মের বশবর্তী কবির সেদিনকার সেই কথাতে স্বভাবতই কিছুটা বেশি পরিমাণ খোঁচা ছিল। তারপর নবযৌবনের ফসল এই কণ্টক-বৃন্ত বিদ্রূপ-কুসুম একদিন ফলের পরিণতিতে পৌঁছেছিল।

সেদিন তাঁর ভাষায় দেখা দিয়েছিল নতুন দীপ্তি,—ব্যঙ্গবিদ্রূপ-আশ্রিত মন্তব্যও প্রসন্ন পরিহাস-রসিকতায় ঝল্‌মল্‌ করে উঠেছে। আর, তিনি তাঁর বাসাও বদল করেছিলেন। তিনি লিখেছেন—'মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতেছিলাম।' 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি রচনা সেই 'মল্লভূমির' সৃষ্টি। তারপর তাল ঠোকাঠুকির পালা একদিন সাঙ্গ হয়েছে। নাটকে-প্রহসনে, গল্পে-উপন্যাসে, পদ্যে-প্রবন্ধে, পত্রে-কবিতায় সৃষ্টির নতুন ভাঙা জেগে উঠেছে। কিন্তু সেদিনের মসীযুদ্ধের গৌণফলরূপে উৎসারিত কৌতুকরসের ধারা অনর্গল-প্রবাহে বয়ে চলেছে কবির শেষ জীবনপ্রান্ত পর্যন্ত!

'বালক', 'ভারতী', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি পত্রিকায়,—আর 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতায় সেদিনের লড়াই অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথের নানা রচনা প্রকাশিত হয়। 'চিঠিপত্র'-তে তর্কযুদ্ধের অবতারণা ঘটেছিল বলা যায়। ষষ্ঠীচরণ আর নবীনকিশোরের চিঠি-চালাচালিতে প্রাচীন ও নবীনের মতামতের বিবরণ এবং বিশ্লেষণ দেখা দিয়েছিল। এই চিঠিগুলি লেখা হতে থাকে 'বালক' পত্রিকায়—১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতে। এর কিছু আগে ১২৯১ সালের ভাদ্র বা পরবর্তী মাসের 'সঞ্জীবনী'র কোনো একটি সংখ্যায় 'শ্রীমান দামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' শীর্ষক পদ্য-পত্র প্রকাশ পায়। রবীন্দ্র-জীবনীকারের অনুমান—'চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এই রচনার আক্রমণ স্থল।' নব্য হিন্দুয়ানীর ধ্বজাধারীদের প্রতি এমন তীব্র আক্রমণের উদাহরণ রবীন্দ্র-রচনায় আর একটি খুঁজে বার করাও কষ্টসাধ্য!

'দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে হিঁদু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে বাজার হুলুস্থুল।
হামু চামু অবতার!...
মেড়ার মত লড়াই করে, লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর হিঁদুয়ানীর খোঁটা।
আমার হিঁদু দামু চামু!'

উদ্ধৃত এই সামান্য অংশ থেকেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তীব্রতম স্যাটায়ারের জ্বালা দেখা দিয়েছিল এই রচনার সর্বাঙ্গে। তবে তাঁর এই ব্যঙ্গোক্তি যে যথার্থ সুরুচি-সম্মত বা কাব্যোচিত নয়, এ-কথা তাঁর নিজেরই একদিন মনে হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তাই কবি এটিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। হঠাৎ

গজিয়ে ওঠা 'কল্কি-অবতারকে' বিদ্রূপ করে 'প্রিয়নাথ সেন স্থলচরবরেষু'কে লেখা পত্র কবিতায়ও অনুরূপ লক্ষণ স্পষ্ট। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

খুদে খুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোল সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে,
তাঁরা বলেন, 'আমিই কল্কি' গাঁজার কল্কি হবে বুঝি।
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

—পত্র : কড়ি ও কোমল।

মনে পড়ে—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১৯২০ সালে কৃষ্ণানন্দ নাম নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনিই 'কল্কি অবতার'!

এই সূত্রে আরো মনে পড়ে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিং টিং ছট্'ও ব্যঙ্গকবিতা। ১২৯৯ সালের এই রচনা পড়লে স্পষ্টই দেখা যায় যে, আগেকার ব্যঙ্গের উৎকট ঝাঁঝ এখানে অনেকখানি কমে এসেছে। 'মানসী'র 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর',—'কল্পনা'র 'উন্নতি-লক্ষণ' প্রভৃতি কবিতায় প্রেরণার উৎস মোটামুটি অপরিবর্তিত,—কিন্তু এখানে প্রেরণা ভিন্ন। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের রূঢ় আঘাতের তীব্রতা ক্রমে ক্রমে স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় শাসিত হয়ে এসেছে। 'প্রহসনের সীমা ছাড়িয়ে হাস্যরস সাহিত্যের গভীর বিষয়কেও আলোকিত করে তুলতে পারে'; হাস্যরসের 'প্রগলভ বিদূষক'টিকে সম্মানের আসনে বসানো প্রয়োজন,—এই ভাবনার কথাও তাঁর মনে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে বিধৃত রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ ভাবনার সময় বৈশাখ, ১৩০১ সাল। তখন উপহাস-প্রবণতা রূপান্তরিত হচ্ছে পরিহাস-রসিকতায়। জীবনের প্রৌঢ় প্রহরের রচনাগুলিতে—বিশেষতঃ 'খাপছাড়া', 'প্রহাসিনী' প্রভৃতির কবিতায় কবির স্পষ্ট ইচ্ছে—'শেষ বেলা কেটে যাক ঠাট্টায় ঠাট্টায়।'

কিন্তু 'সৌর বিদূষক' এইসব ঠাট্টায় কেবলমাত্র পরিহাসছটা সুদূরে বিস্তার করেই ছুটি পেতে চান! তিনি দেখেছেন :

'এ জগৎ মাঝে মাঝে কোন অবকাশে
কখনো বা মৃদুস্মিত কভু উচ্চহাসে
হেসে ওঠে।'

আর কিছু নয়। তখন কেবল এই হাসির জগৎটাকে পাঠকের হৃদয়ের দ্বারস্থ করে

দেবার বাসনা জেগেছে কবির মনে। এ সব তাঁর শেষ বেলাকার কথা। শেষ বেলাতে তাঁর একবার মনে পড়েছিল :

'মিঠে আর কটু মিলে মিছে আর সত্যি
ঠোকাঠুকি করে হয় রস উৎপত্তি।'

এ-উপলব্ধিটা শেষ বেলাকার,—তবে এর অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ সেই কালের—যার কথা তিনি 'জীবনস্মৃতিতে' লিখেছিলেন : 'আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম···আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার সঞ্জীবনী কাগজে পত্রাকারে বাহির হইয়াছিল।'

'বালক' এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত কৌতুকনাট্য-জাতীয় রচনাগুলির মূলে ছিল মিঠে এবং কটুর,—সত্য আর মিথ্যার এই ঠোকাঠুকি! সে-ইতিহাস সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সেই ঠোকাঠুকির ফলে যে রসোৎপত্তি ঘটেছিল, এবারে তারই কিঞ্চিৎ স্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই রচনাগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'য়ুরোপে শারাড (charade) নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।' নানা অভিনব সাহিত্যকর্মের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের এটিও যে একটি বিশিষ্ট দান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শারাডের উদ্ভব ফরাসী দেশে সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে। একে এক-ধরনের ধাঁধা বলা যেতে পারে। অন্ততঃ প্রথম দিকে শারাডের ব্যবহার ছিল ঐরকমই। শারাডের যুক্তবাহন—গদ্য এবং পদ্য। তবে অভিনয়োপযোগী শারাডেরই কদর বেশি। থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার' উপন্যাসে এই রীতির শারাডের আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্তমান। অ্যামেরিকায় শারাডের বহুল প্রচলন একালের ঘটনা। বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে—কিছুটা ভিন্নরূপে, মার্কিনদেশে শারাড্ বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ইংল্যাণ্ডে বুদ্ধিজীবী-মহলে শারাডের প্রতিপত্তি ঘটতে থাকে উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে। লণ্ডনের নানা অঞ্চলে শারাডের ব্যাপক অভিনয় সেকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শারাডের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর বিলাত-প্রবাসকালেই অর্জন করেছিলেন। আর, কৌতুক-নাট্য রচনার সময়ে এই অভিজ্ঞতা তাঁর খুবই কাজে লেগেছিল। কিন্তু কৌতুকনাট্যগুলির

অধিকাংশের রচনার আবেগ-উৎস স্বতন্ত্র,—পটভূমিও ভিন্নতর। তাছাড়া প্রতিভার অনন্যপরতন্ত্র স্বভাবের কথাও বিবেচ্য। সব মিলে রবীন্দ্রনাথের শারাড-জাতীয় রচনাগুলিকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে।

পাশ্চাত্য শারাড-রীতির কথায় 'রবীন্দ্র-জীবনী'র লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'সান্ধ্যসভায় বিনোদনের জন্য তার অনুষ্ঠান করা হয়। সাধারণ নাট্য হইতে ইহার পার্থক্য হইতেছে যে ইহার দৃশ্যের মধ্যে এমন কয়েকটি শব্দ লুক্কায়িত থাকে, যাহা যোজিত করিয়া তৃতীয় শব্দ গঠিত হয়। সেই পুরা শব্দটি অবলম্বন করিয়া নাটকটি রচিত।'

রবীন্দ্রনাথের শারাড কিন্তু সে-রীতির অনুযায়ী নয়। এবং সে-রীতি-অনুসারী নয় বলেই সম্ভবতঃ কবি চেয়েছিলেন—'হেঁয়ালীর সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না।' রবীন্দ্রনাথের রচনা হেঁয়ালী-প্রধান নয়। যেটুকু হেঁয়ালী আছে, তা শব্দার্থ প্রয়োগের ক্রীড়াকৌশলজনিত। যেমন

'ছাত্রের পরীক্ষায় অভিভাবকের প্রশ্ন:

—কর্তা কি, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

ছাত্রের উত্তর—আজ্ঞে, কর্তা ও পাড়ার জয়মুন্‌শি।

অভিভাবক—কেন বল দেখি।

ছাত্র—তিনি ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকেন।

এখানে 'কর্তা' শব্দ অভিপ্রেত অর্থের পরিবর্তে অন্যার্থে প্রযুক্ত হয়ে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। এরই ফলে ঘটেছে রসোৎপত্তি। মজার ব্যাপার হোলো, অন্যার্থ ধরে উত্তর দেওয়াতে ছাত্রকে ফেল করানোও যাচ্ছে! ফলে, রস গাঢ়তর হয়েছে। এখানে হেঁয়ালী বা ধাঁধার সন্ধান করতে যাওয়া বৃথা।

ডব্‌লিউ ম্যাকওয়ার্থ প্রিড্ এক-সময়ে শারাড্ রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন। তাঁর রচনার নমুনা:

'My first is company ; my second shuns company ; my third collects company ; and my whole amuses company.'

এর সমাধান হোলো 'co-nun-dram'। একে বিশুদ্ধ ধাঁধা বলাই ঠিক। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি এ-শ্রেণীর নয়। কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি-সর্বস্ব অভিনয়ের সাহায্যে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অনুমানের বিষয়কে দর্শকের অধিগম্য

করে তোলবার যে শারাড-রীতি অ্যামেরিকায় প্রচলিত, রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি তা থেকে বহু দূরবর্তী সন্দেহ নেই।

একটি বিশেষ সামাজিক পটভূমি এদের আবেগ-উৎস; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অসিক্রীড়া এদের স্বাভাবিক পরিণতি। উইট্-এর বিদ্যুৎচমকে এরা দীপ্ত; আবার স্যাটায়ারের তীব্র দংশনজ্বালাও এদের মধ্যে অননুভূত নয়। এগুলি বালকদের জন্যে রচিত, কিন্তু বয়স্কদেরও ভোগ্য। স্বল্পায়তন, কিন্তু নাট্যাকারে লিখিত—নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ এবং অভিনয়োপযোগী। প্রসঙ্গে ও প্রকরণে এরা প্রচলিত রীতির অনুগামী নয়। স্বতন্ত্র স্বভাব-বিশিষ্ট এই রচনাগুলি তাই স্বতন্ত্রভাবেই আস্বাদ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক'-এ সংকলিত রচনা-সংখ্যা হোলো—মোট পনেরো। ১২৯২-এর 'বালক'-এ এবং ১২৯৩-এর 'ভারতী ও বালক'পত্রে এগুলি প্রকাশিত হয়। এর সব ক'টি রচনা নাট্যাকারে,—অন্যগুলি প্রবন্ধরূপে রচিত।

সমসাময়িক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই আলোচ্য অনেক রচনার সৃষ্টি। এরা জীবনের কোনো গূঢ় তাৎপর্যের ইঙ্গিতবহ হয়তো নয়। তবে, চলমান জীবনের যে-সব অসংগতি স্ফীত হয়ে উঠে অনেক সময় জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করে তোলে, সে-সব লক্ষণ এঁকে দেখানোর মূল্যও কিছু কম নয়। অসংগতির দোলায়,—আর তার উপস্থাপনা-কৌশলে কৌতুকরসের উপভোগ্য আসর জমে ওঠে। এও বড় কম পাওনা নয়! প্রাণখোলা হাসি মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে। 'সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।' 'হাস্যকৌতুক' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ একথা স্মরণ করেছিলেন!

মানুষের কথায় আর কাজে অসংগতির দৃষ্টান্ত প্রায় সর্বত্র। তার ফলে, ঘটনাচক্রে জীবন যে কী পরিমাণ গুরুভার হয়ে উঠতে পারে 'একান্নবর্তী'-র দৌলতরাম তার উদাহরণ। স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার রচনা, একথা বক্তৃতা দিয়ে ঘোষণা করা দৌলতরামের পক্ষেই সম্ভব ছিল, কারণ—'দৌলতরামের পরিবারে কেউ নেই, তিনি একলা'! অবশেষে দৌলতরামের স্বার্থত্যাগের সংকল্পবাক্যে ও একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে অনুপ্রেরিত আত্মীয়-অনাত্মীয় জনের বহুসমাগম শুরু হোলো, সেদিন 'একলা' দৌলতরাম বুঝলেন শুধু তাঁর গৃহই পূর্ণ হয়নি, গ্রহও পূর্ণ হয়েছে। সহযোগী কানাইও যখন তাঁকে ত্যাগ করে পলায়নপর, তখন—

দৌলত। (উচ্চৈস্বরে) কানাই, আমাকে একলা রেখে পালাও কোথায়।

সকলে মিলিয়া। (দৌলতকে চাপিয়া ধরিয়া) একলা কিসের! আমরা সবাই আছি, আমরা কেউ নড়ব না।

দৌলত। বল কী।

সকলে। হাঁ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

দৌলতের পক্ষে মর্মান্তিক এই সিদ্ধান্তের কথা আর সকলে শুধু মুখের কথায় ব্যক্ত করাকে যথেষ্ট মনে করে নি। তারা দৌলতের অঙ্গস্পর্শ করে শপথ করেছে এবং সেইভাবে তাদের সংকল্পের সাধুতার কথা জ্ঞাপন করেছে। নিপুণ সংলাপ রচনার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। দৌলতের এই পরিণতি করুণ হলেও হাস্যকর। বিনা পয়সায় খ্যাতি অর্জন করতে গিয়ে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'-র উকিল দুকড়ি দত্তের বিড়ম্বিত পরিণতির সঙ্গে দৌলতের এই পরিণতির খানিকটা মিল আছে। দুটি রচনার প্রসঙ্গ যদিও সম্পূর্ণ আলাদা। 'ভাব ও অভাব' রচনাটিতেও বচন ও কর্মের অসঙ্গতিজনিত হাস্যকর পরিস্থিতির পরিচয় রয়েছে।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে নানারকম পীড়ার আক্রমণ ঘটে থাকে। প্রেমের কাহিনী না শোনানো পর্যন্ত প্রেমিক অমিত্র। শ্রোতা যদি ফাঁসির আসামী হয়, তাহলেও রেহাই নেই। তাঁকে প্রেমের কাহিনী শুনতেই হবে। লেখকরাও কখনো কখনো এই পীড়ায় সংক্রামিত হয়ে পড়েন। অবশ্য তাঁদের ক্ষেত্রে উপসর্গটা স্বতন্ত্র। রচনা না শোনানো অবধি লেখক অশান্ত—তাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তিভঙ্গের যতরকম আশংকাই থাকুক না কেন। আর, সে লেখক যদি সংস্কারক হন, তাহলে, রোগের মাত্রা প্রায় চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। 'আশ্রমপীড়া' রচনাটিতে এই পীড়িত ব্যক্তিগুলির হাস্যকর চেহারার দেখা মেলে। 'আশ্রমপীড়া'র গণেশ লেখক-সংস্কারক,—সেখানকার নবকান্ত প্রেমিক।

একটু নমুনা দেখা যাক্ঃ

গণেশ। আমি যা লিখেছি তার বিষয়টা হচ্ছে আর্যমনীষিগণ যে সকল বিধান করে গেছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উচিত।

নবকান্ত। শ্রাদ্ধ করা উচিত। সে যাক্‌গে—যার হৃদয়ে তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলছে—

গণেশ। সে যেন ভদ্রলোকের ঘরের চালের উপর গিয়ে না বসে, তা হলেই লঙ্কাকাণ্ড বাধবে।

'আর্যামি'র ধ্বজাধারী গণেশের উক্তিতে যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ শোনা যায়, তাতেই বিক্ষত এই তরুণ-প্রেমিক নবকান্ত! আবার, ব্যঙ্গের আঘাতে আর্যামির ধ্বজদণ্ডও ধূলি-লুণ্ঠিত। ঘরে যখন আগুন লেগেছে, তখনও এরা পূর্ববৎ প্রমত্ত। আর্যামির অসুস্থতা আর 'হৃদয়ের তুষের আগুনে'র চেয়ে ঘরে-লাগা-আগুন যে অনেক সত্যি, তা ভৃত্যের কাছে যতখানি স্পষ্ট, এদের কাছে ততখানি নয়। সেই কারণে এরা আরো হাস্যকর।

এম. এ. পাশ করবার অভিমানে চতুর্ভুজবাবু ভেবেছিলেন হয়তো সত্যিই তিনি চতুর্ভুজপ্রাপ্ত, অতএব দর্শনীয় হয়ে উঠেছেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রামবাসীর কাছে তাঁর চেয়ে তাঁর সঙ্গী কাবুলী বিড়ালটি অধিক আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। ছোটো মেয়ের ছোট্ট একটি নির্দোষ উক্তি যে কতখানি বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হতে পারে, এবার তার একটু দৃষ্টান্ত দেখা যাক্—

ছোটো মেয়ে (নেপথ্যের দিকে নির্দেশ করিয়া)—হরিখুড়ো দেখে যাও, ওর লেজ কত মোটা।

সদ্য এম-এ পাশ চতুর্ভুজবাবুর কাম্য ছিল এই অভ্যর্থনা! তবু দৃশ্যান্তরে দেখা গেল ব্যাগ হাতে নিয়ে তিনি গ্রাম ছেড়ে পথে নেমেছেন। সম্ভবতঃ ব্যঙ্গের জ্বালা তাঁকে দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছিল!

'রোগীর বন্ধু'-তে দুঃখীরামের বন্ধুত্ব,—'চিন্তাশীল'-এ নরহরির চিন্তাশীলতা,—'সূক্ষ্মবিচার'-এর চণ্ডীচরণের বিচারের সূক্ষ্মতা যে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তাও মোটেই কম উপভোগ্য নয়। এদের অসংগতিগুলো বিদ্রূপবিধ্বস্ত না হলেও কৌতুকরসে সমৃদ্ধ।

'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'রোগের চিকিৎসা'—এগুলি কবির কথায়, 'বিশেষ ভাবে বালকদিগকে আমোদ দিবার জন্য লিখিত।' তবে, এদের উচ্চাঙ্গ রসিকতা প্রবীণেরও উপভোগের বস্তু।

তাঁর 'রসিক' রচনাটি রসবোধহীন নির্বোধ রসিকতার অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। বোকা-রসিকতা যে অনেকক্ষেত্রে বিবেকহীন ব্যাপার হয়ে পড়ে, সেদিনের ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথ এ-অভিজ্ঞতা আহরণ করেছিলেন।

ভোলা—কোন্ ভদ্রলোকের ঘর লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বোঝেননি বলে ধীরাজবাবু হাসছেন না।

ধীরাজ—বুঝতে পেরেছি বলেই হাসছিনে।

আমিও যে ভদ্রলোক, আমারও স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী আছে।

এ রসিকতার আনন্দ নির্দোষ নয়। একে রসিকতা না বলে অ-শালীন পরনিন্দা বলাই ভাল। তবু একেই আমোদের উপকরণরূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের স্বকালে এবং একালেও বিরল নয়।

রায় নন্দকিশোর বাহাদুরের এখনও মরণ হয়নি। তবে মরণের একটা সম্ভাব্য সময় ধরে নিয়ে তাঁর সুযোগ্য পুত্রেরা প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত আয়োজনই করে ফেলেছেন! অনুষ্ঠানের ত্রুটি তাঁদের কাছে হতে পারবে না। 'ঘাটে যাবার এনগেজমেণ্টও হয়ে গেছে। পুত্রদের প্রেরিত মৃত্যুসংবাদের জবাবে 'কনডোলেনস লেটার' আসতে শুরু করেছে। কাগজে মৃত্যুর বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ঠিক সময়ে রায় নন্দকিশোর মরতে পারলেন না!

মধুসূদন—(যাদবের প্রতি) দেখছ ভাই, বাঙালী পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না।

ইন্দ্র—ঠিক বলেছেন। মরবে, তবু পাংচুয়াল হবে না।

আন্‌পাংচুয়াল নন্দকিশোরের ওভার-পাংচুয়াল আত্মজ এই ইন্দ্র! পাংচুয়ালিটি শব্দটির প্রয়োগ-সিদ্ধির এমন দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় দুর্লভ। সাহেবিয়ানাদুরস্ত পুত্রদের ওপর চরম আঘাত এল পিতার কাছ থেকে। বহির্বাটিতে তখন অভ্যাগতেরা শোক-চীৎকারে মগ্ন।

দুঃখীরাম—হায় নন্দকিশোর বাহাদুর, তুমি কোথায় গেলে।

নেপথ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠে। 'আমি এইখানেই আছি, বাবা! দোহাই, তোরা অত চেঁচাস নে।'

হৃদয়হীন মিথ্যা আড়ম্বরবিলাস ও কপটতার প্রতি এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দৃষ্টান্ত বিরল।

'আর্যামির যে সদম্ভ আস্ফালন রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদপ্রবৃত্ত করেছিল, 'আর্য ও অনার্য' রচনাটি তারই বিরুদ্ধে তীব্রতম বিদ্রূপে মুখর। অলাবু কিংবা তিন্তিড়ি ভক্ষণ অষ্টমী তিথিতে নিষিদ্ধ—এ হোলো পঞ্জিকার বাণী। পঞ্জিকার এ নিষেধবাণী

বিজ্ঞানসিদ্ধ। কারণ, বিজ্ঞান-কলেজের গবেষণাগারে অণুবীক্ষণ-সাহায্যে দেখা গেছে অষ্টমী তিথিতে অলাবুতে এবং তিন্তিড়িতে বৃহদাকার কীটের আবির্ভাব ঘটে থাকে। সে কীট ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এ যুক্তি 'আর্য ও অনার্য' রচনার বহুপরবর্তী কালের। আর এ তো অতি সরল ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের আর্য চিন্তামণির ব্যাখ্যা আরো গভীর—আরো হাস্যোদ্দীপক। তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে আর্যরা কেন তিনবার ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করেন, হাই তোলার সময় কেন আর্যরা তুড়ি দেন, আর্য মেয়েরাই বা কেন পাখার বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায়,—আর্যচিন্তামণি কুণ্ডু তারই বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। আর্য চিন্তামণি কুণ্ডু-প্রদত্ত হাই-তোলবার-সময় তুড়ি দেবার কারণ ব্যাখ্যা :

'হাই তোলার সময় তুড়ি দেওয়া হয় কেন ? সেও ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌। উত্তান-বায়ুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত বিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ, কারণ এবং ধারণ এ-তিনটিকে অতিক্রম করতে থাকে, তখন সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে থাকে। এমন সময় মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ুতাপের কারণভূত স্নায়বতাপ সৌরতাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না,তো কাকে বিজ্ঞান বলে।' চিন্তামণির এই আর্যজ্ঞানের জন্যে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়নকে বাহুল্য মনে করেছেন। চিন্তামণি বলেছেন :

'আর্যশাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করে বলতে পারি আমি আর্যশাস্ত্র কিম্বা বিজ্ঞান কিছুই পড়ি নি।'

হরিহরের জবাব—'আজ্ঞে শপথ করার আবশ্যক নেই। পড়াশুনো আছে—এরূপ অপবাদ তোমাকে কেউ দেবে না।'

সেকালের আর্যামির এই মূঢ়তা অসহনীয়! কিন্তু অনেকে সাহস করেন নি এদের বিরাগভাজন হতে। কারণ, এরা যে 'নানা কাগজে লিখে থাকে!' তাছাড়া 'এই আর্য কুণ্ডু ভদ্রলোকদের বড্ড গাল দিতে পারে । সেই জন্যেই বিখ্যাত।' যা অনেকের পক্ষে দুঃসাহস ছিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে সেই দুরূহ কর্ম সাধন করেছিলেন। বিদ্রূপের নির্মম আঘাতে তিনি জর্জরিত করেছিলেন তখনকার আর্য কুণ্ডুদের এই যুক্তিহীন যুক্তিপ্রয়াসকে।

বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে যুক্তিহীন ক্রিয়াকর্মকে সমর্থন করবার অপপ্রয়াসের মতন আর-একটি উপসর্গের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'গুরুবাক্য' রচনাটিতে।

শাস্ত্র আর গুরুবাক্যের ওপর নির্বিকার নির্ভর। শাস্ত্রজ্ঞানের উৎকর্ষ আবার অনুস্বর-বিসর্গ-বহুল অর্থহীন শব্দসমষ্টি প্রয়োগের কৌশলের ওপরেই নির্ভরশীল,—তা মোটেই অধ্যয়নজনিত নয়। আর, এই সব বাক্য যদি গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত হয়, তাহলে তা জীবনের গভীরতম সমস্যার সুলভতম সমাধান দিতে পারে!

'এত দেশ থাকতে জটায়ুই বা মরে কেন।' এ যদি আদৌ সমস্যা হয় তাহলে সহানুভূতিতে তা একরকম বোঝা যায়। বোঝা যায় বক্তা নির্বোধ। কারণ হয় জটায়ুর পরিচয় তাঁর কাছে অজ্ঞাত,—নতুবা 'দেশ' শব্দের অর্থবোধই তাঁর হয় নি! কিন্তু এই নিয়েই শিষ্যদল চিন্তাকুল। গুরু সহজ সমাধান দেন—'নিয়তি কেন বাধ্যতে।' এত দেশ থাকতে জটায়ু কেন মরে এই হোলো তার সমাধান। গুরুর এত 'সহজ' অথচ 'শাস্ত্রসম্মত' সিদ্ধান্তে বিস্মিত বাষ্পবিসর্জনরত শিষ্যকুল গুরুদেবকে নিবেদন করেন— 'গুরুদেব, আপনার অবর্তমানে আমাদের কি দশা হবে।'

বুদ্ধিহীন, হৃদয়সর্বস্ব গুরুবাদ কখনোই রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায় নি। 'চতুরঙ্গের' শচীশের জীবনে এই পথ ধরে আসা ব্যর্থতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। পরবর্তী রচনায় এর নিষ্ফল পরিণামের ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু 'গুরুবাক্য' লেখাটিতে এই গুরুবাদ শাণিত বিদ্রূপবাণে বিধ্বস্ত!

একালের আর-একটি রচনা 'ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্য।' এটি প্রবন্ধাকারে লেখা চৈত্র ১২৯২তে,—এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এ এ-লেখা সংকলিত হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করতেন, ডেঞ্জে পিঁপড়ের জবানীতে তা বিবৃত হয়েছে। এখানেও স্যাটায়ারের তীব্র দংশন বর্তমান। তবে, লক্ষ্য করবার বিষয় 'হাস্যকৌতুক'-এ সংকলিত রচনাগুলির প্রসঙ্গ থেকে এ স্বতন্ত্র। কৌতুক-প্রসঙ্গের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যে ভিন্নপথে যাত্রা শুরু করেছেন, 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এ সংকলিত কতকগুলি রচনা থেকে তা সহজেই অনুমান-করা যায়। ১২৯৮ সালে রচিত 'প্রত্নতত্ত্ব'-তে 'নব্যহিন্দুবাণী'র প্রতি কটাক্ষ আছে। 'আমরা হিন্দু।…অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপানাপিত বন্ধ।' 'আর্য ও অনার্য' লেখাটির কথা এতে মনে পড়ে। কিন্তু 'লেখার নমুনা,' 'সারবান সাহিত্য',

'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি', 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' প্রভৃতি রচনায় বিদ্রূপ বর্তমান ঠিকই, তবে, এসব ক্ষেত্রে গৃহীত বিষয় প্রধানতঃ লেখা ও লেখকের নানা অসংগতি সম্পর্কিত। পূর্বোক্ত মসীযুদ্ধের ঝড় তখন স্তিমিতপ্রায়। 'নূতন অবতার'-এর সাদৃশ্য আছে, 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'র সঙ্গে কিন্তু 'পয়সার লাঞ্ছনা'-তে ব্যঙ্গের বিষয় ভিন্ন। 'স্বর্গীয় প্রহসন', 'মীমাংসা', 'বিনি পয়সার ভোজ' নেহাৎই প্রহসন—নিখাদ কৌতুক-হাস্যের রসমূর্তি।

বিনি পয়সার ভোজ খেতে এসে অক্ষয়বাবুর 'পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগুন লেগে যাবে।'

ক্ষুধার আগুনে কোঁচা জ্বলতে দেখলে হাসি পায়। এমন কি এ-ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটলে অক্ষয়বাবু নিজেও হেসে উঠবেন। তবে, লক্ষ্য করবার বিষয়, এ-হাসিতে কৌতুকের দীপ্তি আছে ঠিকই,—তবে পূর্বের দংশনজ্বালা আর নেই। 'বিনি পয়সার ভোজ' লেখা হয় পৌষ, ১৩০০ সালে। কৌতুকরসের চেহারাতে তখন যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছে, তাও এখান থেকে লক্ষ্য করা যায়।

'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' রচনায় বিজ্ঞ দেবতা প্রজাপতি এবং বালক-দেবতা কন্দর্প সুরসভাকে জানিয়েছিলেন: 'সকলেই জানেন, বিবাহ-ডিপার্টমেণ্টে বহুকাল আমাদের কিছু কর্তৃত্ব ছিল; সেজন্য আমাদের কোনোরূপ নিয়মিত নৈবেদ্য অথবা উপরি পাওনা ছিল না বটে, কিন্তু কৌতুক যথেষ্ট ছিল।'

কৌতুকের আসর জমানোর প্রয়োজনে প্রজাপতি দেবতার শরণ নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' বিবাহে কৌতুকের অস্তিত্বের এ-প্রমাণ বহুবার দিয়েছেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' থেকে 'চিরকুমারসভা', 'শেষরক্ষা', 'মুক্তির উপায়' ইত্যাদির সর্বত্রই বারংবার প্রজাপতি-দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা সুযোগেই তিনি নিমন্ত্রিতদের প্রচুর কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন। 'ব্যঙ্গকৌতুক-এর 'বশীকরণ' এই ধরনের নাটিকা। ঘটনা সংস্থাপনের কলাকৌশল এবং হাস্যাত্মক বাচনভঙ্গি এই রচনাতে কৌতুকরসের উৎস। বিদ্রূপের খোঁচা এখানে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গও পরিবর্তিত। কৌতুকরস নতুন আধারে পরিবেশিত।

'বশীকরণ'-এর রচনাকাল অগ্রহায়ণ, ১৩০৮। 'বশীকরণ' নাটিকায় কৌতুকরস সৃষ্টিতে প্রসঙ্গ এবং প্রকরণের যে পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায়, পরের রচনায় তারই ব্যাপক অনুকরণ ঘটেছে।

আগে যে মসীযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সে-কাল ছিল দূরবর্তী। এই পরি-বর্তনের এ একটি কারণ। কিন্তু তার চেয়ে গূঢ় কারণ, সম্ভবতঃ, কবির স্পর্শকাতর

মনের অনুভূতি। পরপীড়নের সামান্যতম আশংকাতেই সংবেদনশীল কবির অনুভূতি ছায়াচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। 'Playful pain that is what humour is'—চার্লি চ্যাপলিনের এই সংজ্ঞাকে এখন আর কবি মানতে রাজী নন। বরং স্টিফেন লিককের উক্তি—'Humour may be defined as the kindly contemplation of life, and the artistic expression thereof'—কবির মনের কাছাকাছি। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট 'কমিক' চরিত্রগুলি সত্যিই যেন পরিণতি পায়না। চরিত্রগুলিকে নিমচাঁদ কিংবা ফলষ্টাফের পূর্ণতার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তাঁর নাট্যরীতির বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ যে নতুন, তা নয়। 'কমিক, চরিত্রের কোনো অসংগতি কিংবা কোনো দুর্বলতা তার বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। দুর্বলতাজনিত এই 'বিড়ম্বনা যে মুহূর্তে চরম শিখরে আরোহণ করতে যায় কবির স্পর্শাতুর মন সম্ভবতঃ তাঁর কলম চেপে ধরে। 'নাট্যকারে'র চেয়ে 'কবি-সত্তাই' প্রবল হয়ে ওঠে। চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি নাট্যকারের নিরাসক্তি থেকে তখন দূরে সরে যান!

'হাস্যকৌতুক' কিংবা 'ব্যঙ্গকৌতুকে-'এর নাট্য-নক্শাগুলি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। নাট্যকারের নৈরাত্মসৃষ্টি এই সব রচনায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নাটকের এই বিশেষ ধর্মের জন্যেই আলোচ্য রচনাগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এদের আয়তনহ্রস্বতাও সম্ভবতঃ রবীন্দ্রপ্রতিভারই অনুগামী। ভিন্নরসের নাটকে—যেখানে রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন,—সেসব ক্ষেত্রে কখনও কখনও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই অপবাদের কথা অবিশ্যি বিচারসাপেক্ষ। 'কৌতুকহাস্য'তে সংকলিত রচনাগুলি অন্যদিকেও বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের দাবি করতে পারে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর 'লজ্জাশীলা', 'বৈজ্ঞানিকবর, 'সৌন্দর্যানুরাগ', 'গানের সভা' প্রভৃতি কতকগুলি কৌতুকনাট্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের কথা ভাবতে গেলে বাংলা সাহিত্যে এ-জাতীয় রচনার সার্থক নমুনা সত্যিই অনুসন্ধানের বিষয়। স্বর্ণকুমারীর রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাস্যের প্রখর দীপ্তির তুলনা মেলা ভার। যে অসংগতিগুলির সম্বন্ধে সেদিন কবির বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছিল, আজ ঠিক সেই চেহারায় তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বেশ বদল করে, অভিনবরূপে আজও তারা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কথায় এবং কাজে,—হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে—অসংগতি আর বিরোধের নানা চিত্র নানাক্ষেত্রে

আজও অত্যন্ত সুলভদর্শন। তাঁর ঐসব রচনা তাই আজও সমান মূল্যে গ্রাহ্য এবং প্রদেয়।

হাস্যরসের উজ্জ্বল যে আকাশ কবি সৃষ্টি করে গেছেন, তারই ভূমিকা রচনা করেছিল তাঁর যৌবনের এই লেখাগুলি। রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনার মতন জন-মানসের মমতার অধিকারী এরা সম্ভবতঃ হতে পারেনি। কিন্তু এদের সে দাবি উপেক্ষারও নয়।

তিনি নিজে বলেছিলেন :

> 'এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
> হাসি তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।
> এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
> বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
> হাসিতে হাসিতে লব মানি।'

'প্রহাসিনী'র প্রবীণ কবির এই পাকা-ফসলের উর্বর ক্ষেত 'হাস্যকৌতুক'।

নৌকাডুবি

শ্রীনমিতা সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' দেখা দিয়েছিল সেকালের 'ভারতী' পত্রিকাতে। সে-লেখার কথা এখন আর হিসেবের মধ্যে ধরবার উপায় নেই। এর পরের লেখা 'বউ-ঠাকরাণীর হাট'ই রবীন্দ্রনাথের সর্বজনস্বীকৃত প্রথম উপন্যাস। 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' ইত্যাদি এসেছে আরো পরে। 'করুণা'তে ছিল ভাবাবেগের অতিমাত্রিক উচ্ছ্বাস এবং কাহিনীর অতি-রোমন্টিকতা। পরবর্তী জীবনেও নিছক ভাবাবেগের তাগিদে গল্প-উপন্যাস রচনায় তিনি কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। কোনো গভীর চিন্তা বা বিশেষ সংস্কার এবং বিশ্বাসের আনুগত্য করাই তাঁর বিশিষ্টতা। নিজের এই অনতিক্রমণীয় স্বভাব অস্বীকার করবার উপায় ছিল না তাঁর পক্ষে।

তাঁর উপন্যাসাবলীর সামগ্রিক আলোচনাতে তো বটেই,—তাঁর প্রথম দিকের দু'একখানি উপন্যাসের কথা বলতে গেলেও কথাসাহিত্যে তাঁর বৈশিষ্ট্যের এই দিকটাই বিশেষ মনোযোগ দাবি করে থাকে। 'বউঠাকুরাণীর হাট' থেকে যাত্রা করে 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ', 'দুইবোন'-এ যখন তিনি পৌঁছুলেন, —তাঁর তখনকার উপন্যাসে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রমাণ-প্রচেষ্টায় কেমন যেন নাটকীয় অতিমাত্রিকতা চোখে পড়ে। যে বিস্তৃত পরিবেশ রচনা,—বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ও বিশ্লেষণ,—ঘটনার প্রাচুর্য এবং কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি উপন্যাসে আমাদের সত্যিকার কামনার বিষয়, তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসে তা একান্ত দুর্লভ। কবি যেন প্রতিদিনের বাস্তব সংসারে সাধারণ লক্ষ-কোটি প্রাত্যহিকতার দিকে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। এ-কথা গভীর বিনয়ের সঙ্গেই এ-প্রবন্ধের সূচনায় বলে রাখা গেল। এর মানে এ নয় যে, কবি সাধারণ মানুষের বিচিত্র জীবনরঙ্গের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সে-কথা নয়। চিরকালই তিনি ছিলেন জীবন-রসিক শিল্পী।

প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে তত্ত্বকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর জাল বুনতে শুরু করেন নি। সেখানে কাহিনী এসেছে নিতান্তই গল্প রচনার তাগিদে,—

তত্ত্বপ্রয়াসে নয়। শেষ পর্বের মতন বিশেষ বিশেষ তত্ত্বসম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব সূচনা-পর্বে কবির সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ না করলেও শুধু পাঠক-পরিতৃপ্তির জন্যে সস্তা গল্পরস জোগানের প্রবৃত্তি তাঁর কখনই ছিল না। তাঁর গল্পকাহিনীর মধ্যে গভীর কবিমনের দার্শনিকতা নিতান্ত সহজেই আত্মপ্রকাশ করতো। 'বউঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি' ইত্যাদি সূচনা-পর্বের রচনা তারই নিদর্শন। দ্বিতীয় স্তরে 'গোরা'-তে, 'ঘরে-বাইরে'-তে, 'চতুরঙ্গে' এই তত্ত্বভাবনার বৃদ্ধি এবং 'মালঞ্চ', 'দুইবোন' ইত্যাদিতেও তারই অভিব্যক্তি। ঔপন্যাসিক যেন উপন্যাসকারের সীমানা অতিক্রম করে আপন মননজাত তথ্যের প্রতিষ্ঠায় অধিক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

তথ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও তিনি যে মূলতঃ কবি,—ঔপন্যাসিক তিনি যে নন,—একথা ভুলতে পারা যায় না। তাঁর রসপিপাসু মন প্রায়ই উপন্যাসের অতি-প্রয়োজনের জগৎ থেকে রোমান্সের জগতে চিরাচরিত স্বভাবের টানে এসেই উপস্থিত হোতো। প্রথম পর্বের ঐতিহাসিক বা সামাজিকে উপন্যাসগুলিতে তার নমুনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। এমন কি, তাঁর শেষ পর্বের ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসেও,—যেখানে তিনি আত্মসংবরণের খুব বেশি প্রয়াস করেছেন সেখানেও এই কবিসুলভ মনোভাবকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এদিক থেকে তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেই দেখা যায়।

তাঁর প্রথম-দিকের ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রীয় রোমান্সেরই অনুবৃত্তি চোখে পড়ে। তবে এর মধ্যেও তত্ত্বপ্রচারের প্রবণতা যে দেখা দিয়েছিল, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। একমাত্র 'নৌকাডুবি'তে সমাজ-সমস্যার প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও রোমান্সের প্লাবনে ঔপন্যাসিকের তত্ত্বভাবনা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারেনি। মনে হয়, রূঢ় বাস্তবকে তিনি কোনোদিন পুরোপুরি সহ্য করতে পারেননি বলে সব সময় তাকে একটা রোমান্সের আবরণে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসগুলিতে এই প্রয়াসের অল্পবিস্তর চিহ্ন পাওয়া যায়। 'নৌকাডুবি'তে সেই রোমান্টিক মনোবৃত্তিরই একমাত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে।

কিন্তু এই সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। 'নৌকাডুবির' সূচনাপত্রে কবি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন—'একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলন-মূলক। ঘটনাগ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ। তাই অস্বাভাবিক অবস্থায় মনের রহস্য সন্ধান করে নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকাণ্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছিল—অত্যন্ত নিষ্ঠুর কিন্তু ঔৎসুক্যজনক। এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে, তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।'

এর থেকে এই উপন্যাস সম্বন্ধে একটা তত্ত্বভাবনার ক্ষীণ ইশারা পাওয়া যায়। 'নৌকাডুবি'র ঈষৎ পূর্বেকার উপন্যাস 'চোখের বালি'তেও অনুরূপভাবে ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছিলেন—'আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন।···শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হোতো, এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্ততঃ গল্পের এলাকার মধ্যে।' সেকালে এই অভিমত প্রমাণের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষে'র অনুবৃত্তি হিসেবে 'চোখেরবালি' আত্মপ্রকাশ করেছিল। ঘটনা-সমাবেশ বা পাত্রপাত্রী-নির্বাচন—সব দিক থেকেই 'চোখের বালি'র সংহতি, 'নৌকাডুবি'র চেয়ে বেশি। এই সংহত পরিবেশে বিনোদিনীর অতৃপ্ত প্রেমবুভুক্ষার জ্বালাময়ী দীপ্তি অতি তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে মহেন্দ্র-আশা-বিহারীর জীবনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 'নৌকাডুবি'তে নারী-জীবনের সংস্কার সম্পর্কে পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্য থাকলেও 'চোখের বালি'র মতন এ-কাহিনী ঔপন্যাসিকের সমগ্র চেতনা অভিভূত করে ফেলতে পারে নি। বরং 'নৌকা-ডুবিতে' আমরা লেখকের তথ্য-প্রমাণ-প্রচেষ্টার ব্যর্থতাই অনুভব করে থাকি!

পরিবেশের দিক থেকে আলোচনা করলে 'নৌকাডুবি'কে 'চোখের বালি'র তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত বলে মনে হয়। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-আশা-বিহারী-বিনোদিনীর একক রাজ্যের মতন 'নৌকাডুবি' কেবল কমলা-রমেশ ও নলিনাক্ষের জীবনে কেন্দ্রীভূত ছিল না। 'নৌকাডুবি'র আসরে হেমনলিনী অন্নদাবাবু, যোগেন্দ্র, অক্ষয়, শৈলজা, খুড়ামহাশয়,—এমন কি বালক-ভৃত্য উমেশ, কাউকেই নিতান্ত গৌণ বলা যায় না। সকলেই নিজের-নিজের বিশিষ্টতায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ।

আবার, মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক শাখা-কাহিনীর স্রোতও পাঠকের মনোযোগকে কেন্দ্রীয় সমস্যা থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে যায়। রমেশ-হেমনলিনীর প্রেমচর্চায় কমলার কথা একরকম মনেই থাকে না। এমন কি রমেশের মনেও কমলার বিন্দুমাত্র প্রভাব অবশিষ্ট ছিল না। 'চোখের বালির'

কোনো অধ্যায়েই বিনোদিনীর প্রখর ব্যক্তিত্ব অবহেলার সামগ্রী নয়। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য প্রেমের ছবি যে সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই। তবে বিনোদিনী আরো বেশি তীক্ষ্ণ এবং দীপ্তিময়ী। তাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। 'নৌকাডুবি'তে অনেক চরিত্রের আর ঘটনার আবর্তে পড়ে কমলা শুধু পাঠকের নয়, ঔপন্যাসিকেরও দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়।

কাশী-যাত্রার সময়ে স্টীমারে বালক উমেশের সঙ্গে কমলার হাস্যমুখর ঘর-কন্নার ছবি, খুড়োমশায়ের আবির্ভাব, গাজীপুরে খুড়োমশায়ের বাড়িতে শৈলজার স্নিগ্ধ মধুর সাহচর্য ইত্যাদি একাধিক ঘটনার নিরন্তর প্রবাহ লেখকের কাহিনী রচনার প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করলেও মূল সমস্যার প্রতি পাঠকের মনকে ততটা সচেতন রাখতে পারে না।

উপন্যাসের জগতে এইসব ঘটনার অপরিহার্যতাও ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এরা কোথাও নায়ক-নায়িকার জীবনের জটিলতাকে সুদৃঢ় করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করেনি। একমাত্র উপন্যাসের সূচনায় নৌকাডুবির ঘটনা রমেশ ও কমলার জীবনে জট পাকিয়ে তুলেছে। এর অনেক পরে, উপন্যাসের আখ্যানসূত্র ধরে আসরে আবির্ভূত হয়েছে নলিনাক্ষ। তার এই আবির্ভাব এতই আকস্মিক যে এর অনিবার্যতা সম্বন্ধে পাঠকের মনে সংশয় থেকে যায়। আর একথা না মনে হয়ে পারে না যে, নলিনাক্ষ উপন্যাসের অতি জটিল সমস্যার ব্যর্থ সংশোধন-প্রচেষ্টার স্মারক মাত্র! এইরকম অসংলগ্ন ঘটনাবাহুল্য এবং মূলচরিত্রগুলির সুদূর অবস্থিতির জন্যেই উপন্যাসের দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়নি। তবে, এ সত্ত্বেও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস পড়তে পাঠকের খুব ক্লান্তি বোধ হয় না।

যদিও 'নৌকাডুবি'র ট্রাজেডির জন্যে ঔপন্যাসিক নারীর স্বামী-সম্পর্কিত বিশ্বাসের ওপর খুব বেশি জোর দেবার চেষ্টা করেছেন, তবু মনে হয় যে, এই তত্ত্ব বা বিশ্বাসের তুলনায় একটা অকারণ ভুলই সমস্ত দুর্যোগের হেতু। বাস্তব জীবনে মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্যে মানুষই দায়ী। কিন্তু কমলার দুর্ভাগ্যকে কি তার কৃতকর্মের শোচনীয় পরিণামমাত্র বলা যায়? যে প্রবল ঝড়ে স্বামীর সঙ্গচ্যুত হয়ে সে রমেশের আশ্রয় লাভ করেছিল, তার জন্যে সে কাকে দায়ী করবে? রবীন্দ্র-উপন্যাসে কমলার ভগিনীস্থানীয়াদের জীবনে জটিলতা ঘটলেও তার জন্যে কখনও একমাত্র ভাগ্যকে দায়ী সাব্যস্ত করতে হয় নি। তাদের মনের সুপ্ত প্রবৃত্তি অনুকূল বায়ুপ্রবাহে দাবানল সৃষ্টি করেছে। 'নৌকাডুবিতে'

কমলার দুর্ভাগ্যের জন্যে তাকে বিন্দুমাত্র দায়ী করা যায় না। কেবল একটা অজ্ঞাত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে কমলা এবং সবচেয়ে বেশি রমেশকে এতবড় প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান শুধু রমেশের কাছেই নয়,—বোধ হয় লেখকের কাছেও অজ্ঞাত ছিল। তবু দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার মধ্যে রমেশ প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এই অজ্ঞাত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। রমেশের এই দৃঢ়তা সত্যিই বিস্ময়কর। সে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেও দুর্ভাগ্যপীড়িত কমলাকে পরিত্যাগ করবার কল্পনা করতে পারে নি। বরং সমস্ত সমস্যার প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে রমেশ নিজেই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গাজীপুরের নিঃসঙ্গ পরিবেশে যখন কমলাকে পত্নীরূপে স্বীকৃতিদানের জন্যে সে একরকম মনস্থির করেছে, তখন নিতান্ত ভাগ্যের পরিহাসেই রমেশের লেখা চিঠি থেকে কমলা তার নিজের জীবন-সম্পর্কিত অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান লাভ করেছে। এবং পরপুরুষের প্রতি প্রণয়াচরণের লজ্জায় সে বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে, গৃহত্যাগ করে, অনিশ্চিতের পথে চলে গিয়েছে। কিন্তু যে রমেশের আন্তরিক আশ্রয় লাভ করে কমলা কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছিল, এবং যার চরণপ্রান্তে সে তার প্রথম প্রস্ফুটিত প্রণয়কমল উপহার দেবার জন্যে একসময় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, সেদিন বিদায়-লগ্নে একবারও সেই রমেশের জন্যে তার মনে কোন অনুভূতির তরঙ্গ উথলে ওঠেনি। বরং প্রচণ্ড ধিক্কারের সঙ্গে রমেশকে লাঞ্ছিত করে অদৃষ্টপূর্ব নলিনাক্ষের নাম জপ করতে-করতে সে তারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। যাকে সে চোখেও দেখেনি, এমন-কি যার নাম তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, আকস্মিকভাবে তার পরিচয় লাভ করবার পরে, বিনাদ্বিধায় তাকেই স্বামিরূপে একমুহূর্তে বরণ করে নেয় কমলা। নারী-চরিত্রের এই রহস্যের ব্যাখ্যা উপন্যাসের কোথাও দেখা যায় না। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই অসামাজিক প্রণয়কে ততটা সাহসের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেন নি বলে একটা সমাধানের কথা তিনি ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য, এর জন্যে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

কারণ, ঔপন্যাসিক তো দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশের উর্ধ্বে নন। উপন্যাসের রাজ্যে অসামাজিকতার প্রশ্রয় দিলেও তার সীমানাকে লঙ্ঘন করে যাবার মতন প্রগতিশীল মনোভাব অর্জন করা সামাজিক মানুষের পক্ষে ততটা বোধ হয় সম্ভব হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন লেখক শরৎচন্দ্র অনেক বেশি অসামাজিক আচরণ সমর্থন করলেও সমাজের চিরন্তন নীতির পথ ধরেই তাঁকে

চলতে হয়েছে। তাঁর অচলা-সাবিত্রী-কিরণময়ী কেউই এ-আদর্শের ব্যতিক্রম নয়। এই চিরন্তন নীতির আনুগত্য করে, একদিন রবীন্দ্রনাথ যেমন বিনোদিনীর চিত্ত-দাবানলে শান্তিবারি সেচনে স্নিগ্ধ করেছিলেন এবং কুমুদিনীর প্রচণ্ড বিদ্রোহকে মাতৃত্বের সম্ভাবনায় মহিমান্বিত করে সমাধানের পথ দেখিয়েছিলেন, সেই রকম কমলার মনেও হিন্দুনারীর সংস্কার জাগিয়ে তুলে, তাকে নলিনাক্ষের পদপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। এর ফলে কমলার সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব পাঠককে খুব বেশি তৃপ্তি দিতে পারে নি।

নলিনাক্ষের দ্বিধাহীন গ্রহণকেও ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। নলিনাক্ষের অতি কঠোর আচারপরায়ণা মায়ের সম্পর্কেও অনুরূপ অভিযোগ উঠতে পারে। তবে, এর সংগত ব্যাখ্যা প্রদান করবার ইচ্ছা লেখকের না থাকায় তিনি সামান্য ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন—'সুন্দর ছেলে সুন্দর মুখ তিনি বড়ো ভালবাসিতেন।' এই বিচারকে যথার্থ ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা কঠিন।

কমলার ক্ষেত্রে একটা সমাধানের প্রচেষ্টা থাকলেও রমেশের কাছে কোনো পথই খোলা ছিল না। সমস্যার সমস্ত দায় তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে, লেখক তাকে উপন্যাস থেকে বিদায় দিয়েছেন। লেখকের এই অকারণ ঔদাসীন্যের হেতু ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, রোম্যান্সের টানে পড়ে গিয়ে, উপন্যাসকারের সব কর্তব্য অসমাপ্ত রেখে, তিনি তাঁর অনুভূতিপ্রবণ কবিসত্তার আনুগত্যই করেছেন বেশি। উপন্যাসে এর দৃষ্টান্ত সুলভ।

'বউঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'র যুগ থেকেই রোম্যান্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ধরা পড়ে। দূর ইতিহাসের কাহিনীতে এই রোম্যান্টিক পরিমণ্ডল যে অবাস্তব কুহেলিকা সৃষ্টি করে, তাতে পাঠকের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলা খুব কঠিন নয়। কিন্তু একালের জীবন-পরিবেষ্টনী বর্ণনাতেও এই কবিস্বভাবকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার ওপর বার বার কবিসত্তাই জয়লাভ করেছে! এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবের সঙ্গে তাঁর কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম ঐতিহাসিক রোম্যান্সের উচ্চভূমি থেকে বাস্তবের সমভূমিতে অবতরণ করলেও আবহপরিকল্পনায় রোম্যান্টিক কবিমনের ছাপ রেখে গিয়েছেন। অত্যন্ত দুর্যোগের রাত্রিতে ভাঙাবাড়ির অন্ধকার ঘরে মুমূর্ষু বৃদ্ধের পাশে উপবিষ্ট কিশোরী কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল ক্ষীণ প্রদীপের আলোতে। আবার যুবক গোবিন্দলাল বারুণী

পুষ্করিণীর দর্পণেই প্রথম দেখেছিল উদ্ভিন্নযৌবনা রোহিণীকে! 'নৌকাডুবি'তে অনুরূপ আবহাওয়ার অভিব্যক্তি একে রোম্যান্সের চরম পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

'নৌকাডুবি'র আরম্ভে আশ্চর্য এক ভুলের সঙ্গে কাহিনী শুরু হয়েছে। সেই ভুলই এই উপন্যাসক্ষেত্রের সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং সবচেয়ে রোম্যান্টিক ঘটনা। পরিবেশের মায়ামোহ এখানে সত্যিই দুর্মোচ্য! তবু 'নৌকাডুবি'কে আরো বাস্তব করে দেখাবার হয়তো কিছু সুযোগ ছিল। কিন্তু লেখকের ইচ্ছা অন্য রকম। আর, সেইজন্যেই রমেশের আবির্ভাব অত্যন্ত সাধারণ ভাবে হলেও, উপন্যাসের যিনি নায়িকা, তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা হয়েছে সে-রকম সাধারণভাবে বা ঘরোয়া পরিবেশে নয়। সেজন্যে ঔপন্যাসিককে দিগন্ত-প্রসারী উদাস বালুচরের আশ্চর্য এক মায়ালোক রচনা করতে হয়েছে : 'কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্র বসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।' নায়ক নায়িকার প্রথম মিলনের উপযুক্ত এই শান্ত স্তব্ধ মহালগ্নে—'এই জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। কে বলিল সুশীলাকে ভালো দেখিতে নয়। এই নিমীলিতনেত্র সুকুমার মুখখানি ছোটো তবু এত বড়ো আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জ্যোৎস্নায়, কেবল এই সুন্দর কোমল মুখ একটি মাত্র দেখিবার জিনিসের মতো গৌরবে ফুটিয়া আছে।'

এ-কাহিনীতে, সেই স্বপ্নলোকে সুশীলা ভ্রমে কমলাকে আপনার করে গ্রহণের পথে বিন্দুমাত্র সংশয় নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হয় এবং দৈবাহত দুটি নরনারী পরম বিশ্বাসের সঙ্গে নির্জন বালুকাতটে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে রাত্রি-যাপন করেছে। এই দৈব দুর্বিপাকের মধ্যেও ঔপন্যাসিক বার বার সেই স্বপ্নবৎ বালুকাতটের দিকে চোখ না ফিরিয়ে পারেন নি—'অন্ধকারের মধ্য দিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কণ কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিকঝিক করিতেছে।' এ সৌন্দর্যের আয়ু অত্যন্ত অল্প। পরদিনের নানা সমস্যার প্রখর সূর্যালোকে স্বপ্নসৌধের এই অস্তিত্ব অতি

শীঘ্রই মিলিয়ে যায়—'তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালি হইয়া গেল। রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল। যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকুকে সে প্রলাপ বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্চ্ছিতের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ হাওয়া বহিতে লাগল।'...

প্রাথমিক পর্বের রোম্যান্টিকতায় 'মানসী'-'চিত্রা'র কবিই ধরা পড়েছেন বেশি। নানারকম দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও আবেগপ্রবণ স্বভাবকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি! বিন্দুমাত্র অবকাশ পেলেই তাঁর মন যেন কোলাহল-মুখর জগৎ ছেড়ে, প্রকৃতির রাজ্যে উপস্থিত হয়ে মুক্তি অনুভব করেছে। শেষ পর্বের 'মালঞ্চ'র 'সংহত ও দ্বন্দ্ববহুল পরিবেশে কবির এই সৌন্দর্যতন্ময়তা আরো মননশীল ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও 'নৌকাডুবি'তে তিনি যেন বেশ কিছুটা মন্থর ভঙ্গিতে প্রকৃতির নানা দৃশ্যপটের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন—'তীরে বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বনহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না; একটি মাত্র বড়ো ডিঙি গাঢ় সোনালি সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল।'

রমেশ ও কমলার মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের বিশ্লেষণেও লেখক এই কাব্যরস পরিবেশের মোহ সঞ্চার না করে পারেন নি। রমেশ এবং কমলার মধ্যে ধীরে ধীরে এক অদৃশ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে। চাঁদের আলোয় রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে কমলা যেন হঠাৎ অনুভব করতে পারে—'সে মুখ যেন দূরে বহু দূরে; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গীবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।' এবং এই ব্যর্থতার বেদনায় আহত কমলাকে রাত্রির নিঃসঙ্গ পরিবেশে দাঁড় করিয়ে, ঔপন্যাসিক যেন আরো সুস্পষ্ট ভাবে তার জীবনের একাকিত্বকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস করেছেন—'কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই—চাঁদ পশ্চিমের দিকে নামিয়া পড়িতেছে! দুইধারের শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সংকীর্ণ পথ

অদৃশ্য হইয়া গেছে, সেইদিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল—এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়। ঘর! ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর—কিন্তু সে ঘর কোথায়! শূন্য তীর ধু ধু করিতেছে, প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ; অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক—কেবল তাহার একটি মাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।'

এইভাবে নদীর ওপরেই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন এই দুটি নরনারীর জীবনযাত্রা প্রতিদিনের হাসিকান্নার প্রবাহেই বেশ একরকম কেটে গেছে। কিন্তু এই স্বল্প স্বাচ্ছন্দ্যও যে চিরস্থায়ী হবে না, অনতিবিলম্বে একটা জটিল সমস্যা যে দেখা দেবে, নদীতীরের দৃশ্যপটের ক্রমিক পরিবর্তনের মধ্যে ঔপন্যাসিক তারই ইশারা দিয়েছেন: 'মধ্যাহ্নে জাহাজ ধক ধক করিয়া চলিয়াছে। শারদরৌদ্ররঞ্জিত দুই তীরের শান্তিময় বৈচিত্র্য স্বপ্নের মতো চোখের উপর দিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ধানের খেত, কোথাও বা নৌকা লাগানো ঘাট, কোথাও বা বালুর তীর, কোথাও বা গ্রামের গোয়াল, কোথাও বা গঞ্জের টিনের ছাদ, কোথাও বা প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়া-তরীর অপেক্ষায় দুটি চারিটি পারের যাত্রী। ......সমস্তই কী সুন্দর, অথচ কী সুদূর; রমেশের আর্ত জীবনের সহিত কী নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন।'

এর পর বহু ঘটনার ক্রমান্বয়ে কবি আর মগ্ন হবার বিশেষ অবকাশ পাননি। তবে উপন্যাসের একেবারে শেষ দিকে পৌঁছে, তাঁর চিরন্তন স্বভাবের জের টেনে, অত্যন্ত রোম্যান্টিকভাবে সমস্যার জট ছাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে অন্য কোনো প্রশ্ন করবার আগেই অনাস্বাদিত মধুর এক অনুভূতি নলিনাক্ষের মতন আমাদেরও বিচার-ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—'নলিনাক্ষের শয়নঘর-প্রান্তে একটি ফুলদানি হইতে সেই গোলাপের গন্ধ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ ঘরের বাতায়নে আরক্ত সন্ধ্যার সঙ্গে গোলাপের গন্ধ মিশিয়া নলিনাক্ষের মনকে কেমন উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন তাহার বিশ্বের চারিদিকে সংযমের শান্তি, জ্ঞানের গম্ভীরতা ছিল, আজ সেখানে হঠাৎ এমন নানাসুরের নহবত বাজিয়া উঠিল কোথা হইতে—কোন্ অদৃশ্য নৃত্যের চরণক্ষেপে ও নূপুর-ঝংকারে আজ আকাশতল এমন চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।'

আর অবাঞ্ছিত রমেশ—'পথে বাহির হইয়া স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, 'কমলার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল; দেখা না হইলে এ পালাটা ভাল করিয়া শেষ হইত না।······এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া, এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম—আমার আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।'

রমেশের এই দুর্ভাগ্য বহুক্ষণ পাঠকের মনকে অভিভূত করে রাখে। তবু, এর জন্যে রচয়িতাকে বিশেষভাবে দায়ী না করলে, বোধ হয়, অন্যায় করা হবে না। লেখকও সেই আবেদন জানিয়ে বলেছেন—'ট্রাজিডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ—তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয়, যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে। এই কারণে বিচারক যদি রচয়িতাকে অপরাধী করেন আমি উত্তর দেবনা। কেবল বলব গল্পের মধ্যে যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে, তাহলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে।' এর পরেও লেখক একেবারে ভাবনামুক্ত হতে পারেন নি বলে আবার জানিয়েছেন—'কিন্তু এও অসংকোচে বলতে পারিনে কেননা রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।' তাই একালের পাঠকের ওপর এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তিভার ছেড়ে দিয়ে এ-প্রবন্ধের এখানেই ইতি করাই ভাল।

'লিপিকা'র ছোটগল্প

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

'লিপিকা' বইখানি লেখার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন 'পুনশ্চে'র ভূমিকায়। ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল যে, কবিতার সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না তুলেও গদ্যের মাধ্যমে কাব্যরস সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা।—'মনে আছে, সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় কাব্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।' পুনশ্চের কবিতাগুলো রচনা করবার সময় এই ভীরুতা অতিক্রম করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে নতুন গদ্যছন্দের প্রবর্তন করেছেন তিনি। ফরাসী গদ্যছন্দ থেকে এ বস্তু স্বতন্ত্র, রূপায়ণ অন্যবিধ, স্বাদ পৃথক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। উদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি থেকে দেখা যাচ্ছে 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখাই গদ্যাশ্রয়ী কাব্যরচনার প্রয়াস। পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, 'লিপিকা' মাত্র সামান্য কয়েকটি লেখারই সংকলন মাত্র নয়—ছোটো-বড়োতে মিলিয়ে মোট আটত্রিশটি প্রসঙ্গ এতে আছে। 'মেঘলা দিনে', বাণী', 'মেঘদূত', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'বাঁশী', 'একটি দিন', 'সতেরো বছর', 'প্রথম শোক', 'প্রশ্ন'—ইত্যাদি লেখাগুলো নিঃসন্দেহেই কবিতা, 'পুনশ্চ' কাব্যেরই তারা প্রাথমিক পদধ্বনি। কিন্তু 'মীনু', 'নামের খেলা', 'বিদূষক', 'পট', 'নতুন পুতুল', 'উপসংহার', 'পুনরাবৃত্তি', কিংবা 'পরীর পরিচয়'—নিঃসন্দেহেই কয়েকটি ছোট গল্প। রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে এগুলি উল্লিখিত হয় না বলেই এদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

('লিপিকা'র এই গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত এবং লিরিক্যাল্। ছোটগল্পের সঙ্গে লিরিকের রূপ এবং রীতিতে যে পার্থক্যই থাক, তাদের ভাবগত সহধর্মিতা শিল্প-বিচারে সর্বথা স্বীকার্য। মপাসাঁর ছোট গল্পের আসল উৎকর্ষ যে তার

লিরিকধর্মিতার মধ্যেই, নন্দনতত্ত্ববিশারদ ক্রোচে তা এইভাবে দেখতে পেয়েছিলেন :

'Maupassant's stories are lyrical stories, not because they are written with emphasis and lyricism (things of which they show themselves altogether free), but because of the lyric is really intrinsic to the form of narrative, and shapes each part of it, without mixtures and without leaving any residue. In the like manner those parts which are pointed as to be the especially lyrical, in the rhetorical sense of the word, never separate themselves from the narrative and discursive tone of the prose, and speaking thus simply, gradually accelerate the rhythm and rise spontaneously to poetry.'

অর্থাৎ বস্তুসাপেক্ষতা এবং লিরিকের কাব্যব্যঞ্জনার অদ্বৈতসিদ্ধিতেই মপাসাঁর গল্পগুলি পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে, কোনোটিই অপরটিকে আচ্ছন্ন করেনি, কায়ার সঙ্গে আত্মার অচ্ছেদ্য-সম্পৃক্তির মতো একীভূত হয়ে গেছে।

পৃথিবীর অপর মহত্তম গল্পকার অ্যান্তন চেকভের লিরিসিজ্‌ম্ আরো স্পষ্টোচ্চার। তাঁর 'চুম্বন', 'স্তেপ্', (The Steppe), 'কুকুর সঙ্গে ভদ্রমহিলা', 'স্কুল মিস্ট্রেস্' কিংবা 'সাহিত্যের অধ্যাপক' প্রমুখ যে-কোনো গল্পেই চরিত্র বা বক্তব্যকে ছাড়িয়ে লিরিকের একটি সুস্পষ্ট অনুরণন শোনা যাবে। চেকভের গল্পের এই সংগীতগুঞ্জন আরো বেশি করে ধ্বনিত হচ্ছে পশ্চাৎপটে অবস্থিত প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন ঐকতানে। চেকভ সেই সুস্থ রোম্যান্টিক্‌দের একজন, যাঁরা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন ; বিস্তীর্ণ তৃণভূমির ওপর দিয়ে তরঙ্গিত বাতাসে, রাত্রির নদীতে শান্ত-গভীর কলতানে এবং পত্রমোচী অরণ্যের মর্মরে জীবনের যে পরিপূর্ণ তাৎপর্যের সন্ধান তাঁরা পান,—যে আশ্চর্য সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন, মানুষের বিড়ম্বিত পীড়িত সত্তায় তা-ই তাঁরা সঞ্চার করে দিতে চান :

'The beauty of nature is used as a constant criterion in evaluating a given social reality and as a reminder of what life could and should be on this lovely earth. This theme underlines the invariably lyrical vigour of Chekove's landscape and its *social character*.'—(V. Yermilov.)

রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়তে গিয়ে মপাসাঁ এবং চেকভের এই যুগ্ম বৈশিষ্ট্যই আমরা লক্ষ্য করতে পারি। একদিকে তাঁর প্রধানাংশ গল্পই যেমন লিরিকের সুরে বাঁধা—পূর্বাপর ছন্দোময়তার সুমিত সংগতিতে ঘনপিনদ্ধ; অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলিত স্নায়ুস্পন্দন,—প্রকৃতির প্রেক্ষাভূমিতে জীবনরহস্যের বিশ্লেষণ, এই দুটি বস্তুই তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে। 'লিপিকা'র গল্পগুলি এই কারণেই গদ্য-কবিতার পাশে পাশে থেকেও সুরবিচ্যুতি ঘটায় না—সমগোত্রীয় এক রাগিণী থেকে আর এক রাগিণীর মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার মতো কবিতার নদীস্রোত থেকে গল্পের পুষ্পিত তটে অনায়াসেই পাঠকের সানন্দ উত্তরণ ঘটে। একই ভাবকল্পনার হিমবাহ থেকে অবতরণ করে কবিতা এবং গল্প মুক্তিহারের পথে ধীরে ধীরে আজ অনেক পৃথক হয়ে গেছে, কিন্তু 'লিপিকা'র গল্পগুলিকে অনুসরণ করলে আমরা যেন ক্রমশ উজানের দিকে পর্বতসানুর সেই ক্ষেত্রটিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারি—যেখানে গল্প এবং কবিতার বিচ্ছেদের প্রথম সন্ধিরেখা।

২

'মীনু' গল্পটিকেই ধরা যাক। একটি সন্তান হয়ে মারা যাওয়ার পর থেকে মীনু চিররুগ্না। তবু 'ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।' এই টান, আর নিষ্ঠুর পৃথিবীর সেই টানটিকে বার বার ছিন্ন করবার চেষ্টা,—তিনটি ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে তারই বেদনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্প আর কবিতার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লেখাটি। বাড়াবার সুযোগ ছিল, কিন্তু প্রতীক তিনটিকে (কুকুর ভোঁতা, গোলক চাঁপার গাছ আর চৌধুরীদের ফুটফুটে ছোট ছেলেটি) এমন ভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যে, কোনোটিই যেন সম্পূর্ণ করে গল্পের রেখায় আনা যায় না,—আনলে তাদের ব্যঞ্জনাটুকু ফিকে হয়ে যায়। 'পট'ও ঠিক এই জাতের। নতুন মন্ত্রীর প্রতি ঘৃণায় এবং বিদ্বেষে পটুয়া অভিরাম কখন যে তার সৌন্দর্যের ধ্যান হারিয়ে ফেলেছিল, তা সে নিজেই জানে না। যেদিন জানল, সেদিন স্পষ্ট দেখলে :

'তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠেছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, 'মন্ত্রীরই জিত হল।'

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে 'এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।'

মন্ত্রী বললে, 'কত দাম।'

অভিরাম বললে, আমার 'দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।'

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।'

মন্ত্রীর এই বুঝতে না-পারাটুকুই গল্পের সৌন্দর্য, তার কাব্যময় সুরভি। মন্ত্রীর ওপর তীব্র মানসিক বিতৃষ্ণায় ধীরে ধীরে অভিরাম নিজের শিল্প-সাধনায় সুন্দরকে হারিয়ে ফেলেছে, ঘৃণার মূর্তি কখন এসে নিঃশব্দে অধিকার করে বসেছেন তার দেবতার আসন। এর চাইতে বড়ো পরাভব শিল্পীর আর নেই। তাই ক্ষমা আর ঔদার্যের মধ্য দিয়ে দেবতার ধ্যান সে ফিরে পেতে চায়—আর তার সেই পরম প্রাপ্তির অর্থটি বৈষয়িক মন্ত্রী কোনোদিনই বুঝতে পারবে না।

একেবারে আধুনিক কালের একটি অতি বাস্তব গল্পকে কীভাবে কবিতার গভীরতায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তারই নিদর্শন 'রাজপুত্তুর'। রূপকথার আবরণে এ-কালের গল্প রূপক-রূপে নতুনভাবে শিল্পিত হয়েছে। এই রাজপুত্র বন্দিনী রাজকন্যাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি, তাকে জেল খাটতে হয়েছে! সে যখন বেরিয়ে এসেছে, তখন 'দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তরের মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, 'হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।' মানুষকে খাবার জন্যে চারিদিকে এত লোভ।'

অবশেষে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে অভাগা রাজপুত্রকে যিনি মুক্তি দিলেন, তিনি যম। এই অবধি গল্পটি রূপকের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। এর পরেই এল কবির পালা। যদি বাস্তব একটি কাহিনী হোতো, তা হলে একবার দীর্ঘশ্বাস মোচন করেই ছোটগল্পের লেখক যতি টেনে দিতেন। কিন্তু কবি এখানেই থামলেন না। তিনি জানেন, রাজপুত্রের অভিযান এত সহজেই শেষ হবার নয়। জন্ম থেকে জন্মান্তরের পথ দিয়ে এগিয়ে চলবে নতুন কালের শিশু, নতুন মায়ের কোলে ফিরে এসে শুনবে নতুন কালের রূপকথা। আবার সে দুঃসাহসী রাজপুত্র হয়ে পথে বেরোবে, ইতিহাসের অনুবর্তনে বারবার হারিয়ে যাবে দুঃখ বেদনা ব্যর্থতার

ভেতরে। তবু নিরবধিকাল অপেক্ষা করেই আছে, সে জানে রাজপুত্রের 'কপালে অসীমকালের রাজটিকা।' কোনো একদিন 'দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে; যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে শত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে। ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্তুর'। এই শেষ অংশটুকুই গল্পকে কবিতা করে তুলেছে—কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে অনাগত কালের তেপান্তরের মাঠে, সাত সমুদ্রের চিরকালীন তরঙ্গ-গর্জনে। কবি আর গল্প-লেখক অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন এখানে।

'অস্পষ্ট'ও এই রকম একটি বাস্তবধর্মী গল্প হতে পারত; কিন্তু অচেনা মেয়েটিকে ঘিরে যে কুয়াশার বাতাবরণ, তার বেদনার যে দুর্বোধ্য আভাস এবং মেয়েলি হাতের চিঠিকে আলোর সামনে তুলে ধরে জীবন-যাত্রার অস্পষ্ট ছবির মতো কয়েকটি অস্পষ্ট অক্ষর দেখে বনমালীর যে শপথ, 'এ চিঠি কোনোদিন খুলব না—' এদের মিলিত মোহময়তা গল্পটিকে কবিতার মধ্যেই মুক্তি দিয়েছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-ক্ষেত্রের মতো গল্প আর কবিতার দুটি শুভ্র-নীল ধারা পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছে—মিশেও মিশছে না, কবি-চিত্তের আলোয় শুধু মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম ফেনরেখা থেকে থেকে ঝিকমিক করে জ্বলে উঠছে।

'পরীর পরিচয়' রূপক গল্প—আশ্চর্য সৌন্দর্য দিয়ে গড়া। 'তোতাকাহিনী'ও রূপক—তার মধ্যে তীক্ষ্ণতম সমাজ-সচেতনতা, 'কর্তার ভূতে' নিষ্ঠুর আত্ম-সমালোচনা। সৌন্দর্যমগ্নতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসার সমাবেশে লিপিকার গল্পগুলো শ্বেত এবং কৃষ্ণ ভুজঙ্গের মিলন-বন্ধে বিচিত্রবর্ণ পাকে পাকে জড়ানো।

'নামের খেলা' পুরো গল্প—আর একটু বিস্তার করলে 'গল্পগুচ্ছে'ই জায়গা পেতে পারত। 'নতুন পুতুল'ও তাই। 'পুনরাবৃত্তি'র সঙ্গে 'জয় পরাজয়ের' প্রেরণাগত সম্পর্ক খুঁজে পেতে পাঠকের অসুবিধে হয় না। 'বিদূষক' সংক্ষিপ্ত হলেও গল্পের দিকেই প্রধানভাবে আকর্ষিত; 'ভুল স্বর্গ' 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র পাশে স্থান করে নিলে অভিযোগের অবকাশ থাকে না।

বস্তুত 'লিপিকা'র গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কবি-কল্পনার একটি সামুদ্রিক দ্বীপে সারাদিনের ক্লান্তির পর আরক্তিম আলোয় কতগুলি পাখি এসে একসঙ্গে রাত্রির জন্যে আশ্রয় নিয়েছে। দুটি ঝাঁক এসে গায়ে গায়ে মিশে বসেছে; তাদের আলাদা জাত-আলাদা পাখার রঙ এখন এক হয়ে গেছে, পৃথক

কাকলিধ্বনি মিলিত মধুরোলে পরিণত হয়েছে এই মুহূর্তে। একটি ঘনীভূত রাত একত্রে যাপন করে, সকালের সূর্য উঠবার পরে দুটি ঝাঁক আবার দুদিকে উড়ে যাবে—গল্পেরা যাবে গল্পের কোন্ দিগন্তসীমায়, কবিতারা যাবে কবিতার কোন্ দুর্লক্ষ্য দূর চক্রবালে। লিপিকা তাদের সেই মিলিত মায়া-রাত্রিটিকেই ধরে রেখেছে।

৩

তবুও প্রশ্ন উঠবে। এই মিশ্র চারিত্রিকতার জন্যে এদের গল্পরূপে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব কি না? ছোটগল্প বলতে যা আমরা বুঝি—এরা কি তার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে? ছোটগল্পের অন্তরচারী লিরিকধর্মিতাকে স্বীকার করে নিয়েও, তার মাত্রা সম্পর্কে আমাদের কোন রকম দায়িত্ব আছে কিনা?

কয়েক বৎসর আগেও এই প্রশ্ন করা যেতে পারত। কিন্তু এ-কালের সাহিত্য-পাঠক নিঃসংশয়েই জানেন যে, ছোটগল্পের জন্যে আজ আর কোনো **'watertight compartment'** নেই। কোনো আঙ্গিকই আর ছোটগল্পের পক্ষে অনিবার্য ভাবে নিজস্ব নয়,—যে-কোনো বক্তব্য, যে-কোনো বিষয়, যে কোনো উপলব্ধিই আজ তার অবলম্বন হতে পারে। ঘটনাশ্রয়িতার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক,—দার্শনিকতায়, মনস্তত্ত্বে, কবিচেতনায় কিংবা সমাজ-সমীক্ষণে এখন তার সার্বভৌমিক বিহার। গল্প এখন মেণ্টাল্ ক্লিনিকের রিপোর্টাজ হতে পারে, দার্শনিক চিন্তার শিল্পিত ভাষ্য হতে পারে, কবিতার অনুপূরকও হতে পারে। এ-কালের গল্প কোনো বিশিষ্ট চরিত্রনিষ্ঠ নয়, সে বিচিত্র-চরিত্র। হেমিংওয়ে, জেরোম ওয়াইড্ম্যান, জন কোলিয়ার, গ্রাহাম গ্রীন, ইভ্লিন ওয়া, পার লাগের্কভিস্ট এবং আরও অসংখ্য গল্পলেখকের লেখা তার নিদর্শন।

মাত্র আজই নয়; গল্প ও কবিতার এই সীমারেখা বহুকাল থেকেই লেখকেরা পেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। খুব সম্ভব, ন্যাথানিয়াল হথর্নের মধ্যেই এর বলিষ্ঠতম সর্বাগ্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। কবিতার সঙ্গে গল্পের আলো ছায়ার মিলন তাঁর অনেক লেখাতেই চোখে পড়বে। প্রসঙ্গতঃ 'David Swan'কে স্মরণ করা যাক। ডেভিড্ সোয়ান নামে ছেলেটি একখানা স্টেজ-কোচের জন্যে প্রতীক্ষা করতে করতে পথের ধারের মনোরম বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাথার ওপর মেপ্ল গাছের স্নিগ্ধ ছায়া, পাশে জলের শব্দ—ডেভিড্ সোয়ান তলিয়ে গিয়েছিল স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে। আর, তার সেই ঘুমের অবসরে

এল নিঃসন্তান বণিক-দম্পতি—মুগ্ধ হয়ে তারা চেয়ে রইল তার তরুণ মুখের দিকে। সেই সময় যদি ডেভিড্ জাগত, তা হলে হয়তো বণিক-দম্পতির মৃত পুত্রের স্থান অধিকার করে লক্ষপতি হতে পারত সে। এল অর্থবান ধনীর রূপসী তরুণী কন্যা, তার হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল ডেভিডের রূপ; যদি তখনো সে জাগত তা হলে পেতো এই সুন্দরী নারীটিকে—সেই সঙ্গে প্রচুর অর্থ আর উত্তরাধিকার। তারপর এল দুই খুনী—ডেভিড্ হঠাৎ জেগে উঠলে তাদের হাতে তার প্রাণ যেত। কিন্তু ডেভিড্ কিছুতেই জাগল না। অর্থ, প্রেম, আর মৃত্যু কখন যে তার পাশে এসে বসেছিল, সে তা জানতেও পারল না। তার ঘুম ভাঙল স্টেজ কোচের আওয়াজে। গাড়িতে ঠাঁই নেই, তবু তার ছাদে চেপেই সে সানন্দে স্টেশনের দিকে যাত্রা করল। লেখক বলেছেন: 'Does it not argue a superintending Providence that, while viewless and unexpected events thrust themselves continually athwart our path, there should stiil be regularity enough in mortal life to render foresight even partially available?' এর মধ্যে ন্যাথানিয়াল হথর্ণের নিজস্ব একটি জীবনদর্শন আছে, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য নয়। আসল কথা হোলো, সমস্ত গল্পটিই পরিবেশ রচনায় এবং প্রতীক নির্বাচনে একটি কাব্যময় গভীরত্বে মগ্ন হয়েছে। এর সৌন্দর্য সেখানেই।

সেকালের কাব্যবিলসিত এই যে ভাবধর্মী গল্পের সূচনা, নিত্যগতিশীল কালের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তন ঘটে আসছে বহু গল্পলেখকের আনুকূল্যে। সেই বিস্তৃত ইতিহাস-পঞ্জী রচনার স্থান এ নয়। বক্তব্যের লিরিকধর্মিতাকে স্বীকৃতি দিয়েও যাঁরা বহিরঙ্গে গল্পের জন্যে কিছু বিধি-বিধান নির্ণয় করতে চান, আধুনিক লাগের্কভিস্ট সম্পূর্ণভাবেই তাঁদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর 'The Experimental World' নামে যে 'দু'পাতার গল্পটি আছে সেটি মোটামুটি এই রকম:

এক সময় এক পৃথিবী ছিল,—সেটি সত্য নয়, পরীক্ষামূলক। যেন বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার। গাছ, পাখি, ফুল, নদী সব কিছুর মডেল তৈরি করা হোতো সেখানে। কয়েক ঝাঁক মানুষও তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু তারা হোলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল! তারপর:

'Then came the idea to try just one or two; it was no use with such a lot of people. A boy and a girl-child were chosen who were to grow up in the most beautiful part of the earth. They were allowed to run about in the woods and romp, play under the tree and take delight in everything. They were allowed to become a young man and a woman who loved one another, their happiness was complete, their eyes met openly as if their love had been but a clear summer's day.' অবশেষে প্রেমের পরিপূর্ণতায় মিলনবাসরে তারা পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়ল— 'They fell asleep in bliss, in the ecstasy and perfect beauty of love, locked in each other's arms. They awakened no more; they were dead. They were to be used elsewhere.'

গল্প এইখানেই শেষ হয়েছে। সংলাপহীন, সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতিমাত্র, —লাগের্কভিস্টের অস্তি-নাস্তি চেতনার সসংশয় গোধূলিরাগ ছড়িয়ে আছে গল্পটির ওপর।

'লিপিকা' থেকে রবীন্দ্রনাথের 'গল্প' নামে রচনাটি এই প্রসঙ্গে মনে আসে :

'তারপরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখি। কেউবা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল, কেউবা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ রচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সবক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এতদিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখির জীবন হোলো আহার নিদ্রা সন্তান পালন; মানুষের জীবন হোলো গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাত প্রতিঘাত—'

লাগের্কভিস্টের উদ্ধৃত গল্পটি এবং রবীন্দ্রনাথের লেখাটির মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়; সেই সঙ্গে লক্ষণীয় সংশয়ী লাগের্কভিস্টের নৈরাশ্যবাদ এবং জীবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যচেতনার পার্থক্য। কিন্তু এই তুলনামূলক আলোচনা ভুলে গিয়ে, 'লিপিকা'র পাঠকের মনে এবারে এই জিজ্ঞাসাই জেগে উঠবে,—ডেভিড সোয়ানের গল্পত্বে যদি সংশয় না থাকে, আর লাগের্কভিস্টের এই ধরনের রচনাগুলিও যদি গল্পের সম্মান পায়, তা হলে 'লিপিকা'র গল্পেরাই বা কেন সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে?

রবীন্দ্র-কাব্যের আদি পর্ব

শ্রীগীতা ঘোষ

কোটি কোটি বর্ষা নিশি ঘুরেছে জগত,
শত কোটি কোটি তারা ঘেরে চারি ধায়,
জ্বলিয়া নিবিয়া গেছে, খদ্যোতের মত!
পথিক পায় নি পথ গন্তব্য তাহার!
মেঘ-স্তরে স্তরে আজ, সুদূর আকাশে,
কনকের রেখা মত কি যেন ফুটিছে।
বিহঙ্গের কল-কলে, কুসুমের বাসে,
স্তম্ভিত সমীর যেন চমকি উঠিছে।
হিমাদ্রির অভ্র-ভেদি শিখরে শিখরে,
সপ্তমে প্রভাত-স্তোত্র কাঁপিছে গম্ভীরে।
তমসার শ্যাম কূলে, কুটীরে কুটীরে,
সর্জরস-ধূম-স্তর ওঠে স্তরে স্তরে।
জগত—জগত নয়, যেন স্বর্গ-ছবি।
সংসার চকিত নেত্র, ফোটে রবি—কবি!

—অক্ষয়কুমার বড়াল

এই রবি-কবির অভ্যুদয় ঘটেছিল যে-পরিবারে, সেই ঠাকুর-পারিবারের স্বাতন্ত্র্যের কথা কে না জানেন? সেই স্বতন্ত্র জগতে, নিভৃত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের লালন-পালনের ইতিহাস ছিল বড়োই বিচিত্র। সাধারণ ঘরের ছেলের মতন শৈশবে বাবা-মা-ভাই-বোনের অব্যাহত সঙ্গ তিনি পাননি। তাঁর শিশুকাল বাঁধা পড়ে চাকরদের মহলে। সেইখানেই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। তিনি নিজে বলে গেছেন—'চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান।' [শিক্ষারম্ভ : জীবনস্মৃতি]

অবশ্য ভাবী কবির শিক্ষারম্ভ হয়েছিল সে-যুগের সর্বজনবিদিত পাঠ্যপুস্তক 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়'-এরই বাঁধা সড়ক ধরে। এর পর বাংলা জ্যামিতি, অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁকে মাইকেল মধুসূদনের

'মেঘনাদবধ কাব্য'ও পড়তে হয়। পরে এই মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা দিয়েই 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি লেখা শুরু করেন।[১] এবং তাঁর লেখা যে-সব কাব্য লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে, তার মধ্যে প্রথম রচিত 'বনফুল'[২] ও পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত 'কবিকাহিনী'-র [১৮৮৫] ছন্দে মেঘনাদবধের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বনফুলে এবং কবিকাহিনীতে মধুসূদনের ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দও দেখা দিয়েছিল, মধুসূদনের বর্ণনাভঙ্গিরও অনুসরণ করা হয়েছিল। বিবিধ কাব্যালঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বালক রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। মধুসূদনের ব্যবহৃত আভি-ধানিক শব্দ ব্যবহারের প্রচেষ্টায় 'কবিকাহিনী'র তৃতীয় সর্গে লেখা হয় 'বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে।' উৎপ্রেক্ষার প্রতি তাঁর সেকালের—এবং চিরকালের আসক্তিতেই বলা হয়েছিল :

> ঊর্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে
> সহসা করণ ক্ষেপে সহসা উঠে রে কেঁপে
> সহসা জাগিয়া উঠে চল ঊর্মি সবে। [বনফুল : ১ম সর্গ]

'বনফুল' কাব্যের নায়িকা কমলার বাস গভীর অরণ্যের নির্জন কুটিরে। সেই কুটিরের বর্ণনা এই রকম :

> চৌদিকে মানব-বাস নাহিক কোথায়
> নাহি জন-কোলাহল, গভীর বিজন-স্থল
> শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!
> কুসুম-ভূষিত-বেশে, কুটীরের শিরোদেশে
> শোভিছে লতিকা-মালা প্রসারিয়া কর,
> কুসুমস্তবক রাশি, দুয়ার উপরে আসি
> উঁকি মারিতেছে যেন কুটীর ভিতর!
> কুটীরের এক পাশে, শাখা-দীপ ধূমশ্বাসে
> স্তিমিত আলোক শিখা করিছে বিস্তার।
> অস্পষ্ট আলোক তায় আঁধার মিশিয়া যায়
> ম্লান ভাব ধরিয়াছে গৃহ-ঘর দ্বার! [বনফুল : ১ম সর্গ]

বলা বাহুল্য, এ বর্ণনাভঙ্গি মধুসূদনের ছাঁচে ঢালা!

১। মেঘনাদবধকাব্য ; ভারতী ১২৮৪ প্রথম বর্ষ, শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২। 'বনফুল' কবির মাতৃবিয়োগের পরেই রচিত। মাতৃবিয়োগের তারিখ ১২৮১ ফাল্গুন ২৭।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা শেখা আর ইংরেজি আদবকায়দা রপ্ত করবার দিকে সবাই যখন মনোযোগী হয়েছিলেন, সেই সময়ে বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যচর্চার এমন সুযোগ সত্যিই বিরল ছিল। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান। ঠাকুরবাড়ির বিশেষ পরিবেশই তাঁকে আর-এক ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয়। সেটি হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিপুল বিচিত্রতা আর বর্ণাঢ্যতার সন্ধান।

তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই দেখা যায়:

'আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্ পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।' [অবতরণিকা: রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড]

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ-কে 'মুগ্ধবোধ' মুখস্থ করতে হয়। তারপর ১২৭৯ সালে তিনি যখন তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে মহর্ষি তাঁকে একেবারেই 'ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ' পড়াতে আরম্ভ করেন এবং তার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করতে দেন। সংস্কৃতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের যোগ ঘটেছিল কিন্তু একেবারে শিশুকালে। সে-কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখে গেছেন:

'আমার নিতান্ত শিশুকালে মূলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়োদাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায় ছিল না—তাঁহার আনন্দ আবেগ-পূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।···

'একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গার বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা।···আমি তখন সংস্কৃত জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছু বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।' [পিতৃদেব: জীবনস্মৃতি]

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরো নিবিড় যোগ ঘটে ১২৮০ সালে।

এই বছরে তিনি রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায়ের কাছে 'শকুন্তলা', এবং জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে 'কুমারসম্ভব' পড়েন। এর কিছুদিন পরে [১২৮৫ সালে] রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর মেজদাদার আমেদাবাদের বাড়ির লাইব্রেরিতে ডাক্তার হেবর্দিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা একখানি পুরোনো সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ পান। সেটির সম্বন্ধে তিনি বলে গেছেন :

'এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাত-গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।'—[আমেদাবাদ : জীবনস্মৃতি]।

১২৮৫ সালে ধ্বনি এবং ছন্দের সেই অনিবার্য আকর্ষণেই আমেদাবাদের শাহিবাগপ্রাসাদের ছাদে, শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের নিজের সুর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি। তার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এখনো দেখা যায়।

বালক-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার শুরু হয়েছিল এই সময়ের অনেক আগে। তখন তাঁর বয়স সাত-আট বৎসর। সেই সময়েই চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দে পদ্য লেখার হাতে-খড়ি।[৩] একখানি নীল কাগজের খাতায় তিনি পদ্য লেখার মক্শ করতেন। এর কিছুদিন পরে [১২৭৯ সালে] কলকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ দেখা গেলে ঠাকুরপরিবার পেনেটি বাগানে আশ্রয় নেন। সেখানে বালক-কবি প্রকৃতির ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। আভিজাত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই ঠাকুরবাড়ির অভিভাবকরা বালক রবীন্দ্রনাথকে পেনেটির গঙ্গার ধারের খোলা হাওয়ায়, গ্রামের ছায়া-ঢাকা ঘরের আঙিনায় যাবার অনুমতি দেননি। কিন্তু বালক-কবির কাছে কলকাতার বাড়ির কড়ি-বরগা-দেয়ালের খাঁচার চেয়ে সেই প্রাচীর-ঘেরা খিড়কির পুকুর-ঘাটের পাশের মস্ত জামরুল গাছটার ঘন ছায়াই ছিলো অনেকখানি স্বপ্নভরা রাজত্ব।

পেনেটি থেকে কলকাতায় ফেরবার অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় [১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ]। তার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সঙ্গে বোলপুরে যান এবং এইখানেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটে। কবির বয়স তখন বার বৎসর।

তখন বালকের আত্মবোধ জন্মেছে। 'শুধু কবিতা লেখা নহে, নিজের

৩। কবিতা-রচনারম্ভ : জীবনস্মৃতি।

কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য একটা চেষ্টা জন্মিয়াছে।' [হিমালয় যাত্রা : জীবনস্মৃতি]।

সেই চেষ্টার ফলে তিনি প্রথম যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি পেয়েছিলেন, তার বদলে একখানি বাঁধানো লেট্‌স্‌ ডায়ারি সংগৃহীত হয় এবং তারই পাতায় 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে বীররসাত্মক এক কাব্য লেখা হয়।

এর কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কিন্তু কবির সঙ্গে আসে নি ; পরাজিত পৃথ্বীরাজ যে কোথায় আত্ম-গোপন করেছিল, স্বয়ং লেখকও তার হদিশ পাননি !

কলকাতায় ফিরে আসবার পরেই তাঁর নিয়মিত কাব্যসাধনা শুরু হয়। ইতিপূর্বে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল সেজদাদার আলমারিতে রাখা বাঁধানো 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র প্রতি,—বড়োদাদার আলমারিতে রাখা 'অবোধবন্ধু'র আবাঁধা খণ্ডগুলির প্রতি। 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র কাজির-বিচারের কৌতুকজনক গল্প, 'কৃষ্ণকুমারী' উপন্যাস ইত্যাদি পড়তে তাঁর খুবই মজা লাগতো। 'অবোধবন্ধু'তে ফরাসী উপাখ্যানের সরস বাংলা অনুবাদ 'পৌলবর্জিনী' পড়ে তাঁর চোখে জল আসতো ; সাগরতীরে নারকেল-বনের ছায়ায় 'সেই মাথায় রঙিন রুমাল পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালি বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল'—[ঘরের পড়া : জীবনস্মৃতি]। এই 'অবোধবন্ধু'র মাধ্যমেই নবীন গীতিকবিতার পথিকৃৎ বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে। বিহারীলালের কবিতা 'সরল বাঁশির সুরে' রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে 'মাঠের এবং বনের গান' বাজিয়ে তুলতো। 'অবোধবন্ধু'তে বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব কাব্য-কবিতার আবেগভরা সংগীতময় বর্ণনা তখন রবীন্দ্রনাথকে উচ্ছ্বাসে, আবেগে, কল্পনার আনন্দ-বেদনায় ভরপুর করে তুলেছিল।

অতঃপর তিনি হাতের কাছে পান বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' [১৮৭২] এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' [১৮৭৪-৭৬, তিন খণ্ড, চুঁচুড়া]। লাজুক, মুখচোরা বালক-কবি সাহিত্যরস আস্বাদনে বিভোর হয়ে গেলেন। বাড়ির আবহাওয়াও ছিল কবির সাহিত্যচর্চার অনুকূলে। তাঁর খুড়তুত-ভাই গণেন্দ্রনাথ তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে 'নবনাটক' লিখিয়ে বাড়িতে অভিনয় করাচ্ছিলেন। সাহিত্যে এবং ললিতকলায় গণেন্দ্রনাথের

অনুরাগের সীমা ছিল না। তাঁর লেখা 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অনুবাদ বহু পূর্বেই ছাপা হয়েছিল। তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীত ব্রাহ্মসমাজভুক্তদের মুখে-মুখে ফেরে তখন। বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার সূত্রপাত-সাধনে তাঁর প্রচেষ্টা সত্যিই মনে রাখবার মতন। গণেন্দ্রনাথের ছোট ভাই গুণেন্দ্রনাথও উচ্ছল প্রাণবন্ত লোক ছিলেন। গুণেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সমবয়সী এবং হরিহর-আত্মা! দু'জনের মাথায় যে কতো রকমের কল্পনা দেখা দিত! সেই সব কল্পনার বলে ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হোতো কতো নাটক,—লেখা হোতো কতো কাব্য-কবিতা-প্রহসন! যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবান বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখছিলেন। সেই 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র প্রসাদ পাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলে গেছেন :

'বড়োদাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত।...মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

[বাড়ির আবহাওয়া : জীবনস্মৃতি]

এঁরা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা বিকাশের পথে,—ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডলেই আর-একটি লোকের সাহচর্য বেশ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই লোকটি হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। সাহিত্যের রস গ্রহণে এবং বিতরণে এঁর অসামান্য উদারতায় বালক রবীন্দ্রনাথ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তখন অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী কাব্য' [১৮৭৪] ছাপা হয়ে গিয়েছে। 'বঙ্গদর্শনে' তার প্রশংসা বেরিয়ে গেছে।[৪]

একে অক্ষয়চন্দ্র মানুষটি রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয়, তার ওপরে 'উদাসিনী'র এতো প্রশংসা! এদিকে রবীন্দ্রনাথ সদ্য হিমালয় থেকে স্বাধীন জীবনের আস্বাদ নিয়ে ফিরে এসেছেন! তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে গেছে ইতিমধ্যে—এবং তারই ফলে বাড়ির বাঁধন তখন আল্‌গা। সেই সময়ে 'বনফুল' আখ্যায়িকা-কাব্যের সূত্রপাত। আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনায়, রচনারীতিতে, অলংকরণ-সজ্জায় 'বনফুল' ছিল 'উদাসিনী'র অনুজ। 'উদাসিনী'র প্রভাব 'বনফুলে' এতো বেশি, যে বহু জায়গায় 'উদাসিনী'র পংক্তি-পর্যন্ত 'বনফুলে'

৪। জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১

স্থান পেয়েছে। 'বনফুলে'র ওপর 'উদাসিনী'র প্রভাবের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে লিখে গেছেন : 'ইহার [অক্ষয়চন্দ্রের] সন্থ রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।'

'উদাসিনী' ছাড়া 'বনফুলের' ওপর 'স্বপ্নপ্রয়াণে'রও প্রচুর প্রভাব পড়েছিল। 'বনফুলে'র ওপর 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র ভাষা, ভাব এবং মধ্যে মধ্যে ছন্দের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই কাব্যের ছন্দে অবশ্য শুধু 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র প্রভাব নেই, বিহারীলাল চক্রবর্তীর ব্যবহৃত তিনমাত্রার ছন্দ এবং মধুসূদন দত্তের ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদর্শও এ কাব্যে গৃহীত হয়েছে।

অক্ষয় চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল এবং মধুসূদন দত্ত—এঁদের প্রভাব ছাড়াও 'বনফুলে' সংস্কৃত সাহিত্যের মহারথী কালিদাসেরও কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে। আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার কোমল রূপের ছায়াতেই গড়া হয়েছে 'বনফুলে'র নায়িকা কমলাকে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা দ্বিতীয় কাব্য 'কবি-কাহিনী'।[৫] 'কবিকাহিনী'র আখ্যান-বস্তুতে নাটকীয়তা নেই বটে; কিন্তু এ কাব্যে বালক-কবির দৃষ্টির ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। 'বনফুলে'র পাত্র-পাত্রীরা প্রেমের গোলকধাঁধাঁয় পথ হারিয়েছে; আর 'কবিকাহিনী'র নায়ক ব্যক্তিপ্রেম অতিক্রম করে বিশ্বপ্রেমের আস্বাদন নিয়েছে। ছন্দের ব্যাপারেও 'কবিকাহিনী'র বিশেষত্ব আছে। এক্ষেত্রে প্রভাব পড়েছিল মধুসূদন-বিহারীলালের।

প্রায় একই সময়ের—রবীন্দ্রনাথের 'শৈশবসঙ্গীতে' [১২৯১] মিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কয়েকটি ছোট ছোট গাথা স্থান লাভ করেছে। এইসব গাথার প্রসঙ্গে প্রথমেই অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে স্মরণ করা দরকার। প্রকৃত পক্ষে অক্ষয়চন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে 'গাথা' কবিতার প্রবর্তক। অক্ষয়চন্দ্রের অবস্থান এবং তাঁর 'উদাসিনী' গাথা-কাব্যের সঙ্গে অতি-পরিচয় রবীন্দ্রনাথকে গাথা-কাব্য রচনায় অণুপ্রাণিত করেছিল বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ন-দিদি স্বর্ণকুমারীর গাথা-কাব্য লেখার পেছনেও এই একই কারণ বিদ্যমান।

অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারীর নৈকট্য প্রসঙ্গে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে লেখা হয়েছে :

'সরোজিনী (১৮৭৫)—প্রকাশের পর হইতেই...সংগীত ও সাহিত্যচর্চাতে

৫। ভারতী, ১২৮৪ পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ।

আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়িতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।[৬]

রবীন্দ্রনাথের ছোট ছোট গাথা-কাব্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় প্রতিশোধ [ভারতী, ১২৮৫, শ্রাবণ]। তারপর একে একে ছাপা হয় 'লীলা' [ভারতী, ১২৮৫, আশ্বিন], 'ফুলবালা' [ভারতী, ১২৮৫, কার্তিক], 'অপ্সরা-প্রেম' [ভারতী, ১২৮৫, ফাল্গুন], ও 'ভগ্নতরী' [ভারতী, ১২৮৬, আষাঢ়]। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রুদ্রচণ্ড'-কে 'নাটিকা' বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এ-ও গাথা-কাব্যেরই সগোত্র। এই গাথা-কাব্যগুলির একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে এদের প্রায় প্রত্যেকটিই কাহিনীসর্বস্ব। কেবল 'অপ্সরা-প্রেম' এবং 'ফুলবালা'য় এ লক্ষণের ব্যতিক্রম ঘটেছে। 'অপ্সরাপ্রেমে' কবিত্বের প্রকাশই মুখ্য স্থান নিয়েছে। আর 'ফুলবালা' রূপক-গাথা। এতে আছে বনের বর্ণনা,—ফুলের কথা। এর ভাবে ভাষায় 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এবং 'উদাসিনী'র গভীর ছাপ রয়েছে।[৭]

একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই সূত্রে বলে রাখা দরকার যে, অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' সে সময়কার অনেক খ্যাতনামা-অখ্যাতনামা ব্যক্তিকেই প্রভাবিত করে। তারই ফলে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও নবীনচন্দ্র সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গাথা-কাব্য রচনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেনের ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য 'পলাশির যুদ্ধ' [১৮৭৫] অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' কাব্য প্রকাশের পরের বছরেই প্রকাশিত হয়। এর বছর তিনেক পরেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম গাথা-কাব্য 'প্রতিশোধ' [১২৮৫]। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা' বেরিয়েছিল ১২৮৭ সালে। তার আগে রবীন্দ্রনাথের সব ক'টি ছোট গাথা-কাব্য ছাপা হয়ে গিয়েছে। সেইসব গাথা-কাব্য পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের গাথা রচনার প্রতিভার ওপর স্বর্ণকুমারী দেবীর বেশ প্রীতি এবং শ্রদ্ধার ভাব এসেছিল বলে ধারণা করা অন্যায় নয়। কারণ, তা হলে বাংলা গাথা-কাব্যের প্রবর্তক স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্রের ব্যক্তিগত সহায়তায় 'উদাসিনী'র ছায়ায়

৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' [১৩২৬], পৃঃ-১৫১—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৭। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ফুলবালা' (১২৮৮)-র নামকরণে এই বইয়ের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

লেখা 'গাথা'-কাব্যকে তিনি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করতেন না। অতএব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে যে বলা হয়েছে—'স্বর্ণকুমারীই বঙ্গসাহিত্যে সর্বপ্রথম গাথা রচনা করেন,—গাথা-রচনায় রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদানুসরণ করিয়াছেন,'[৮]—তা সম্পূর্ণ ভুল।

কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ যে ছোটো একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন, তাও ছিল গাথা-কাব্য। সে রচনাটির নাম 'যৌতুক না কৌতুক ?' [১৮৮৩]।

বিদেশী কবিদের লেখা কাব্য-কবিতার অনুবাদের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়-চন্দ্রের কাছে ঋণী ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে বাঙালীর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছিল। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের [১২৩৪-৯৪] রচনায় ছিল শেক্সপীয়র, স্কট, বায়রন ও টমাস মূরের ছায়া। ১২৬৫ সালে প্রকাশিত হয় রঙ্গলালের অনূদিত পার্নেল ও গোল্ডস্মিথের 'হার্মিট' কাব্যদ্বয়ের অনুবাদ। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদও তিনি করেছিলেন। তারপর দেখা দেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের কাব্যগুরু ছিলেন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, এবং হোমর, ভর্জিল, দান্তে, ট্যাসো, ও মিল্টন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৩৮-১৯০৩] 'নলিনী-বসন্ত' [১২৭৫] শেক্সপীয়রের 'টেমপেষ্ট' কাব্যের অনুবাদ।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর যখন এতো মনোযোগ, সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ির একটি বালকের করুণ উক্তি লক্ষ্য করবার মতো। তিনি লিখেছিলেন :

'সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিমটিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরে দেওয়া যায় তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।'

[নানা বিদ্যার আয়োজন : জীবনস্মৃতি]

ইংরেজি সম্বন্ধে ছেলেবেলায় যে-রবীন্দ্রনাথ এমন বিমুখ ছিলেন, তাঁকেও বিদেশী কাব্যের প্রতি অনুরক্ত করে তোলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। সে প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখে গেছেন :

'তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে

৮। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১২০—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।'

অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ। সে সাহিত্যে তাঁর যেমন ব্যুৎপত্তি, তেমনি অনুরাগ ছিল। তিনি শেক্সপীয়রের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। অন্যান্য ইংরেজ কবিদের লেখা সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল প্রচুর। ঠাকুরবাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্র বিচিত্র করা কবি মূরের লেখা একখানি 'আইরিশ মেলডীজ' ছিল। তা থেকে অক্ষয় চৌধুরী প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতেন। সেই আবৃত্তি শুনে, মুগ্ধ কবির মনে এক মায়ালোকের সৃষ্টি হোতো। ভাববিভোর রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের কাছ থেকে বিদেশী কবিদের সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহে তৎপর হন, শিখে নেন কাব্য অনুবাদ করবার প্রক্রিয়া। এর ফলে, 'শৈশব-সংগীতে'র যুগে মৌলিক কাব্য-কবিতা ইত্যাদির সঙ্গে বিদেশী কাব্য-কবিতার অনুবাদ করতেও আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি মূর, বার্নস, বায়রন, শেক্সপীয়র, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি বিদেশী কবিদের বেশ কিছু অনুবাদ করেছিলেন। বিদেশী কবিদের লেখার সঙ্গে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আর 'শকুন্তলা' থেকেও এই সময়ে তিনি দুটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। এর পর বিলেত যাবার প্রাক্কালে—আমেদাবাদে অবস্থানের সময়ে তাঁর হাতে বেশ কিছু ইংরেজি বই এসে পড়ে। সেই সময়ে তিনি ইংরেজদের আদি কবি কিডমনের পদ্য-বাইবেল থেকে কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি দান্তে, পেত্রার্ক, গ্যেটের লেখা থেকেও কিছু কিছু অনুবাদ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে যে অক্ষয় চৌধুরী এমন সোনার কাঠি ছুঁইয়েছিলেন, 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর অনেকখানি হাত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করেই 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১] এই 'ভারতী' পত্রিকার লেখা সংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে এই সময়ে [১২৮৪-সালে] রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন। ইতিপূর্বেই [১২৮১ সালে] 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য অংশে-অংশে প্রকাশিত হয়েছে; সেইসব লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা হোতো 'বিহারীবাবুর মতো কাব্য লিখিব'।

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১৫১।

এর মধ্যে ১২৮৫ সালের ৫ই আশ্বিন তারিখে তিনি বিলাত-যাত্রা করেন। সেখানে গিয়ে ছেলেবেলার সাধ পূর্ণ করবার জন্যে তিনি মূরের 'আইরিশ মেলডীজে'র গানগুলি শিখতে শুরু করেন। এই সময়েই তাঁর হাতে আসে হার্বার্ট স্পেন্সরের বই। দেশে ফিরে এসে তিনি হার্বার্ট স্পেন্সরের আরো বই পড়েন। তারই মধ্যে স্পেন্সরের বিশেষ একটি প্রবন্ধের বই পড়ে তিনি গীতি-নাট্য রচনার প্রেরণা পান। সে-কথার উল্লেখসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন :

'হর্বর্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়।......এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।'

[বাল্মীকি-প্রতিভা : জীবনস্মৃতি]

১২৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলাত যান; ফিরে আসেন দু'বছর পরে—১২৮৭ সালে। এই দু'বছরে বিলাতী সুর-সংগীতের গভীর অনুশীলন করেছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোয় ফিরে এসেও তাঁর সে-কাজে বিরতি ঘটেনি। তাঁর নিজের কথায় :

'জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিনই ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক একটি অপূর্বমূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের [রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরীর] চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত।'

—[বাল্মীকি-প্রতিভা : জীবনস্মৃতি]

মনের যখন এই রকম উচ্ছল অবস্থা, সেই সময়ে [১২৮৭ সালে] বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশনে এক নাটক অভিনয় করা ঠিক হয়। এবং সেই নাটক লেখবার ভার দেওয়া হয় উনিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথের ওপরেই। রবীন্দ্রনাথের মনের পটে তখন 'আইরিশ মেলডীজে'র মলাটে ছাপা বীণার ছবির ছায়া রয়েছে! দেশী-বিলাতী সুরের উন্মাদনায় তাঁর মন তখন

ভরপুর,—তার ওপরে সদ্যপ্রকাশিত 'সারদামঙ্গল' [১২৮৬] কাব্যখানিও তাঁর হাতে এসেছে!

তাই বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' থেকেই নাটকের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৌলতে তাতে সুর আরোপ করে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' [১২৮৭] গীতিনাট্য লেখা হয়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দু-এক জায়গায় বিহারীলালের ভাষা পর্যন্ত এসে গেছে। নাটকটির শেষে সরস্বতী কর্তৃক বাল্মীকির হাতে বীণা সমর্পণ করবার যে দৃশ্যটি আছে, তার মূলে ঐ 'আইরিশ মেলডীজে'র বীণার ছায়া অনুভব করতে বাধা নেই! আর, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কয়েকটি গান যে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা,—একথা 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'ই রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম নাটক। অবশ্য তারও আগে নাটকাকারে 'ভগ্নহৃদয়' [১২৮৬] লেখা হয়েছিল। যদিও সেটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একখানি গীতিকাব্য। সেজন্যে কাব্যটি ভারতীতে[১০] প্রকাশকালে ভূমিকায় কবি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন : 'কাব্যটিকে কাহারও যেন নাটক বলিয়া ভ্রম না হয়।······নাটকাকারে কাব্য লিখিত হইয়াছে।'

আখ্যায়িকা-কাব্য, গাথা-কাব্য, অনুবাদ-কবিতা, গীতিনাট্য ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র লিরিক কবিতা রচনারও বিরাম ছিল না। মাত্র সাত আট বছর বয়সে আঁকাবাঁকা ছাঁদে সেই যে পদ্য লেখা শুরু হয়েছিল, সে-লেখার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায় পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বেড়িয়ে আসবার পরে :

'বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। [সাহিত্যের সঙ্গী : জীবনস্মৃতি]

কিন্তু খাতা-ভরা এসব কবিতার 'প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময়ে জ্ঞানাঙ্কুর[১১] নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের

১০। ভারতী : ১২৮৬ কার্তিক।

১১। 'জ্ঞানাঙ্কুর, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র ও সমালোচনা। রাজশাহী, বোয়ালিয়া [১২৭৯ (১৮৭৩)] শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস, সম্পাদক। ···১২৮২ অগ্রহায়ণ মাস হইতে ৪র্থ বৎসর শুরু হয়। এই সংখ্যা হইতে 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত 'প্রতিবিম্ব' মিলিত হইল। ইহার কার্যভার হস্তান্তরিত হইল।' 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' (মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন) ১২৮২, ৪র্থ খণ্ড। কলিকাতা ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট···ক্যানিং লাইব্রেরী। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে···মুদ্রিত।

উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।'

[রচনাপ্রকাশ : জীবনস্মৃতি]

এই 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই [১২৮২ অগ্রহায়ণ] রবীন্দ্রনাথের 'প্রলাপ' নামের কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই কবিতাগুলিতে কবির নাম প্রকাশ করা হয়নি। ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নাম-যুক্ত যে-কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেটি হচ্ছে 'হিন্দুমেলার উপহার।'[১২]

স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে ঠাকুরবাড়ির সহায়তায় 'হিন্দুমেলা' নামে একটি মেলার সূচনা হয়। সেই মেলাতে দেশের স্তবগানের অনুষ্ঠান, দেশানুরাগের কবিতা পাঠ, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতির প্রদর্শন—এবং দেশী গুণিলোককে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা ছিল। এই সবের ফলে ঠাকুরবাড়িতে স্বদেশপ্রেমের অনুকূল যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের ওপরেও তার প্রভাব পড়েছিল। 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় তারই ইশারা। এইসব দেশাত্মবোধের কবিতায় ছন্দে আর ভাবে রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেছিলেন। সে-যুগে দেশাত্মবোধক সংগীত রচনার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের খ্যাতিই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে হেমচন্দ্রের অনুসরণে প্রবৃত্ত করেছিল।

'জ্ঞানাঙ্কুরে'র পরে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপার একটা বড়ো ক্ষেত্র পাওয়া যায় ১২৮৪-র শ্রাবণ মাস থেকে। এই মাস থেকেই ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী' প্রকাশের আরম্ভ। 'ভারতী' প্রসঙ্গে অন্যতম স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে 'ভারতী'তে প্রকাশিত ব্রজবুলিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী। রবীন্দ্রনাথের যখন সাহিত্যচর্চার শুরু, সে সময়ে বৈষ্ণবভাবের কবিতা 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' [১৮৬১] লিখে মধুসূদন দত্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন ব্রজবুলি ভাষা ব্যবহার করেন নি। তবে, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসের গানগুলি ব্রজবুলিতে লেখা হয়। গ্রন্থ হিসেবে সে-যুগে প্রথম বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পাদনা করেন জগবন্ধু ভদ্র [১৮৭০]। তারপর অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ [১৮৭৪-৭৬]। এবং এইসব লেখাই রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেছিল এমন ধারণা করা অসংগত নয়। 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' পাঠের কথা তিনি

১২। দ্র :—রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়, পৃঃ ৭৫-৭৭। 'জীবন-স্মৃতি', পরিশিষ্ট।

স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে লিখে গেছেন। জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'মহাজনপদাবলী' যে রবীন্দ্রনাথের হাতে গিয়েছিল, সেকথা জানিয়েছেন রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়। পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে পৃথ্বীসিংহ নাহার কর্তৃক সংগৃহীত একখানি 'মহাজনপদাবলী'তে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর দেখেছেন বলে প্রভাতবাবু জানিয়েছেন।[১৩] রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'মৃণালিনী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটা মোটেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়। আর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটবার একটা বিশেষ সূত্র তো ছিলই। পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই মধুসূদন তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা'র গ্রন্থস্বত্ব (copy right) যে বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে দান করেছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠবাবু ছিলেন ঠাকুরপরিবারের অত্যন্ত পরিচিত,—অত্যন্ত অনুগত লোক।[১৪]

একদিকে, পদাবলী সাহিত্যের রোম্যান্টিক ভাব,—আর অন্যদিকে মৈথিলী শব্দের সঙ্গে অপরিচয়ের দরুণ একটা কৌতুক ইত্যাদি মিশে রবীন্দ্রনাথের মনে পদাবলী সাহিত্যের ওপর বিশেষ একটা আকর্ষণ জেগেছিল! অন্যদিকে আবার বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রতি অক্ষয় চৌধুরীরও অনুরাগের সীমা পরিসীমা ছিল না।

এতগুলি কারণ মিলিত হওয়ায় প্রচীন পদকর্তাদের নকলে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনিবার্য হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন :

'একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে।' [ভানুসিংহের কবিতা : জীবনস্মৃতি]

ব্রজবুলিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির এটি অন্যতম। এটি ছাপা হয় 'ভারতী' ১২৮৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। এই ১২৮৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকেই 'ভারতী'তে তাঁর পদাবলী প্রকাশের সূত্রপাত ঘটে। এই বছরের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের মোট সাতটি ব্রজবুলি-পদ ছাপা হয়; পরে আরো হয়েছিল। এই পদগুলির লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামই ব্যবহার করেছিলেন। কারণ, তিনি এর আগেই অক্ষয় চৌধুরীর কাছে শুনেছিলেন যে, বালক কবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের নকল করে নাকি

১৩। দ্র-পৃঃ-৬৮ ; 'রবীন্দ্র-জীবনী' (১ম খণ্ড) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ; পৃঃ ৬৭-৬৮

এমন কবিতা লিখেছিলেন যে, অনেকেই তা ধরতে পারেন নি; এইসঙ্গে তিনি অন্য সূত্র থেকে আরো খবর পেয়েছিলেন যে, আমাদের প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা রচয়িতা হচ্ছেন 'ভানুসিংহ'। এই হোলো রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনার ইতিহাস।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঠাকুরবাড়ির চাকরদের মহলে প্রচলিত বই নিয়ে যে বালকের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত, তিনিই কালে অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল প্রমুখের স্নেহচ্ছায়ায় বসে নতুন নতুন উদ্যমে, নতুন নতুন কৌতূহলের পথ ধরে,—লিখে,—গান গেয়ে,—অভিনয় করে,—নিজেকে সব দিক দিয়ে প্রচুর ভাবে প্রকাশ করে গেছেন। এমনি করেই তিনি তাঁর কুড়ি বছর বয়সে পদক্ষেপ করেন।

সাত-আট বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে তিনি লিখেছেন প্রচুর। এবং সে-সব লেখার প্রকারগত বিচিত্রতাও কম নয়! সে-সব লেখায় কবির আপন মনের গুঞ্জনও শোনা গিয়েছিল,—যদিও সে-সব লেখা কপিবুকের পুরু মলাটের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠও কবি একদিন অতিক্রম করেছিলেন—তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। সেই সময়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' লেখা হয়। সেই 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে তাঁকে বলতে শোনা গেছে :

'[সন্ধ্যাসঙ্গীতকে] আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে।'[১৫]

অর্থাৎ এইবারেই কবিতার শাসন থেকে কবি-রবীন্দ্রনাথের মুক্তিলাভ ঘটলো।

১৫। দ্রঃ—রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সন্ধ্যাসংগীতের মুখবন্ধ-অংশ।

শিল্প ও জীবন ঃ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ

বিষণ্ণ-মধুর মৃত্যু যখন আন্তন চেকফকে ক্ষয়রোগের ক্লেদাক্ত কবল থেকে আপন সন্তাপহর আলিঙ্গনে টেনে নেয়, টমাস ম্যান তখনো খ্যাতির মধ্যগগনে পৌছোন নি। তাঁর চেকফ-সম্বন্ধীয় বিশ্রুত নিবন্ধে টমাস ম্যান বলেছেন যে, মহৎ প্রতিভার মৃত্যুতে সংবেদনশীল শিল্পিমন যে গভীর বেদনায় সংক্ষুব্ধ হয়,—চেকফের মৃত্যু নাকি তাঁর মনে সে বেদনার সৃষ্টি করেনি। এর কারণ হিসেবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, চেকফের অসামান্য সৃষ্টি-প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি তখনো ছিলেন উদাসীন ও অনবহিত। চেকফের প্রতি তাঁর এই তৎকালীন অনীহার হেতু, বৃহদায়তন রচনার প্রতি তাঁর অকারণ আসক্তি,—যে-রকম বৃহদায়তন রচনার স্রষ্টা ছিলেন বালজাক, টলষ্টয়, ভাগনার। এর ফলেই ছোটোগল্পের প্রতি তখন টমাস ম্যানের ছিল একটা সানুকম্প মনোভাব; তিনি তখনো উপলব্ধি করেন নি যে, প্রতিভার হাতে পড়ে এই সংক্ষিপ্ত ও সংহত শিল্পরূপ কী আন্তর গভীরতাই না অর্জন করতে পারে! জীবনের সমস্ত সম্পূর্ণতাকে আত্মসাৎ করে এই শিল্প কেমন করে যে সুমিতি লাভ করতে পারে! এপিকের গুণ,—এমন কি শৈল্পিক তীব্রতায় বৃহদায়তন রচনাসম্ভারকেও এ অতিক্রম করতে পারে। বৃহদায়তন রচনা মানেই তো সেই জাতের রচনা—যা মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, ম্যানের স্বীকৃতিতে ধরা দিয়েছে গল্পকার চেকফের মহৎ সৃষ্টিপ্রতিভা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা। চেকফের মিতায়তন জীবনরসনিবিড় ছোটোগল্পে ম্যান খুঁজে পেয়েছেন এপিকেরই গুণ। তিনি বলেছেন, চেকফ গোটা রুশদেশটাকেই তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন,—ঐ বিশাল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর গল্পে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার গ্লানিকর অস্বাভাবিক জীবনচিত্রের পটভূমিকারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বদেশের প্রকৃতি ও মানুষের এই উপলব্ধিনিবিড় জীবননিষ্ঠ রূপায়ণ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বেরও নিশ্চিত প্রতিষ্ঠাভূমি—চেকফের শৈল্পিক সততা এবং গভীর জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রধান গল্পগুলিতেও সমুচিত উজ্জ্বলতায় বিভাসিত।

এ খুবই সত্য কথা যে, গল্পগুচ্ছের গল্পে জীবনের সঙ্গে মহৎ শিল্পের অনিবার্য সাযুজ্যই উদাহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে এদের যোগ গভীর এবং নিবিড়। গোটা বাংলাদেশটাই যেন ভাষা পেয়ে মুখর হয়ে উঠেছে গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায়। বাংলাদেশের প্রকৃতি তার অফুরন্ত ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে হয়ে উঠেছে বাঙ্ময়, বাংলাদেশের ঘরমুখো আত্মতৃপ্ত সামান্য মানুষ তাদের ছোটখাট সুখদুঃখ নিয়েই হয়ে উঠেছে সজীব, প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল।

সাহিত্য কিছু আকাশকুসুম নয়, সৎ সাহিত্যশিল্পী তাই তাঁর সৃষ্টির শিকড় গাড়েন তাঁর স্বদেশে ও স্বকালের মাটিতেই, তবে তার শীর্ষটা উঠে যায় উদার নভোমণ্ডলের দিকে,—যেখানে রয়েছে চিরন্তনতার অম্লান সৌরস্পর্শ। সাহিত্যের সৃষ্টি তাই যত নিবিড়ভাবে লেখকের স্বদেশের ও স্বকালের পরিচিতি, ততই গভীরভাবে সর্বদেশের ও সর্বকালের মানব-মনের বাণীবহ। দেশকালগত সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে অমলিন উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পায়, সেই সঙ্গে রূপ পায় সর্বকালের ও সর্বদেশের মানবমনের মৌল বৃত্তি যা যুগে যুগে সর্বদেশের বিবেকী পাঠকের মনেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিস্ময় জাগায়। এই চিরন্তন সাময়িকতা, এই গভীর এবং সৎ জীবনবোধের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির অনস্বীকার্য সম্পদ।

অনুভূতির গভীরতায় এবং জীবনবোধের সততায় তারা অনায়াসেই এই দেশকালের সংকীর্ণ গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেছে, সমস্ত মানুষের মৌল অকৃত্রিম স্বভাবের অন্তরস্পর্শী রূপায়ণে স্রষ্টা এদের মধ্যে ধ্বনিত হতে দিয়েছেন বিশ্বমানবের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আপনার লেখা আমার ভারি ভাল লাগে।······আপনি কোনরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানব হৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে—এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস, তাই আপনি দেখাবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন। প্রকৃতির শান্তির মধ্যে—স্নিগ্ধচ্ছায়া, শ্যামল নীড়ের মধ্যে যেমন ছোটো ছোটো হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাস করছে, দোয়েল,

কোকিল, বউ-কথা-কও-এর গানের সঙ্গে যে সকল আকাঙ্ক্ষাধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান মেশাবেন।......বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখদুঃখের কথা এ পর্যন্ত কেহই বলে নি—আপনার উপর সেই ভার রইল।...আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল—পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।'

মহৎ প্রতিভাও সমসাময়িক লেখকদের সৃষ্টির ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক সময়েই সঠিক বিচার করে না—সাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্ষেত্রের চূড়ান্ত বিভ্রান্তির পরিচয়ও অনেক সঞ্চিত হয়ে আছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সৃষ্টি-ক্ষমতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও যে কিঞ্চিৎ বেশি উচ্চে অবস্থান করছিল, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই! রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ আশার মর্যাদা শ্রীশচন্দ্র বিশেষ কিছুই রাখতে পারেন নি। তবে চিঠিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এর মধ্যে কথাসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধির প্রকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, সার্থক কথাসাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ঐতিহাসিক রোম্যান্স বা নীতিকথামূলক উপাখ্যানের চেয়ে কিছুমাত্র কম প্রয়োজনীয় নয় (বরং অধিক প্রয়োজনীয়), সরল মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতা এবং ছোটোখাটো ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিফলন—'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস' তারই রূপায়ণ। জীবননিষ্ঠ কথাশিল্পী তাঁর রচনার বিষয়বস্তু তাঁর স্বদেশের মাটি থেকেই আহরণ করবেন—অর্থাৎ বাঙালী লেখক বলবেন 'বাংলার অন্তর্দেশবাসী নিতান্ত বাঙালীদের সুখদুঃখের কথা।' এ ছাড়া আরো লক্ষ্য করবার বিষয় স্বদেশের প্রকৃতির দিকেও রবীন্দ্রনাথের গভীর মনোযোগ,—প্রকৃতি ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বিষয়ে তাঁর নিবিড় প্রতীতি! তাই তাঁর আশা, 'একদিকে শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা',—আর অন্যদিকে 'এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে বিরহমিলন হাসিকান্না দিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে'—এই দুই দিককেই অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রকৃতি আর বাংলাদেশের মানুষ—উভয়কেই বাঙালী লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জায়গা দেবেন। যদিচ রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি লিখেছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের উপন্যাস রচনাকে উপলক্ষ করে, তবু সমগ্র কথাসাহিত্য সম্বন্ধেই তাঁর এই উপলব্ধি সমভাবে প্রযোজ্য। আমার বিনীত বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর

উপন্যাস রচনার মধ্যে নয়, ছোটগল্পের মধ্যেই পরম সার্থকতার সঙ্গে তাঁর এই উপলব্ধিকে রূপ দিয়েছেন—'গল্পগুচ্ছে'র পাতাতেই তিনি প্রথম এবং সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ভাবে বলেছেন 'আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তু-ভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল—পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী'—যা 'কেউ ভাল করে বলেনি।' এবং গল্পগুচ্ছের পাতাতেই তিনি প্রথম রূপায়িত করেছেন মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির গভীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক—একদিকে দেখিয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতির চিত্রপটে সৃষ্টিকর্তার অমর্ত তূলিকায় হৃদয়হরণ রঙের খেলা, আর অন্যদিকে, তার পটভূমিকায় প্রসারিত বিচিত্র মানবজীবন, যার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় প্রকৃতির মতোই বর্ণসুষম ঋতুচক্রের চিরন্তন নবীনতা।

সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি এবং জীবন সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা—সৎ শিল্পীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ দুইই অপরিহার্য উপাদান। কল্পনা যতই সূক্ষ্ম হোক, দূরপ্রসারী হোক, কিছুটা প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা না থাকলে শিল্পীর জীবনদৃষ্টিতে গভীরতার স্পর্শটি ঠিক লাগে না। রবীন্দ্রনাথের সহজাত কল্পনাবোধ জীবনাভিমুখী হয়েছিল পদ্মাতীরের মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে। তাঁকে যখন জমিদারি পরিদর্শনের কাজে যেতে হোলো,—শিলাইদহে, সাজাদপুরে, পতিসরে যখন তাঁকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হোলো, অভিজাত জীবনযাত্রার সংকীর্ণ বেড়ায় আবদ্ধ তাঁর মন সাধারণ মানুষের মাঝখানে তখনই পেল মুক্তি। মানবজীবনের কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায় ডুব দিয়ে, গাগরী ভরে নিয়ে তাঁর স্রষ্টামন জীবনের অতল গভীরতার স্পর্শ পেল। 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে জীবন সম্বন্ধে তাঁর এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর—'ছিন্নপত্রে'র নৌকার মাস্তুল নিয়ে ক্রীড়ারত বালকদের মধ্যেই তিনি তাঁর 'ছুটি'র ফটিক চক্রবর্তীকে খুঁজে পেয়েছিলেন,—আর 'ছিন্নপত্রে'র সেই 'চুল-ছাঁটা, গোল-গাল হাতে বালা পড়া, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী' শ্বশুরবাড়ি-যাত্রিনী মেয়েটিই ত তাঁর অম্লান 'সমাপ্তি' গল্পের অবিস্মরণীয়া মৃন্ময়ীরূপে দেখা দিয়ে গেছে। ফলতঃ জীবনের এই গভীর এবং নিবিড় উপলব্ধিই 'গল্পগুচ্ছে'র প্রধান গল্পগুলিতে অম্লান প্রাণশক্তির স্পর্শ এনে দিয়েছে। তাই এইসব গল্পের পাত্রপাত্রী তাদের নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েও ভিন্ন পরিবেশ অধিষ্ঠিত প্রায় সকল রসগ্রাহী মনের কাছেই তাদের আবেদন পৌঁছে দিতে পেরেছে। বিশেষ দেশকালে সীমাবদ্ধ থেকেও তারা তাই হয়ে উঠেছে চিরন্তনতার অম্লান স্পর্শে প্রদীপ্ত। তাই বলা যায়, গল্পগুচ্ছের প্রধান গল্পগুলির প্রায় সব ক'টিতেই যদিচ উনিশ শতকের শেষের বাংলাদেশের ছবিই বিধৃত হয়েছে,

তবু মনে হয় যেন এগুলির মধ্যে চিরকালের বাংলাদেশই—তার বৃদ্ধ, যুবা, প্রবীণা, যুবতী, বালক-বালিকা, চণ্ডীমণ্ডপ, রথতলা, আটচালা; হাট, ঘাট, নদী, প্রান্তর, বাঁশতলা নিয়ে সবাক সচল হয়ে উঠেছে!

গল্পগুচ্ছের বিভিন্ন গল্পের বিচিত্র চরিত্রগুলির কথা মনে করলে তাদের স্রষ্টিকর্তার সৃষ্টিশক্তির অসামান্য পরিচয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কয়েকটি চরিত্রের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। 'পোষ্টমাষ্টারের' সামান্য গ্রাম্য বালিকা রতন—যার করুণ মুখচ্ছবি গল্পের শেষে পোষ্টমাষ্টারের চোখে এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথাকে প্রকাশ করে দিয়েছে,—'গিন্নী'র আশু—শিবনাথ পণ্ডিতের প্রচণ্ড উপহাসের তাড়নায় যে বিড়ম্বিত, 'একরাত্রি'র নায়ক ভাঙ্গা ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার,—ম্যাটসিনী গ্যারিবল্‌ডি হবার আয়োজনে যে জীবনের সহজ সুখকে বিসর্জন দিয়ে বিভ্রান্ত হোলো, আর অবশেষে একদিন ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে তার প্রিয়তমার পাশে দাঁড়িয়ে যে উপলব্ধি করলো তার ইহজীবনে কেবল এই ক্ষণকালের জন্যেই একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হয়েছিল, যা তার তুচ্ছ জীবনকে দেহাতীত প্রেমের অমর্তলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে,—'কাবুলিওয়ালা'র রহমৎ যার বিশাল বক্ষস্থিত পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতী হস্তচিহ্ন গল্পের শেষে কথকের সামনে তার চিরন্তন পিতৃ-হৃদয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়,—'ছুটি'র বালক সর্দার ফটিক চক্রবর্তী, ইহজীবনের বন্দীত্ব থেকে দুরন্ত প্রাণচঞ্চল যে বালক মৃত্যুর অসীম বিস্তারের মধ্যে মুক্তি পেল,—'শাস্তি'র চন্দরা, নিরীহ চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, পৃথিবীর সকল বিষয়ে যার কৌতুক আর কৌতূহল—এবং গল্পের শেষে নিদারুণ অভিমানের সঙ্গে যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছে,—'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী—গল্পের প্রথম দিকে লেখক যার বর্ণনায় বলেছেন 'দেখতে শ্যামবর্ণ, ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাব-লীলার লেশমাত্র।'—আর যার মোহমধুর প্রেম ব্রীড়াকুণ্ঠিত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এসে তার মানসশতদলটি উন্মোচিত করে তাকে লাজমধুর প্রেমময়ী পরিপূর্ণ মানবীতে পরিণত করেছে এবং যার শুদ্ধ গ্রামীণ স্বভাবের মধ্যে আমরা চিরকালীন প্রেমিকার মায়ারঙীন মূর্তি দেখতে পেলুম,—'মেঘ ও রৌদ্রে'র গিরিবালা, জঙ্গলে বেষ্টিত, কর্দমাক্ত সংকীর্ণ গ্রামপথের মধ্যে ডুরে-কাপড়-পরা যে অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমান-মলিন মুখের শেষ স্মৃতি বিধাতারচিত অতি-গভীর, অতি

বেদনাপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মতো নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় শশিভূষণের মানসপটে প্রতিফলিত হয়েছিল,—'অতিথি'র তারাপদ—প্রকৃতির মুক্ত স্বাধীন সন্তান, মানবিক কোনো মোহবন্ধনই যাকে চিরতরে বেঁধে রাখতে পারে না, কাঁঠালিয়ার জমিদার-বাড়িতে দীর্ঘ দু'বছর থাকার পর একদিন বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে যে তার আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর কাছে চলে গেল, —'নষ্টনীড়ে'র ভূপতি, প্রকৃত ট্র্যাজিক চরিত্র যার,—বাইরের কঠোর সংসারের কাছ থেকে কঠোর আঘাত খেয়ে যে প্রথমে আপনার নিভৃত অন্তঃপুরে আশ্রয় খোঁজে, তারপর সে যখন দেখে বিধির প্রচণ্ড তাড়নায় তার সেই প্রচণ্ড বেদনার কথা সে কারো কাছে মুখফুটে প্রকাশ করতে পারে না, তার হলাহলটুকু তখন সে সম্পূর্ণ নিজে গ্রহণ করে নীলকণ্ঠে পরিণত হয়,—'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারিলাল, একটি কল্পনাপ্রবণ শিল্পিমনের যে অধিকারী, বংশমর্যাদার সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিদ্রোহী ধ্বজা তুলেছিল, এবং শেষে যখন দেখেছে তার হৃদয়বিহারিণী তন্বী কিরণলেখাও তার নয়, সে হালদার-গোষ্ঠীরই বড়োবউ, তখন যে নিজবংশের বাসগৃহ ত্যাগ করে গেল,—এই কয়টি চরিত্রের কথাই আপাততঃ মনে আসছে! গল্পগুচ্ছের পাতায় পাতায় আরো কত বিচিত্র চরিত্রই না ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এ কয়টি মাত্র চরিত্রের উল্লেখেই কি একথা মনে করে বিস্ময় জাগে না যে গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র মানবসংসারের কী এক আশ্চর্য বিস্ময়কর চলচ্ছবিই না আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ?

পূর্বেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও গল্পগুচ্ছের জীবননাট্যের অন্যতম চরিত্র বলে স্বীকার্য। অবশ্য মানতেই হবে যে, গল্পগুচ্ছের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেই একথা বিশেষভাবে সত্য, তৃতীয় খণ্ড সম্বন্ধে নয়। তৃতীয় খণ্ডের 'হালদার-গোষ্ঠী' থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে 'সবুজপত্রে'র পর্যায় আরম্ভ হয়েছে, তাতে প্রথম দু'খণ্ডের পল্লীবাসী রবীন্দ্রনাথ নাগরিক হয়েছেন। বিশেষ করে 'স্ত্রীর পত্র' থেকে আবার যে গল্পধারার শুরু, তাতে বক্তব্যের প্রাধান্যে ঘটনার সহজ প্রবাহ যেমন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তেমনি আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে এই কথা ভেবে যে, সহজ সুখদুঃখের মর্মস্পর্শী কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির ব্যাপ্ত, গভীর ভূমিকাও তখন কতো দূরের বস্তু! অবশ্য 'স্ত্রীর পত্রে' প্রসারিত সমুদ্র ও উদার আকাশের কিছুটা ভূমিকা আছে, মৃণালের বন্ধনমুক্তির উদাত্ত সুরমূর্ছনা

তাদের মধ্য দিয়েও যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে,—তবুও প্রকৃতির সহজ মাধুর্য যে সেখানে বক্তব্যের কাছে গৌণ হয়ে গেছে, একথা অনস্বীকার্য। তবে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গল্পগুলিতে প্রকৃতির এটুকু ভূমিকারও আর দেখা মেলে না। একেবারে শেষ পর্যায়ে 'তিনসঙ্গী'র 'শেষ কথায়' আবার প্রকৃতির পট-ভূমিকাটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু 'তিনসঙ্গী'র চমকপ্রদ ভঙ্গির সজ্ঞান প্রদর্শনীর মাঝখানে সেই আগেকার অকৃত্রিম সুরটুকু ঠিক যেন আর বাজে না!

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পে প্রকৃতি কখনই পরিহার্য অলংকার নয়, গল্পের তা অপরিহার্য অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি সেখানে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মনে হয়, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যেন একই প্রাণ-শক্তি কাজ করেছে,—প্রকৃতি আর মানুষ দুয়ে মিলে যেন একটা সমগ্র পরিবেশ গড়ে তুলছে। কোথাও দেখি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল ব্যাপ্ত পটভূমিকায় সুখে-দুঃখে উচ্ছল অন্তরস্পর্শী ঘটনা নিয়ে মানবজীবনের আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন —যেমন 'পোষ্টমাষ্টারে, 'মেঘ ও রৌদ্রে'; আবার কোথাও দেখি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা মানবিক সম্পর্কের মতই সজীব হয়ে উঠেছে, যেমন 'অতিথি'তে ও 'সুভা'য়। 'পোষ্টমাষ্টারে' দেখি রতনের নিতান্ত ব্যক্তিগত দুঃখ বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যাপ্ত পটভূমিকায় বিশ্বজনীন দুঃখে পরিণত হয়েছে। 'পোষ্টমাষ্টার যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।' 'মেঘ ও রৌদ্রে' প্রৌঢ় শশিভূষণের স্মৃতিতে উদিত হয়েছে 'সেই ক্ষুদ্র গরাদ-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্য পথ, সেই ডুরে-কাপড় পরা ছোট মেয়েটি।' এখানে লক্ষণীয় যে অসমতল পথটিও এই ছবিটির একটি অপরিহার্য অংশ, ডুরে কাপড় পরা মেয়েটির ছবিটি তাতেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। 'অতিথি'র তারাপদ এবং 'সুভা'র সুভা, উভয়েই যেন প্রকৃতিরই স্নেহলালিত সন্তান। প্রকৃতি অহরহ কি যেন এক মায়ামন্ত্রে তারাপদকে বিমুগ্ধ করতো। গাছের ঘন পাতার ওপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারার শব্দ হোতো, আকাশে মেঘ ডাকতো, অরণ্যের মধ্যে মাতৃহীন দৈত্য-শিশুর মতন বাতাস যখন কাঁদতো,—তখন তার মন যেন বড়োই ব্যাকুল হয়ে পড়তো। গল্পের শেষে দেখি বর্ষার উন্মত্ত প্রকৃতিই তার কাছে বাধাবন্ধনহীন বিশ্বপৃথিবীর উদাত্ত আহ্বান পৌছে দিয়েছে। 'সুভা'য় দেখি

প্রকৃতিই যেন মূক সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দিয়েছে, যেন তার হয়ে কথা কয়ে উঠেছে! 'তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত',—'এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা'—মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ের প্রতি একই বিশেষণ প্রয়োগ করার ফলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একদিকে জীবনবোধ, অন্যদিকে শিল্পবোধ—এ দুয়ের সুসংগত সমন্বয়েই মহৎ শিল্পের জন্ম। গল্পগুচ্ছের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে এই পরম সমন্বয়ই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই মনে পড়ে 'নষ্টনীড়ে'র কথা—যে গল্পটি সুমিতি এবং গভীরতার সুখকর মিলনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। মিতভাষিতার এক বিস্ময়কর উদাহরণই এখানে আমরা দেখতে পাই। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, ঘটনার সহজ স্বচ্ছ প্রবাহ এবং সুমিত-কথন সাধারণভাবে গল্পগুচ্ছের প্রধান গল্পগুলির সব কয়টিরই বৈশিষ্ট্য। সংহত-সংযত বর্ণনার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত হিসেবে আর-একটি গল্পের কথা মনে পড়ে। সেটির নাম 'শাস্তি'। অবশ্য বলাই বাহুল্য, শিল্প ও জীবনের এই প্রার্থিত মিলন 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্পেই সংঘটিত হতে পারেনি। এর কারণ মনে হয় একাধিক। প্রথমতঃ গল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথের মনে মাঝেমাঝে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—সে দ্বন্দ্ব প্রথার সঙ্গে স্বভাবের দ্বন্দ্ব! প্রথার প্রতি আনুগত্য রবীন্দ্রনাথকে গল্পের মধ্যে ঘটনার চমৎকারিত্বকে প্রশ্রয় দিতে প্রলুব্ধ করতো, কিন্তু তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাব চাইতো জটিলতাহীন সহজ ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই মানব-মনের অন্তহীন রহস্যের জীবননিষ্ঠ রূপায়ণ। এই দ্বন্দ্বের ফলে রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—তাদের গঠনের মধ্যে অনিবার্যভাবেই প্রবেশ করেছে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি। যেমন, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির গঠনে লক্ষ্য করা যায় অত্যধিক শিথিলতা। ঘটনাবহুল কাহিনীর প্রতি লেখকের আসক্তি গল্পটিকে একটি অখণ্ডতার মধ্যে রূপায়িত হতে দেয়নি। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'—যেটি রবীন্দ্রনাথের নিকৃষ্ট গল্পগুলির মধ্যে একটি—সে-গল্পেও ঘটনার চমৎকারিত্বের কাছে লেখক-মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও সহজ কল্পনাশক্তি নতিস্বীকার করেছে। অবশ্য ঘটনার চমৎকারিত্বের প্রতি দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পের ক্ষেত্রেই যে কুফল ফলিয়েছে, একথা সত্য নয়। কাব্যময়তা ও মনস্তত্ত্বের নিবিড় ছোঁয়ায় কোথাও কোথাও তিনি আখ্যানবস্তুর চাতুর্যকে স্নিগ্ধ ও নমনীয় করে এনেছেন। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 'দুরাশা'। এই গল্পের শেষে একটি

অপ্রত্যাশিত চমক আছে বটে, কিন্তু তবু বলতে হয় মোপাসাঁর 'হীরক কণ্ঠহার' গল্পটির ফলশ্রুতির সঙ্গে এর ফলশ্রুতির যেন অনেক পার্থক্য! একটি সু-দূরশ্রুত মোহমদির গানের সুর সমস্ত গল্পটির মধ্য দিয়ে যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে!

জীবননিষ্ঠা ও শিল্পবোধের বিচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে আর-একটি কারণেও ঘটেছে। সে কারণটি হোলো বক্তব্যের অতিরিক্ত প্রাধান্য। 'গল্পগুচ্ছ'-তৃতীয় খণ্ডের কয়টি গল্প সম্বন্ধেই এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রথমেই মনে পড়ে 'স্ত্রীর পত্রে'র কথা। এ গল্পে সৎশিল্পীর নির্ভীক জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় নিঃসন্দেহে লাভ করা যায়,—কিন্তু স্বীকার করতেই হয়, স্রষ্টার শিল্পবোধের সুসংগত প্রকাশ এখানে ঘটে নি। প্রচারই হয়েছে এখানে মুখ্য, তার আড়ালে প্রকাশের আগ্রহ চাপা পড়েছে। লেখক গভীর জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু জীবনশিল্পীর দুর্লভ মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। 'নামঞ্জুর গল্প' সম্পর্কেও এই সিদ্ধান্ত খাটে। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে 'পয়লা নম্বর' গল্পেই রচয়িতার শিল্পবোধের অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

শুধু সমসাময়িক জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার কাহিনী রূপায়ণেই নয়,—অন্যতর কোনো জগতের বার্তাবহ অতি-লৌকিক কাহিনী বর্ণনাতেও রবীন্দ্রনাথ অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য একথা সহজেই স্বীকার্য যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর গল্পের ওপরেই গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব নিশ্চিতভাবে নির্ভরশীল, যদিচ দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর গল্পের অনুল্লেখে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচারও করা হয় না। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতম 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এই গল্প পড়ে একথা মনে না হয়েই পারে না যে, কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে গল্পলেখক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে হাত মিলিয়েছেন,—এমন কি তাঁরই ভূমিকা এখানে যেন বেশি! কারণ, কাব্যময়তাই 'ক্ষুধিত পাষাণের' সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই গুণের জন্যেই এই শ্রেণীর অন্যান্য অতিলৌকিক গল্পের তুলনায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' বিশেষ এক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। মনে করা যাক, দুজন বিখ্যাত লেখকের দুটি অতিলৌকিক গল্পের কথা—মোপাসাঁর 'একটি প্রেত', এবং এডগার অ্যালান পোর ঐ ধরণেরই একটি,—এ দুটি গল্পের আবেদন থেকে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর আবেদন একেবারে পৃথক—'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর অসামান্য সুরমূর্ছনার কোনো রেশই এই দুটি গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'একটি প্রেত' গল্পে গল্প-কথক সারুকি ছ লা সামুয়ে যখন সেই শ্বেতবসনা দীর্ঘকায়া রহস্যময়ী

রমণীর লম্বা কালো চুল আঁচড়ে দেয়, আর, তার সমস্ত দেহে সরীসৃপদেহ স্পর্শের ক্লেদাক্ত শীতল অনুভূতি সঞ্চারিত হয়, তখন পাঠকের মনে এক প্রচণ্ড শিহরণই শুধু জেগে ওঠে। এই একই ভয়ার্ত অনুভূতি পাঠকের মনে জাগে যখন এডগার অ্যালান পো'র সেই গল্পটির শেষে রক্তাক্ত শ্বেতবসনা লেডি ম্যাডেলিন কফিন থেকে উঠে এসে গল্প-কথকের সামনে দাঁড়ায়। সমস্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিই যেন একটি অখণ্ড সুরের মূর্ছনা, পাঠকের চেতনাকে তা এক অপরূপ মায়ালোকে উত্তীর্ণ করে দেয়,—নিয়ে যায় 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে, জগতের নদীগিরি সকলের শেষে!' নির্জন আরালী পর্বত, উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো চঞ্চলগামী শুস্তা নদী, পরিত্যক্ত বিজন পাষাণপ্রাসাদ, শুস্তার নির্মল নীল বুকে দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাট, বনতুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল থেকে উত্থিত ঘনসুগন্ধ,—গল্পের সমস্ত পরিবেশটিই যেন সেই অখণ্ড সুরের আবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, এমন কি পাগল মেহের আলির চীৎকৃত সতর্কবাণী 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়' ও সুরের অখণ্ডতায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নি, কারণ নিষেধবাক্য যেমন নিষিদ্ধ বস্তুর আকর্ষণকে দ্বিগুণতর করে তোলে, তেমনি মেহের আলীর উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাও ক্ষুধিত পাষাণের স্বপ্নমায়ার আচ্ছাদনটিকে আরো নিবিড় করে তুলেছে।

শিল্পদৃষ্টি ও জীবনবোধের যে শুভমিলন গল্পগুচ্ছের প্রধান গল্পগুলির মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি,—'তিনসঙ্গী'র কোনো গল্পেই দুর্ভাগ্যবশতঃ তার সাক্ষাৎ বিশেষ পাওয়া যায় না। তার কারণ, মনে হয়—রবীন্দ্রনাথ এখানে তাঁর আপন স্বভাবধর্মকে লংঘন করতে চেষ্টা করছেন, আপন স্বভাববিরোধী আধুনিকতার মায়াহরিণীর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে, আপন শিল্পধর্মের অম্লান শুদ্ধতাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেছেন! আধুনিকতার যে-সব বিশেষ লক্ষণ বর্তমানে স্থিরীকৃত হয়েছে, রবীন্দ্র-মানসের মহৎ প্রশান্তির সঙ্গে তার কোনোটিই খাপ খায় না। আধুনিক কালের দ্বন্দ্বদীর্ণ জীবনের যন্ত্রণা, তার নৈরাশ্য, তার তিক্ততা—রবীন্দ্রনাথের অটল মহিমান্বিত স্থৈর্যকে কিছুতেই তাই স্পর্শ করতে পারে নি। তথাকথিত 'আধুনিক' মনের সঙ্গে তাঁর মনের এতই দূরত্ব যে, তাঁর শুধু তুলনা চলে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থিত স্থিরজ্যোতিঃ নক্ষত্র বা নিঃসঙ্গ তুষারগিরির সঙ্গে। তাই আধুনিকতার যে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় এলিঅট গান ধরেন পোড়ো-জমি-আর-ফাঁপা-মানুষের,—কাফ্‌কার মানসলোকে গ্রেগর সাম্‌সা যেখানে বীভৎস কীটে রূপান্তরিত হয়,—সেই যন্ত্রণা রবীন্দ্র-সাহিত্যে অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত, অথচ আশ্চর্যের বিষয়

আপন স্বভাববিরোধী বলেই, রবীন্দ্রনাথ যে বেশ কয়েকক্ষেত্রে আধুনিক সাহিত্যের নির্বিচার বাস্তবতা ও অন্যান্য অনুষঙ্গের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন, তিনিই আবার কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে আধুনিক বাস্তবতার চড়া রঙে নিজের রচনাকে রাঙাতে চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই দ্বন্দ্ব তাঁর সৃষ্টিকে কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, রচনায় এনেছে কৃত্রিমতা।

ভঙ্গিপ্রাধান্যময় 'তিনসঙ্গী'র প্রথম গল্প 'রবিবার'। 'রবিবার'-এর নায়ক অভীককুমারকে আধুনিক মনের প্রতিভূ হিসেবে আঁকতে চেষ্টা করা হয়েছে। সে নাস্তিক,—'আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে দুর্দান্ত কালাপাহাড়'—চিত্রকলার দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত,—'বাঙ্গালী টিশিয়ান'। কিন্তু লক্ষণীয় আধুনিকতার এই প্রতিভূটি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ততোটা আকর্ষণ করে না! মনে হয় তার আধুনিকতা যেন স্বভাবজ নয়, সে যেন ওপর থেকে চাপানো। তার কথায় তাই আন্তরিকতার প্রাণস্পর্শ লাগেনি, কতকগুলো চটকদার অন্তঃসারশূন্য কথা বলে সে 'আধুনিক' বলে পরিগণিত হবার স্পর্ধিত দাবি জানাচ্ছে। তার বিদ্রোহ যে একটা শূন্যগর্ভ বিলাস, তার নাস্তিকতা আচারসর্বস্ব ধর্মের মতই যে একটা বাইরের জিনিস, এ-ধারণাটা স্পষ্ট হয়, যখন তার মুখে শুনি 'পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।' 'কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে'—লেখকের এই অতি স্পষ্ট উক্তি আমাদের মনকে সত্যিই গভীর ভাবে আকর্ষণ করে না, অভীকের 'দুর্দাম' 'দুরন্ত' পৌরুষ আমাদের মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধা জাগায় না। কারণ, তার আগেই আমাদের মন তার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় ভরে যায় যখন আমরা দেখি সে তার জন্মদিনে মনীষার উপহার দেওয়া ঘড়িটা বিভার কাছে বেচতে আসে এবং বিভার কথার জবাবে নির্লজ্জের মতন নাস্তিকতার ফাঁকা বুলি আওড়ায়! আসলে অভীক লেখক-মনের সংবেদনে অভিসিঞ্চিত হয় নি, ব্যঙ্গের তির্যক দৃষ্টিতে লেখক প্রায় আগাগোড়াই তাকে এঁকেছেন—শুধু একটি ক্ষেত্রে হয়তো লেখকের অজ্ঞাতেই অভীক তাঁর সহানুভূতির অমৃতস্পর্শ লাভ করেছে, যেখানে অভীক বিভার কাছে চিঠিতে প্রচণ্ড অভিমানের সঙ্গে তার ছবির ভবিষ্যৎ স্বীকৃতির

আশা ব্যক্ত করছে—'তোমার ঐ হারের বদলে আমার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেক্ষা কর কী, আমার মধুকরী, তুমি ঠকবে না কখনোই না। হঠাৎ যেমন কোদালের মুখে গুপ্তধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁক করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির দুর্মূল্য দীপ্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে।'—এর মধ্যে অনিবার্যভাবে আমরা চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরই শুনতে পাই। মনে পড়ে তাঁর আশ্চর্য অসামান্য চিত্রসৃষ্টির প্রতি সমকালীন অবজ্ঞার কথা,—মনে পড়ে আর্টস্কুল-অধ্যক্ষের সদম্ভ উক্তি,—রবীন্দ্রনাথ তো একটা দেশলাইবাক্স আঁকতে পারেন না, তাঁকে কি করে চিত্রকর বলা যায়! মনে পড়ে যামিনী রায়কে লেখা চিঠির মধ্যে দেশীয় কলারসিকদের প্রতি তাঁর ব্যথাহত অভিমানের প্রকাশ, 'আমাদের সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের এই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না।' বলা বাহুল্য, অভীক সম্বন্ধে লেখকের এই সংবেদনশীলতা, সমগ্র রচনার ক্ষেত্রে কখনোই সত্য নয়। লেখকের সমস্ত সহানুভূতি পড়েছে বিভার ওপর, যার মধ্যে আধুনিকা নারীর বিদ্যুৎদীপ্তি একেবারেই নেই, আছে এক শান্ত স্নিগ্ধ কল্যাণশ্রী। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে নারীর শুচিস্নিগ্ধা কল্যাণী মূর্তির যে আদর্শ চিরবিরাজিত ছিল, বিভার চরিত্রে তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। অভীকের কণ্ঠে অকৃত্রিমতার স্পর্শ তখনই কিছুটা লাগে—যখন সে চিঠিতে তার নাস্তিকতা এবং বিদ্রোহের সমস্ত ভান ত্যাগ করে সনাতন ভারতীয় আত্মার প্রতিভূ বিভার কাছে আত্মসমর্পণের আগ্রহ জানায়।

'শেষ কথা'র বক্তব্যেও কিছুমাত্র নতুনত্ব নেই। অচিরা বিভার মতই সংযমস্নিগ্ধা কল্যাণী নারী, পুরুষের জ্ঞানসাধনার মধ্যে সে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায় নি, সমস্ত কামনাকে সংযত করে তাই সে নবীনমাধবের কাছ থেকে সরে গেছে। অচিরা বলেছে 'ভালবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ।'—এখানে হিন্দু নারীর সনাতন আদর্শই অচিরার মধ্য দিয়ে কথা কয়ে উঠেছে। ভাবের সঙ্গে রূপের দ্বন্দ্ব 'শেষ কথা'তেও স্পষ্ট হয়েছে। প্রকাশভঙ্গিতে আধুনিকত্ব আনতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষায় অকারণ চমক ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। এটা বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রীর সংলাপে। অচিরার প্রগল্‌ভতা তার স্বভাবের সঙ্গে মোটেই

খাপ খায় নি, আর দাদুর কৈফিয়ৎও এই অসঙ্গতিকে ঢাকতে পারে নি। 'ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে দিদিমা-দি-সেকেণ্ডের আমদানি করতে হবে, তোমার লাইব্রেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে, আমি দেব লম্বা দৌড়।'—এরকম কথা তার মত মেয়ের মুখে একেবারেই বেমানান।

'তিন সঙ্গী'র সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট গল্প 'ল্যাবরেটরি'র নায়িকা সোহিনী নাম্নী এক 'অসামান্যা' নারী। 'ল্যাবরেটরি' গল্প অনেককেই বিস্ময়ে চকিত করেছে,—তাঁরা সোহিনীকে দেখতে পেয়েছেন আধুনিকা তেজস্বিনী নারীর প্রতিভূরূপে, বৃদ্ধ কবির আশ্চর্য দুঃসাহসিকতায় অনেকে চমকে উঠেছেন, প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর আধুনিকতাকে, তাঁর লেখনীতে অভিমূর্ত তারুণ্যের প্রচণ্ড তেজকে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন এই ভেবে যে, সোহিনী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে এতই দুঃসাহসিক অভিনব সৃষ্টি যে 'ল্যাবরেটরি' প্রকাশের ফলে বৃদ্ধবয়সে তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে বলে চারিদিকে নিন্দার ঝড় উঠবে। কিন্তু সে-দিনের সে-প্রহর থেকে আজ দূরে বসে দেখছি, 'ল্যাবরেটরি' গল্পের ওপর থেকে সমকালীনতার চোখ-ধাঁধানো জৌলুষ ম্লান হয়ে গেছে, উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে তার সত্যস্বরূপ। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের বহিরঙ্গে কিছু অকারণ চমক আছে, ভঙ্গি নিয়ে কসরৎ আছে, কিন্তু ভাববস্তুর মধ্যে দুঃসাহসিক নতুনত্ব কিছুই নেই, সোহিনী চরিত্রের মধ্য দিয়েও প্রকৃত অর্থে নারীত্বের কোনো বিস্ময়কর নতুন মূল্যই আবিষ্কৃত হয়নি। যদিচ সোহিনীর আচরণে স্বাভাবিক সংস্কার ও নারীস্বভাবের বিরোধী কিছু-কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে,—যেমন দৈহিক পবিত্রতা রক্ষার নারীসুলভ সংস্কার তার মধ্যে কিছুমাত্র নেই, দেহের টানে পড়ে সে সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারে, আর প্রয়োজন হলে সে ছোরা ধরতেও ভয় পায় না, তবু এই আপাত অভিনবত্বের আবরণটুকু সরিয়ে নিলে তার অন্তরের যে প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা চিরকালের সতী-সাধ্বী হিন্দু নারীরই—বড় জোর বলা যেতে পারে তারই এক চমকপ্রদ, অভিনবতর সংস্করণ! নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরির প্রতি তার দুর্মর আসক্তিতে গভীর পাতিব্রত্য প্রকাশ পেয়েছে,—আর এই সব উক্তিতে: 'চৌধুরীমহাশয়, আপনি ভুল করবেন না, আমি মেয়েমানুষ। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার স্বামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদীর তলায় কোনো একজন যোগ্য লোককে বাতি জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে থাকুন তাঁর মন খুশি

হবে।' 'তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধূপধুনো জ্বালিয়ে শাঁখঘণ্টা বাজাই।' 'যাই হোক তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।' 'আমার প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে, আমার দেবতার ভাণ্ডারের দ্বার। তাদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে।'—তাতে মনে এই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, ল্যাবরেটরি গল্পে ভঙ্গির কৃত্রিম চমকের আড়ালে এক অভিনব বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

দায়িত্ব এড়ানো কিছু শ্রদ্ধার নিদর্শন নয়, একথা ভেবেই 'তিনসঙ্গীর' কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা গেল। অনেকেই দেখেছি স্পষ্টভাষণের ভয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে তিনসঙ্গীর আলোচনা করেন না বা নামেমাত্র করেন। কিন্তু একথা মনে রাখলেই সমস্ত দ্বিধাসংকোচ দূর হয়ে যায়, যে প্রত্যেক মহৎ লেখকের সৃষ্টির মধ্যেই ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু না কিছু লক্ষ্য করা যায়, প্রতিটি সৃষ্টিই লেখকের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন করে না,—এবং তাতে তাঁদের মহত্ত্বের কিছুমাত্র হানি হয় না। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও এই সত্যটি স্বীকার্য। 'গল্পগুচ্ছে'র যে-গল্পগুলিতে গল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বলতম পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলির মধ্যে আমরা মহৎ জীবনবোধের সঙ্গে অসামান্য শিল্পবোধের পরম প্রার্থিত সমন্বয়ই লক্ষ্য করি, এবং সেই সব রচনা সম্বন্ধে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ছোটোগল্প-লেখক রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা গল্প-সাহিত্যেরই প্রধানতম পুরুষ নন,—বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িক পত্র

[সবুজপত্রের পূর্ব-যুগ]

শ্রীভবতোষ দত্ত

বাল্যকালের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তখন বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-ক'টা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।' বাংলা বইয়ের দৈন্যের দিনে যে তিনটি পত্রিকা রসলোলুপ বালকের মনোহরণ করেছিল, তারা হচ্ছে 'বিবিধার্থসংগ্রহ' 'অবোধবন্ধু' এবং বঙ্গদর্শন'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত প্রথম পত্রিকাখানি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই প্রকাশিত হয়ে ছয় বৎসর চলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের আলমারিতে এই পত্রিকা বাঁধানো এক ভাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বারবার করিয়া সেই বইখানি পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজীর বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'

অবোধবন্ধু পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৮৬৩-র এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায় এবং আবার প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় পর্যায়েই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পৌল বর্জিনী' পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ চোখের জল ফেলেছিলেন। তাঁর শিশুচিত্ত ঘুরে বেড়িয়েছে সমুদ্রসমীরকম্পিত নারকেলবনে, ছাগলচরা পাহাড়ের উপত্যকায়, কোন সাগরের তীরে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত বৎসর। তাঁর স্বপ্নপ্রবণ মনের জাগরণ ঘটাতে অবোধবন্ধুর সাহায্য বড়ো কম ছিল না। বিশেষত এই পত্রিকাতেই বিহারীলালের কবিতা তিনি প্রথম পড়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন 'তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত।' বিহারীলালের মতো কবি হবেন, বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের ছিল এই আকাঙ্ক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো বারো বৎসর তখন বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন 'বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।' বালক পাঠকের স্বভাবতই প্রবন্ধ অপেক্ষা গল্পের দিকে ঝোঁক বেশি। বঙ্কিমের চমৎকার রোমান্সগুলি মাসে মাসে অল্পে অল্পে বেরোতে থাকত আর কৌতূহল ঘনিয়ে তুলত ক্রমেই। বঙ্কিমের সেই উপন্যাসই বাংলা সাহিত্যের নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস কামনা করিয়া অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘ কালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।'

এই পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের কিশোর আকাঙ্ক্ষাকে লালন করেছিল। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষের সময় থেকেই বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক পত্রিকারও সূচনা হয়েছিল। এই পত্রিকা যেমন এককালে তাঁর রসের পিপাসার নিবৃত্তি করেছিল, পত্রিকাকে অবলম্বন করেই তাঁর প্রতিভারও বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করতে গেলে আধুনিক বাংলা ভাষার সাহিত্য-পত্রিকার ধারা লক্ষ্য করা দরকার। রবীন্দ্রনাথের বহু বিখ্যাত বইয়ের রচনা এই সব পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এবং বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এই যে, এক-একটি পত্রিকা রবীন্দ্র-মানসে এক-এক নতুন প্রেরণা নিয়ে এসেছে। 'ভারতী'র প্রথম যুগ গিয়েছে সাহিত্যিক শিক্ষানবিশির যুগ,—'হিতবাদী' নিয়ে এসেছে গল্পের প্রবাহ,—'সাধনা' মুক্ত করল বিচিত্রমুখী মননের দ্বার,—'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এবং 'ভাণ্ডার' সমাজ-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে,—'সবুজপত্রে' দেখা গেল রবীন্দ্র-প্রতিভার মস্ত বড়ো দিক পরিবর্তন। বর্তমান প্রসঙ্গে 'সবুজপত্রে'র পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্য-পত্রিকাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগই আমাদের আলোচ্য।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব

মুখ্যত পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার আগে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রিকায় লেখক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স তেরো।

পত্রিকার নাম 'জ্ঞানাঙ্কুর'। 'জ্ঞানাঙ্কুর' সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের মাসিকপত্র। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে রাজসাহী বোয়ালিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল; সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে (১২৮২ অগ্রহায়ণ মাসে) 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সঙ্গে 'প্রতিবিম্ব' মিলিত হয়; নাম হোলো 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে নবকলেবরে এই পত্রিকা বের করলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে একে শুধু 'জ্ঞানাঙ্কুর' বলে উল্লেখ করলেও নবপর্যায়ের সম্মিলিত পত্রিকাতেই তাঁর রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত গদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।'[১] 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'ই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ রচনা প্রথম মুদ্রিত হোলো। রচনাটির নাম 'বনফুল'। বনফুল ধারাবাহিক দীর্ঘ আখ্যান-কাব্য। এক বৎসর ধরে 'বনফুল' শেষ সর্গ পর্যন্ত বেরিয়েছিল। এর থেকে স্বভাবতই কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হলেন। বিশেষ করে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র অন্যান্য লেখকেরা মোটেই উপেক্ষণীয় ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন—এঁরা সকলেই সুপরিচিত প্রতিষ্ঠিত লেখক। চোদ্দ বৎসরের বালকের রচনা 'বনফুল' এঁদের রচনার মধ্যে সসম্মান স্থান লাভ করলো।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের রচনায় বিশেষ করেই চোখে পড়ে অনুকরণ-চেষ্টা। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের সঙ্গে বনফুলের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।[২] রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, 'ইহার সদ্য রচনাগুলি সর্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।'[৩] 'বনফুল' রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য। এর কাহিনী চতুর্ভুজ প্রেমের। শেষের দিকে হত্যাও আছে। কাহিনীর অন্যতম নায়িকা কমলা কপালকুণ্ডলার মত আরণ্য প্রতিবেশে পালিত। বৈসাদৃশ্য এই যে কমলার মধ্যে ভালোবাসার

১। জীবনস্মৃতি, 'রচনাপ্রকাশ'।

২। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (২য় সং ১৩৫৩) পৃ ৫০।

৩। জীবনস্মৃতি (১৩৬৩ মাঘ) দ্র, পৃ ২৪০ [পৃ ৭০ টীকা ৩] জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে এই উক্তি আছে, মুদ্রিত সংস্করণে নেই।

স্বাভাবিক স্ফুরণ আছে। সমস্ত কাব্যটাই ভাবালুতায় পূর্ণ। যে-কালে মধুসূদন প্রভৃতি কবিদের অনুসরণে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনাই স্বাভাবিক ছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই ভিন্ন জাতের বিষয় গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে এই দিক দিয়ে সুস্পষ্ট অভিনবত্বের উল্লেখ করেছিলেন। তবে 'যুদ্ধবর্ণনামূলক' বা দেশানুরাগের কাব্য না হলেও কাব্যে আখ্যান কল্পনা করে নেওয়াও বোধ হয় সাধারণ পদ্ধতিতেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অক্ষয় চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এও অন্যতম কারণ।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় কিছু গদ্য রচনাও রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনা দিয়েই এই গদ্যের সূত্রপাত হয়। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ একজন বি-এ পাশ কাল্পনিক সমালোচককে বাংলা সাহিত্যে অমর করে গেছেন। তাঁর উল্লেখ এই প্রসঙ্গেই। 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিণী' এই নামে একটি প্রবন্ধ ঐ পত্রিকার ১২৮৩র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বইটির সম্পর্কে কৌতুককর ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ লিখে রেখে গেছেন। অনেকেই মনে করেছিলেন কবিতা-গুলি ভুবনমোহিনী নামে কোনো মহিলার রচনা। এমন কি কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে' এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' পত্রিকায় এই নারী-কবিকে বিশেষভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর আসল লেখক ছিলেন নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৬০-১৩২৯)। দ্বিতীয় বই 'অবসর সরোজিনী'র লেখক রাজকৃষ্ণ রায়। তৃতীয় বই 'দুখসঙ্গিণী' হরিশচন্দ্র নিয়োগী রচিত। এই তিনখানা বই একসঙ্গে সমালোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনা উপলক্ষে একটি প্রবন্ধই লেখা হয়ে গেল। তাতে কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করা হোলো। যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন চোদ্দ-পনেরো বৎসরের কিশোর, তবু এই প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্যের যে লক্ষণ নির্ণয় করলেন, বলতেই হবে সমসাময়িক সাহিত্যের আদর্শে তা কিছুটা দুঃসাহসিক। 'কবিকাহিনী'র প্রকাশক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ একদিন উত্তেজিত হয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে জানালেন যে, একজন বি-এ সেই সমালোচনার উত্তর লিখছেন। চোদ্দ বৎসরের রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কৌতুকজনক এই যে, এই প্রবোধচন্দ্র ঘোষই ভুবনমোহিনী দেবীর সই করা [?] চিঠি রবীন্দ্রনাথকে এনে দেখান।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু কবিতা বেরিয়েছিল। সেই

কবিতাগুচ্ছের নাম ছিল 'প্রলাপ',—রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তার উল্লেখ করেছেন পদ্যপ্রলাপ বলে।

ভারতী

১২৮৪র শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেছেন। 'আর্যদর্শন' অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এমনি সময়ে ঠাকুর-পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অক্ষয় চৌধুরী সাহিত্যালোচনার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে যথেষ্ট অবসর মিলিত হওয়ায় 'ভারতী'র মতো সুপরিকল্পিত, সুসম্পাদিত এবং দীর্ঘজীবী পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়। 'ভারতী' এঁদেরই পারিবারিক পত্রিকা ছিল বলা চলে। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ষোলো বৎসরের রবীন্দ্রনাথও 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে আসন পেলেন।

'ভারতী' প্রকাশে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ অবশ্য ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। 'বঙ্গদর্শনে'র মতোই তিনি একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা বের করতে চেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রাণ দার্শনিক। তিনি প্রথমটায় চেয়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকেই ভালো করে গড়ে তুলতে।[৪] কিন্তু অনুজেরা ধর্মের চেয়ে সাহিত্যের জন্যেই আগ্রহ দেখালেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকার নাম প্রথমে করেছিলেন 'সুপ্রভাত'। নামটা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নি। এই নামে যেন স্পর্ধার ভাব আসে। বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত যেন তাঁরাই করলেন! দ্বিজেন্দ্রনাথই তখন এর নামকরণ করলেন 'ভারতী'।[৫] অক্ষয় চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণী বহুকাল পরে 'ভারতী'র চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে 'ভারতীর ভিটা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি এই পত্রিকার জন্ম বিবরণ দিয়েছেন। একটি হলদে রঙের বাক্স ছিল 'ভারতী'র ভাণ্ডার। প্রথমে সেই বাক্স থাকত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। পরে সেটা গচ্ছিত থাকতো মাণিকতলায় অক্ষয় চৌধুরীর কাছে। শরৎকুমারী লিখেছেন:

'সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়িতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে তাঁহাকে [অক্ষয় চৌধুরী] লইয়া ৺বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।

৪। পুরাতন প্রসঙ্গ ২য় পর্যায় পৃ ২০৫।

৫। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃ ১৫১।

'কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ৺জানকীবাবুর [জানকীনাথ ঘোষাল] রামবাগানস্থ বাটীতে যাইতাম—সেখানে ন বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ, জ্যোতিবাবু রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন।

'সকলে মিলিত হইলে ভারতীর জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের গান হইত। পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১টা বাজিয়া যাইত।......ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—'ভারতী'র সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না; 'ভারতী' ধূলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন শক্তির পরিচয় দিলেন। ধূলা ঝাড়িয়া সস্নেহে ভারতীকে কোলে তুলিয়া লইলেন।'[৬]

'ভারতী' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে সাহিত্য-সমাজে যে আন্দোলন ও তরঙ্গ উঠেছিল তা বহুদিন পর্যন্ত ছিল। এ কথা শরৎকুমারীই বলেছেন। আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার কারণ শুধুই কি পত্রিকার উৎকর্ষ? বঙ্গ-দর্শনের সাহিত্যাদর্শের পাশে 'ভারতী' একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যাতেই ভূমিকায় 'ভাবালোচনার সময় স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে' দেখবার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এই আদর্শ বস্তুত তাঁদের পরিবারেরই আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজ সংস্পর্শ বরাবরই বর্জন করে চলতেন। তাঁর প্রভাবে স্বদেশী মনোভাব পরিবারের মধ্যে খুব গভীরে প্রবেশ করেছিল। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল এবং একাল' বইয়ে দেশীয় সংস্কৃতির সমর্থন করেছিলেন। 'ভারতী' যে খানিকটা সেই মনোভাবেই অনুপ্রাণিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের যে পাঠ শেষ করেছেন, তাতে স্বাদেশিকতার ততটা উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। বিশেষতঃ উত্তররামচরিতের সাহিত্য-সমালোচনায় স্বদেশী আদর্শকে প্রামাণ্য করেন নি। শেকসপীয়র এবং কালিদাসের তুলনা করতে গিয়ে মিরাণ্ডার শ্রেষ্ঠত্বই প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। এজন্যে 'ভারতী'তে তাঁর কঠোর সমালোচনা হয়েছিল। বঙ্কিমের 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, তবে নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি'—এই মতবাদের প্রতিবাদ করে প্রবন্ধও 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল।[৭]

৬। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর গ্রন্থাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্) 'ভারতীর ভিটা'।

৭। ভারতী ১২৮৭ কার্তিক 'কাব্যের উদ্দেশ্য'।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় বঙ্কিমের কবিতাপুস্তকের বিরূপ সমালোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'ভারতী' এবং 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকগোষ্ঠীও আলাদা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কোনো কোনো অংশ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম সব ছাপেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ জোর দিয়েই বলেছেন, বঙ্কিম 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র অনুকরণে বিষবৃক্ষে একই ধরনের ছবির সমাবেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিতর্ক এখানে উল্লেখযোগ্য। ১২৮০ সালের মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে 'চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত' বলে 'ভারতভূমি' নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে সে-রচনার লেখক ছিলেন বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[৮] আসলে 'ভারতী' এবং 'বঙ্গদর্শনে'র আদর্শ রচনাপদ্ধতি এবং লেখকদল সবই পৃথক। 'বঙ্গদর্শন' ইতিহাসমূলক আলোচনায় পটু, 'ভারতী' দার্শনিক আলোচনায় পটু। কৈলাসচন্দ্র সিংহ—যিনি বঙ্কিমের ইতিহাস আলোচনাকে আক্রমণ করেছিলেন, তিনি 'ভারতী'তে পুরাতত্ত্ব আলোচনা করতেন, অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং কালীবর বেদান্তবাগীশের প্রবন্ধগুলিই প্রধানতঃ থাকতো। কবিতা লিখতেন বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয় চৌধুরী। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ কবি হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কোনো লেখা 'ভারতী'তে দেখা যায় না। নবীনচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। 'ভারতী'কে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ হলেন। কিন্তু বিহারীলাল 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লেখেন নি,—এমন কি বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মৌখিক আলাপও ছিল না।[৯] কাব্যের আদর্শ যে কত ভিন্ন ছিল, সে সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একবার হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর কেমন লাগে। হেমচন্দ্র নাকি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি পড়েন কিন্তু ভালো বুঝতে পারেন না।[১০]

আমাদের মনে হয় 'ভারতী'র এই ভিন্ন আদর্শের জন্যেই সাহিত্য সমাজে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের মধ্যে থেকেই তাঁর ভিত্তি

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয় (১৩৫০) পৃ ৭৩।

৯। বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ৩২৪-২৫।

১০। মন্মথনাথ ঘোষ, 'হেমচন্দ্র' (৩য় খণ্ড ১৩৩০) পৃঃ১১-১২।

নিলেন। 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যাতেই তিনি মেঘনাদবধের প্রতিকূল সমালোচনা করলেন। বাল্যকালে এই কাব্যটি পড়তে হোতো বলেই যে তিনি এর প্রতি বিরূপ ছিলেন, তা' হয়তো সত্য, কিন্তু এ-কথাও সত্য যে এই শ্রেণীর বস্তুনিষ্ঠ কাব্যের অনুকূল সাহিত্যিক আবহাওয়া তাঁদের পরিবারে ছিল না। এই রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল; ছিল শুধু একটি অক্ষর 'ভ', সম্ভবত ভানুসিংহের নামের আদ্যক্ষর। কোনো রকম নাম ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের রচনা 'ভারতী'তে বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে দুটি বড়ো রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—'ভিখারিণী' এবং 'করুণা'। ভিখারিণী দুই সংখ্যায় (শ্রাবণ ও ভাদ্র ১২৮০) প্রকাশিত গল্প। 'করুণা' একটি উপন্যাস—ওই বৎসরেরই আশ্বিন মাস থেকে ১২৮৫র ভাদ্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। এই দুটি লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি। 'ছেলেবেলা'তে তিনি একবার বলেছিলেন :

'দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তার মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প—সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন ক'রে খোলে নি।'

সাহিত্য হিসাবে এ সব রচনা উচ্চাঙ্গের নয়, রবীন্দ্রনাথ এদের মুছে ফেলতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের যে সব কাব্য ছাপা হয়েছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কবিকাহিনী' নামে দীর্ঘ কাব্য এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'র কবিতা। 'কবিকাহিনী' তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আগে 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' 'বনফুল' লিখলেও বই আকারে প্রথম বেরোয় 'কবিকাহিনী'। রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ থাকতেই প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বইখানা ছেপে সম্ভবতঃ ফাইল রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে বিস্মিত করে দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কবিকাহিনী'র ভাবালুতাপূর্ণ রোম্যান্টিক কাব্য দ্বিতীয়বার ছাপেন নি কিংবা কোনো রকমেই তাকে টিকিয়ে রাখতে চান নি। এই যুগের লেখা 'ভানুসিংহের পদাবলী' খুবই প্রচলিত। 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ আইরিশ মেলডীজের অনুবাদও করেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য কিছু কবিতা 'শৈশব সঙ্গীতে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'ভারতী'র দ্বিতীয় বৎসরের সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাতযাত্রার পথে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমেদাবাদে ছিলেন। সেখানকার বাদশাহী প্রাসাদই কয়েক বৎসর পরে 'ক্ষুধিত পাষাণ' রূপে দেখা দিয়েছিল। তখন বাড়িতে কেউ

নেই। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সন্তানদের নিয়ে বিলাতে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষা রপ্ত করবার জন্যে অভিধান নিয়ে টেইনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়েছেন। এই উপলক্ষে লেখা হয়েছিল অ্যাংলো-স্যাকসন ও অ্যাংলো-নর্মাণ সাহিত্য। তা ছাড়া 'বিয়াত্রীচে-দান্তে ও তাহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা', 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'ও 'ভারতী'তে বেরোয়। বিলাত থেকে ফেরবার পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রচেষ্টা আর প্রয়াস মাত্র থাকল না। তাঁর রচনা স্পষ্ট রূপ নিল এবং তারা অচলিত না থেকে প্রচলিত সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হোলো। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র (১৮৮২) কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'সেই কপিবুক যুগের চৌকাট পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসঙ্গীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলনা করব না; করব কচি আমের গুটির সঙ্গে অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি, তাই তার দাম কম। সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে।'[১১]

সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রনাথের সত্যকার সার্থক যুগের আরম্ভ। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিকে বরমাল্য দান করে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। এই বইয়ের কতকগুলি কবিতা 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল। 'ভারতী' পত্রিকাই শিক্ষানবিশির চত্বর অতিক্রম করিয়ে পৌঁছে দিল বাংলা সাহিত্যের সিংদরজায়। ইতিপূর্বে তিনি অনুকরণ করেছেন, নানা প্রভাব স্বীকার করেছেন, নিজের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন,—কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীতের আগে রবীন্দ্রনাথ নিজের lyric form খুঁজে পাননি।

১২৯০ সাল পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভারতী' সম্পাদন করেন। ১২৯১ সালের বৈশাখ থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী এর ভার নিলেন। ১৩০১ সাল থেকে স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা সরলা দেবী আর হিরণ্ময়ী দেবীর হাতে ভার গেল। তারপর আর-একবার স্বর্ণকুমারী সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন। 'ভারতী' দীর্ঘকাল চলেছিল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও যোগ বরাবরই ছিল। 'লিপিকা'র অনেকগুলি রচনা 'ভারতী'তেই বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার 'ভারতী'র সম্পাদকও হয়েছিলেন। 'সাধনা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৩০৫ সালে এক বৎসরের জন্যে তিনি যখন এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করলেন, সাহিত্যিকরূপে তিনি তখন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁর

১১। রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' সূচনা।

লেখক জীবনেও এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই সময়ে গদ্য রচনার দিকেই তিনি মূলতঃ মনোনিবেশ করেছেন। 'সাধনা'র ধারা অনুসরণ করে এই সময় তিনি 'ভারতী'তে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এ ছাড়া 'গ্রাম্য-সাহিত্য' প্রবন্ধ লিখেও এই দিকে তিনি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি ফেরালেন। ভারতীর সম্পাদনাভার ত্যাগ করলে 'সাহিত্য' পত্রিকা লিখেছিলেন :

'এই সংখ্যা সম্পাদন করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলেন। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণে' তিনি যথেষ্ট বিনয় সহকারে ইহার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। রবীন্দ্রবাবুর মতে, 'আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্র সম্পাদন হোলো গরুর দুধ দেওয়ার মত' !···তিনি lyric কবি—তাঁহার lyrical effort এ তিনি ভারতীর জন্য যাহা করিয়াছেন এই বিদায়ের ক্ষণে তাহাই একটি লিরিকের মত বোধ হইতেছে।'[১২]

বালক

ঠাকুর-পরিবার থেকেই ১২৯২ সালে প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকা। বাড়ির ছেলেদের জন্যেই বিশেষ করে এই পত্রিকার সৃষ্টি। সম্পাদিকা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। এক বৎসর চলে 'বালক' 'ভারতী'র সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় এবং নাম হয় 'ভারতী ও বালক'। 'বালক'কে শেষ পর্যন্ত বালকদের উপযোগী রাখা যায়নি বলেই 'ভারতী'র পাশে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখা অনাবশ্যক হয়েছিল।

'বালকে'র প্রধান লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। কেবল বালকদের রচনায় পত্রিকা চলতে পারে না। ফলে প্রথম সংখ্যাতেই (১২৯২ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত রচনার সংখ্যা ছিল পাঁচ। উদ্দেশ্য অনুযায়ী রচনাগুলি বিশেষ এক ধরনেরই হোলো। 'বালকে'ই প্রকাশিত হয়েছিল 'মুকুট' আর 'রাজর্ষি'। তা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'চিরঞ্জীবেষু' এবং 'শ্রীচরণেষু' নামে পত্রালাপ যেগুলি পরে 'সমাজ'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই পত্রধারায় নবীনকিশোরের উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে সুস্পষ্টরূপে প্রথম পাওয়া গেল। সেইজন্যে শুধু বালকদের কাছে নয়, রবিন্দ্রসাহিত্যের সব পাঠকের কাছেই এরা মূল্যবান। 'বালকে' তিনি দুটি নতুন জিনিস লিখেছিলেন, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনার সূত্রপাত হয় এই সময় থেকেই। এই রচনার সম্বন্ধেই

১২। সাহিত্য, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৩০৬) পৃ ৬৮।

তিনি পরে বলেছিলেন এদের মূল্য বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সূত্রে দিয়ে বিচার করলে হয়তো 'ভারতী' পত্রিকাতেই এর আরম্ভ লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে গেলে তারা ঠিক প্রদীপ জ্বালানো নয়, সলতে পাকানো। 'সরোজিনী প্রয়াণ' ভারতীতে (১২৯১) বেরিয়েছিল এবং ওই একটাই প্রবন্ধ বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছোটানাগপুর, রুদ্ধগৃহ, পথপ্রান্তে, এবং লাইব্রেরী—এই চারিটিই বালকে প্রকাশিত। অবশিষ্ট সবই বঙ্গদর্শনে। সুতরাং এই নতুন রীতির গদ্য-প্রবন্ধের প্রবর্তনের গৌরব বালক পত্রিকার।

বালকদের কৌতূহল জাগাতে পারে এ রকম আর একটি নাট্যরীতির প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ এতে করেছিলেন। ইংরেজিতে 'শারাড' নামে এক রকমের খেলার অনুকরণে তিনি হেঁয়ালি নাট্টের সূত্রপাত করেন। এই একাঙ্ক নাটকের এক একটি দৃশ্যে এমন শব্দের ব্যবহার থাকবে যেগুলি মিলিয়ে নতুন শব্দের সৃষ্টি হয় এবং সেই শব্দগুলিই নাটকের বিষয় নির্দেশ করবে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল বালকদের মধ্যে কৌতূহল, দৃষ্টিক্ষমতা এবং আনন্দ জোগানো। তাদের উপযোগী ছোট ছোট গল্প ইতিহাসের ঘটনা প্রভৃতিও তিনি এতে লিখতেন। এই সব টুকরো রচনা এখনও সংগৃহীত হয়নি। এদের মধ্যে আকবর শাহের উদারতা (১২৯২ আষাঢ়) শিখ স্বাধীনতা (১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কৌতূহলের জন্যেই উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদানন্দিনী 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা থাকলেও রবীন্দ্রনাথই আসলে এর সব কাজ চালাতেন। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বন্ধু শ্রীশ মজুমদারকে লিখেছিলেন 'এতদিন মাথার উপরে কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হয়ে ছিল, নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল—এখন সমস্ত খোলোসা—দক্ষিণে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা যেন চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।'[১৩]

হিতবাদী

'বালক' এক বছর চলে 'ভারতী'র সঙ্গে মিশে যায়। এর পর আর চার বৎসর রবীন্দ্রনাথকে আর কোনো নতুন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখি না। এর মধ্যে রাজা ও রাণী, বিসর্জন এবং মানসীর কবিতাগুলি রচিত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করলেন।

১৩। ছিন্নপত্র, ১৭ই এপ্রিল ১৮৮৬।

বিলাতে তিনি প্রায় এক মাস ছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর 'মানসী' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময়েই জমিদারী দেখাশোনার ভার দেবেন্দ্রনাথ দিলেন রবীন্দ্রনাথের উপর। এটাই ছিল পদ্মাবক্ষে ভ্রমণের যুগ। ছিন্নপত্রের পত্রগুলি এবং সেই সঙ্গে গল্পগুচ্ছের গল্প রচনার নতুন অধ্যায় আরম্ভ হোলো রবীন্দ্র-কবিজীবনে।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয় 'হিতবাদী'।[১৪] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এর যোগ মাস তিনেকের। দু' একটি প্রবন্ধ ছাড়া আর যা লিখলেন সবই গল্প। 'হিতবাদী' ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। সাপ্তাহিক হলেও সংবাদ পরিবেশনই এর মূল লক্ষ্য ছিল না। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল যথার্থ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা। ১৮৯১র প্রথম দিকে 'হিতবাদী' প্রচারের জন্যে একসঙ্গে চাঁদা তুলে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। নবীনচন্দ্র বড়াল এবং প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রত্যেকে পাঁচশ টাকা দিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল, প্রভৃতি পনের জন প্রত্যেকে আড়াই শ' টাকা এবং আর কয়েকজন একশ টাকা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশ মজুমদারকে চিঠিতে লিখেছেন :

'আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটি বড় রকমের কোম্পানী খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫০০০ টাকা মূলধন। ২৫০৲ করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক সম্পাদক করা হয়েছে। বঙ্কিম রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লেখক যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।"[১৫]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন :

'সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্রবাবুর সৃষ্টি এবং হিতং মনোহারি চ দুর্লভং রচঃ এই mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। 'হিতবাদী'র জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও motto পরিগৃহীত হয়।

১৪। হিতবাদীর ফাইল পাওয়া যায় না। এই পত্রিকা সম্পর্কিত তথ্য মূলতঃ রবীন্দ্রজীবনী থেকে সংগৃহীত।

১৫। রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড (২য় সং) পৃ ২২৭-২৮।

সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই।'[১৬]

রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'তে লিখেছিলেন ছয় সপ্তাহ। 'বেঙ্গলী' পত্রের সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহ কাল লিখিয়াছিলাম।'[১৭] 'হিতাবাদী'তে প্রকাশিত ছয়টি গল্প হচ্ছে দেনাপাওনা, গিন্নী, পোষ্টমাষ্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, ব্যবধান এবং রামকানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতা। 'খাতা' গল্পটিও 'হিতবাদী'তে বেরিয়েছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন।[১৮] 'হিতবাদী' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের একটা নূতন দ্বার খুলে দিল। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গল্প লিখেছিলেন—ভিখারিণী (ভারতী ১২৮৪), ঘাটের কথা (ভারতী কার্তিক ১২৯১), রাজপথের কথা (নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১)। প্রথমটিকে তিনি সার্থক গল্প মনে করেন নি। অন্য দুটিকেও ঠিক ছোটোগল্পের মধ্যে ধরা চলে কি না সেবিষয়ে সংশয় আছে। তৃতীয় গল্পটি তো 'রাজপথ' নামে 'বিচিত্র প্রবন্ধে' সংকলিত হয়েছিল। 'হিতবাদীতে' গল্প রচনার যে প্রেরণা ছিল, আরও কিছুকাল সেই প্রেরণা অব্যাহত ছিল। আরব্ধ গল্পধারা তাই পরের যুগেও চলে এসেছে। জমিদারীর কাজ দেখার উপলক্ষে পল্লীগ্রামের সমাজ-জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন। 'ছিন্নপত্রে' তার খণ্ডচিত্র ছড়িয়ে আছে। এই উপাদান কল্পনায় দানা বেঁধে গল্পরূপে দেখা দিল। পোষ্টমাষ্টারের উল্লেখ ছিন্নপত্রে পাই।[১৯] 'গিন্নী' গল্পে অবশ্য ছিল বাল্যকালের স্মৃতি। অন্যান্য গল্পগুলিতে পল্লীজীবন এবং পল্লীমানুষের ছবিই নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বলা যায় 'বালক' পত্রিকা যেমন রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক গদ্যরীতির সূত্রপাত করেছিল, 'হিতবাদী' তেমনি তাঁর আর-

১৬। পুরাতন প্রসঙ্গ প্রথম পর্যায় পৃ ৭৬।

১৭। আত্মপরিচয় (১৩৫২) পৃ ১২৫।

১৮। প্রমথনাথ বিশী,'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প', পুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জী পৃ ২৩-২৪।

১৯। ছিন্নপত্র ২৯ জুন ১৮৯২।

এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ছোটোগল্পের প্রবাহকে মুক্ত করে দেয়। 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের গল্প ছাড়াও কয়েকটি প্রবন্ধও বেরিয়েছিল।

কিন্তু 'হিতবাদী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক শীঘ্রই শেষ হয়। এত শীঘ্র কেন শেষ হয়, তার উত্তর দেওয়া কঠিন। কর্মকর্তাদের ইচ্ছা ছিল গল্পগুলি আরও লঘুভাবে লেখা হবে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মত হয়ে পত্রিকা ছেড়ে দিলেন। রচনা সম্পর্কে যোগ না থাকলেও প্রায় বারো বছর পর ১৩১১ সালে 'হিতবাদী'র উপহার' সিরিজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থাবলী এখান থেকেই বের করেছিলেন।

সাধনা

'সাধনা'তে রবীন্দ্রপ্রতিভার আরো বিচিত্র দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই যুগে গদ্যরচনার দিকেই তিনি ব্যাপক ভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু কাব্যরচনার মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন এবং পরিণতি এল এবং এই উভয় দিকেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমতার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটল। কল্পনা এবং মিলন, বাস্তব-চেতনা এবং অবাস্তব সৌন্দর্যোপলব্ধির বৈশিষ্ট্যই 'সাধনা'র যুগের সাহিত্যের বড়ো লক্ষণ। অজিত চক্রবর্তী লিখেছেন:

'সাধনাতেই প্রথম পঞ্চভূতের ডায়ারি, গল্প, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেক গদ্য রচনা বাহির হয়। ইহার কারণ সর্বাঙ্গীন মানসোৎ-কর্ষের একটা ক্ষুধা পূর্বে এমন করিয়া জাগে নাই—দেশ বিদেশের সকল প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার প্রবাহের সঙ্গে নিজের যোগ রক্ষণ করিবার কোনো তাগিদই কবির মনে পূর্বে ছিল না।'[২০]

'সাধনা' প্রকাশিত হয়েছিল ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগেই। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর সম্পাদক। প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৯৮। তিন বৎসর সম্পাদন করে রবীন্দ্রনাথের উপরেই তিনি পত্রিকা চালাবার ভার ছেড়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। 'সাধনা' পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকেই লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে থাকিত।'[২১]

২০। অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫৩) পৃ ৩৮-৩৯।

২১। আত্মপরিচয় (১৩৫২) পৃ ১২৪।

শিলাইদহ সাজাদপুরে জমিদারীর কাজে রবীন্দ্রনাথ এই সময় পদ্মায় কাটাচ্ছেন। এই একই পটভূমিতে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির কবিতা এবং ছোটোগল্প। কাব্য এবং গল্পের যোগ ঘটিয়েছে ছিন্নপত্র—ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ছিন্নপত্রে এবং পরবর্তী কালে বহুবারই রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, গল্পগুচ্ছের গল্পেই রোম্যান্সের অবাস্তব জগৎ থেকে ঘরোয়া বাস্তবের জগতে বাঙালী পাঠক নেমে এসেছে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ছত্রিশ। নিজের সম্পাদিত 'সাধনাতে'ই পাঁচটি। ছিন্নপত্রে তিনি বলেছেন :

'বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একটা গল্প লিখছি খুব একটা আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি আর বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে সকল দৃশ্য-লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারিদিকে এই রৌদ্র বৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন এই বর্ষার আকাশ এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে।'[২২]

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী দেখিয়েছেন, সাময়িক পত্রের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে গল্প লিখেছেন। 'সাধনা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে তাগিদও ফুরিয়ে গেল। তার বদলে পাওয়া গেল চৈতালি, মালিনী এবং কাহিনী। যতদিন সাময়িক পত্র ছিল, ততদিন গল্প ছিল। সাময়িক পত্র না থাকলে প্রেরণা ভাষা পেল কাহিনীমূলক কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতী (১৩০৫) এবং বঙ্গদর্শনের গল্প রচনার মূলেও একই রহস্য। এই 'সাধনা'তেই সোনার তরীর কবিতাগুলি প্রায় সবই বেরিয়েছিল। ছোটোগল্প রচনার বাস্তবানুভূতির যুগেই আবার দেখি সূর্যালোকিত জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন এই পৃথিবীরই নির্বস্তুক সৌন্দর্যের অভিসার। সোনার তরীর নিরুদ্দেশ যাত্রা এই সৌন্দর্য-সাগরেই তরী বাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের মানসশক্তির তীক্ষ্ণতা ও ঔৎসুক্য সত্যই বিস্ময়কর। যে সময়ে তিনি পদ্মাবক্ষে এই সব গল্প কবিতা রচনা করেছেন, সেই সময়েই তিনি বিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ রচনায় নিমগ্ন। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি এখনও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল বলে গণ্য। বহুকাল পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি। তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে

২২। ছিন্নপত্র ২৮ জুন ১৮৯৫।

গবর্ণমেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না।'[২৩] সেকালের এই আবেদন নিবেদনের যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বললেন দেশের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ সাধনের কথা এবং পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করা। এই যুগের রচনা 'রাজা ও প্রজা'র প্রবন্ধগুলি। সেগুলি বেরিয়েছিল 'সাধনা'য়। এই বইয়ের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০) 'সাধনার' যুগের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ। 'সাধনা'তে রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনার যে সূত্রপাত হয়, বঙ্গদর্শন ভাণ্ডারে তার ধারা অব্যাহত ছিল না। সাধনার যুগের প্রবন্ধের পশ্চাতে সে রকম কোনো জাতীয় উদ্দীপ্ত ছিল না, তবু যে মনুষ্যত্ব বোধের উপর তিনি জোর দিয়েছেন পরের যুগের পটভূমি ভিন্ন হলেও সেই মূল আদর্শটি অটুট ছিল।

'সাধনা'র যুগের নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার মূল কারণ জাতির সম্পর্কে জীবন্ত কৌতূহল ও সহমর্মিতা। কাব্য ও গল্পের অনুপ্রেরণায় ছিল যে পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীসমাজের অভিজ্ঞতা, এই প্রবন্ধের মূলেও সেটাই ছিল—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। গ্রাম-জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিচয় তিনি পেলেন—তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের ধর্ম, তাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি। এই সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বিচিত্র দিকে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জেগে উঠল। শিক্ষার আলো কেমন করে এই দৃষ্টিহীন সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া যায়—এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়েও ভাবতে থাকেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' সাধনায় (১২৯৯ পৌষ) প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশের তিনজন শিক্ষাবিদ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আনন্দমোহন বসু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ঐকান্তিক মতৈক্যও জানান। 'বঙ্গদর্শনে' এবং 'ভাণ্ডারে'ও এ বিষয়ে তিনি আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। আর একটি বিষয়ে 'সাধনা'র বৈশিষ্ট্য ছিল লোকসাহিত্যের আলোচনা। 'ছেলেভুলানো ছড়া' 'মেয়েলি ছড়া' নামে ১৩০১ আশ্বিন কার্তিকের 'সাধনা'য় বেরিয়েছিল। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সেটাই প্রথম। অবশ্য 'বাউল গান' নামে একটি প্রবন্ধ বহু পূর্বে 'ভারতী'তে (বৈশাখ ১২৯০) বেরিয়েছিল। এই প্রবন্ধটিকে কিন্তু ঠিক লোকসাহিত্যের আলোচনা বলা যায় না। সাধনার সাহিত্য সমালোচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্রালাপে তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত হয়। এক বৎসরের মধ্যে

২৩। কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'।

কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবি ও গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেগুলি সংকলিত হয়েছে 'আধুনিক সাহিত্যে'। বাংলা শব্দতত্ত্ব এবং ছন্দের আলোচনাও দেখা গেল। অবশ্য শব্দতত্ত্বে তাঁর উৎসাহ বহু কালের। 'বালকে'র তিনটি প্রবন্ধ সংজ্ঞাবিচার (১২৯২ ফাল্গুন) বাংলা উচ্চারণ (১২৯২ আশ্বিন) একটি প্রশ্ন (১২৯২ অগ্রহায়ণ) এর দৃষ্টান্ত। সাধনার আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি 'পঞ্চভূত'।

মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের জন্যেই 'সাধনা' এমন বৈচিত্র্যে এবং ঐশ্বর্যসম্ভারে পূর্ণ হয়েছিল। অবশেষে ১৩০১ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেন। তারপর এক বৎসর চলে সাধনা বন্ধ হয়ে গেল। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন— 'পত্রিকা বন্ধ হইবার সাহিত্যিক বা আধ্যাত্মিক কারণ যাহাই থাকুক, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। সাধনা চালাইবার ব্যয়ভার ক্রমেই একা তাঁহার উপর আসিয়া পড়িতেছিল।'[২৪] 'সাধনা' তখন যে কতখানি সমাদৃত হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ আছে 'সাহিত্য' পত্রিকায়:

'সহসা সাধনার বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তথাপি মনে হয় বাঙালী পাঠকের সহানুভূতি পাইলে সাধনা বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে সাধনার মত উচ্চশ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায় সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।'[২৫]

অতঃপর ১৩০৫ সালে এক বৎসরের জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীর' সম্পাদক হলেন।

বঙ্গদর্শন

সাধনার যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রতীভা সম্পূর্ণ হল। রবীন্দ্রপ্রতিভা যে কত বিচিত্রগামিনী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। মূলত সাধনাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের যুগই বলা যায়। অজিত চক্রবর্তীর কথায় 'যথার্থই সেটা একটা সাধনার কাল ছিল'।

বঙ্গদর্শনে কবিজীবন একটু মোড় ফিরল। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের একটু ইতিহাস আছে। ১২৯০ সালে কার্তিক মাসে সঞ্জীবচন্দ্রের হাত থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গদর্শনে'র ভার নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রই এই হস্তান্তরের মূলে ছিলেন। সম্পাদক হবার

২৪। রবীন্দ্র-জীবনী প্রথম খণ্ড (২য় সং) পৃ ৩২২।

২৫। সাহিত্য ৬ বর্ষ, ৭ সংখ্যা (১৩০২) 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'।

কথা ছিল চন্দ্রনাথ বসুর। কিন্তু শ্রীশ মজুমদার বাংলার বাইরে চলে যান, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের উদ্যোগ সম্পূর্ণ হয় নি। তাঁর হাতেই যে বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট পত্রিকাখানি লুপ্ত হল, এ ক্ষোভ তাঁর বহুকাল ছিল। ১৩০৮ ইংরেজি ১৯০১এ অনুজ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হাতে বঙ্গদর্শনের পরিচালন ভার দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করাতে স্বীকার করালেন। 'বঙ্গদর্শনে'র পত্র-সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন, তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য :

'সম্পাদক একথা ভুলিতে পারিবেন না যে বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন—সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ এবং কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।......

'অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ সুলেখক আছেন বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাতিক সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য এবং বাঙালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে ভাবের পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে।......

'সংকীর্ণ ধারার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য সুস্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবল স্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র, রুচি বিচিত্র। এখন লেখক পাঠকের মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছে।

'অতএব এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। এমন কি এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপাত্র হইবার আশাও করিতে পারিবে না। এই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের ন্যায় সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া লেখকদিগকে নিজের প্রতিভাবন্ধনে বাঁধিবার স্পর্দ্ধা রাখেন না। এখন বঙ্গসাহিত্য অতিদূরবিস্তৃত। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানা শক্তির দ্বারা নানা পথে আকৃষ্ট হইতেছিল। কালের

বিরাট কণ্ঠস্বর নানা ক্ষুদ্র কোলাহলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি বঙ্গদর্শন এই সকল সাময়িক কলকোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।'[২৬]

আদি-'বঙ্গদর্শনে'র সঙ্গে নবপর্যায়-'বঙ্গদর্শনে'র তুলনা সার্থক। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে লেখক সংখ্যাও কম ছিল, মত-বৈচিত্র্যও এত ছিল না। নবপর্যায়ের সময় দেশে রাজনৈতিক চেতনা নতুন রূপ নিয়েছে, সমাজচিন্তাও নতুন দিকে ফিরেছে। সাহিত্যের মধ্যে নানা প্রকাশরীতি দেখা দিয়েছে; নবীন বাঙালীর অনুসন্ধিৎসাও বেড়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, চিন্তা এখন শাস্ত্র বা পুঁথির থিয়োরেটিক্যাল আলোচনায় বদ্ধ না থেকে জীবনের মধ্যে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে। 'সাধনা'তে যেমন অন্য লেখাগুলির ওপর রবীন্দ্রনাথের 'ভূরিপরিমাণ' পরিমার্জনা থাকত, সম্ভবত 'বঙ্গদর্শনে' তার প্রয়োজন হোতো না। কারণ, এই পত্রিকার লেখকেরা সকলেই নিজের নিজের দিক দিয়ে বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জগদানন্দ রায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এঁরা সকলেই কোনো-না-কোনো দিকের আলোচনায় বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন। এই বিভিন্নমুখী চিন্তাধারাকে মিলিত করে 'বঙ্গদর্শন' যথার্থই বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল। সে সময় অবশ্য 'সাহিত্য' 'নব্যভারত' 'জন্মভূমি' প্রভৃতি কতকগুলি ভালো ভালো কাগজ ছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের মতো কেউই পরিবর্তমান যুগের জিজ্ঞাসাকে রূপ দিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের মতো মুক্ত সচেতন জিজ্ঞাসু মনীষী সম্পাদকের পক্ষেই যুগের সঙ্গে এমন নিবিড় সহযোগিতা করা সম্ভব হয়েছিল।

'সাধনা'তে যে রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল,'বঙ্গদর্শনে' সেটী একটি সুস্পষ্ট আদর্শ স্থির করে নিয়েছিল। 'ভারতবর্ষ' এবং 'আত্মশক্তি'র প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে'ই লিখলেন। বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তুলবার জন্য স্বদেশের ঐতিহ্যের স্বরূপ খোঁজ করতে গিয়েই এই আলোচনা এল। আমাদের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে বিশেষ ঔৎসুক্য এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধ এই রচনাগুলিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ আলাদা করে সম্পাদকীয় লিখতেন না কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র কবিতা এবং প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম এবং সংস্কৃতি নিয়ে

২৬। বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখ পৃ ৩-৪।

প্রবন্ধ লিখেছেন। স্বভাবতই এই সময়ে জাতীয়তার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হতে লাগল এবং রবীন্দ্রনাথ একটি খুব বড়ো চিন্তাকে জাগিয়ে দিলেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ভারতবর্ষ বিশেষ ভাবেই সমাজাশ্রয়ী দেশ। প্রাচীনকালে রাজা যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক কার্যে ব্যাপৃত থাকলেও সমাজের যে স্বাধীনতা ছিল, রাজাকেও সেটা মেনে চলতেই হোতো। এই অর্থে রাষ্ট্র এবং সমাজ আলাদা ছিল না। আধুনিক যুগে হয়েছে আলাদা। ফলে, সমাজকে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সমাজকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠবার জন্যে আহ্বান করলেন। এই আত্মশক্তির সাহায্যেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এই চিন্তার সঙ্গেই যুক্ত ছিল স্বাদেশিকতার স্বরূপ-নির্ধারণ চেষ্টা। মোটামুটি এই ধরনের স্বাদেশিক চিন্তায় নবপর্যায়-'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ সে জন্যে চেয়েছিলেন এই চিন্তাকেই সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে।

বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার দিক থেকেও বঙ্গদর্শনের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দান আছে। এই যুগের বিশিষ্ট প্রেরণা থেকে দেখা দিল নৈবেদ্যের সনেট। ধর্মভাবনার দিকেও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখা গেল এই সময় থেকে। পরে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হলে সেখানেও এর অনুবৃত্তি চলেছে। স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা স্মরণের কবিতাও বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল। এই পত্রিকার দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে উপন্যাস আর সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার পরলোকগত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুরোধে বঙ্গদর্শন পত্র পুনরুজ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদনাভার গ্রহণ করি। এই উপলক্ষে বড় উপন্যাস লেখায় প্রবৃত্ত হই। তরুণ বয়সে 'ভারতী'তে বৌঠাকুরাণীর হাট লিখিয়াছিলাম ইহাই আমার প্রথম বড় গল্প।'[২৭] 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৩০৮-৯) থেকে বাংলা উপন্যাসের দিক্ পরিবর্তন হল—এ কথা সর্বজনবিদিত। 'চোখের বালিকে'ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা হয়। 'বঙ্গদর্শনে'র সাহিত্য সমালোচনা অবশ্য 'সাধনা'র সমালোচনা-ধারারই জের হলেও এখানেও শক্তি আর এক রূপে দেখা দিল। 'সাধনায়' আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করেছিলেন, এখানে করলেন প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা। তা' ছাড়া সাহিত্যের কতকগুলি মূলতত্ত্ব আলোচনা করেও রসের এক ধ্রুব আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সাহিত্য যে ব্যক্তিমনের প্রকাশ—মূলত এই মতবাদের

২৭। আত্মপরিচয় (১৩৫২) পৃ ১২৫-২৬।

উপর ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বালোচনা প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সৃষ্টির যে ব্যক্তিগত প্রেরণার ব্যাখ্যা করেছিলেন 'বঙ্গভাষার লেখক'-এর (১৩১১) মধ্যে সংরক্ষিত তাঁর আত্মপরিচয়ে, দ্বিজেন্দ্রলাল তার প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৩১৪-র মাঘের 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরও দিয়েছিলেন—তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক নন। এখানে স্মরণযোগ্য, অজিত চক্রবর্তী, ১৩১৮তে 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, কবিমানসের ব্যক্তিগত প্রেরণার প্রতিপাদনে।

ভাণ্ডার

১৩১২ সালে রবীন্দ্রনাথ একসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ভাণ্ডার' সম্পাদন করছিলেন। সেই বৎসর শেষ করে বঙ্গদর্শনের ভার ছেড়ে দিলেন এবং শুধু 'ভাণ্ডার' পত্রিকা নিয়েই থাকলেন। 'ভাণ্ডারে'র প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত; প্রকাশিত হোলো 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট থেকে। ১৩১৩র জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে প্রমথ চৌধুরী এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

নিছক সাহিত্যের দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন কিছু 'ভাণ্ডারে' দিয়েছিলেন, তা' বলা যায় না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বৎসর 'ভাণ্ডার' প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিপূর্বেই দেখেছি 'সাধনা'র যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। 'ভাণ্ডারে' তিনি পুরোপুরি সেই দিকেই মনোনিবেশ করলেন। অবশ্য কথাটা বিশেষ অর্থেই গ্রাহ্য।

ইংরেজ-নিরপেক্ষভাবে গঠনমূলক কাজ এবং আত্মবোধের উদ্বোধনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ১৯০৫এর ১৬ই অক্টোবর (১৩১২, ৩০ আশ্বিন) বঙ্গচ্ছেদ হোলো! রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করবার জন্য জনতার মধ্যে নেমে এলেন। বিদেশী বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথাই তিনি বললেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপের আলোচনা অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; তবে 'ভাণ্ডারে'ও তিনি সে সময়ের বিশিষ্ট মনীষীদের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শনে'র মতোই। এই পত্রিকাটি যে সাময়িক প্রয়োজনকে ভাষা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আকারে পত্রিকাটি ছিল ক্ষুদ্র। স্বদেশী আন্দোলন, শিক্ষা সংগঠন সম্পর্কে সম্পাদকের এবং অন্যান্যের প্রবন্ধ থাকত। 'সঞ্চয়' নামে একটি আলাদা বিভাগ ছিল, তাতে অন্য পত্রিকা থেকে সংকলন থাকত। 'ভাণ্ডারে' রবীন্দ্রনাথ আর একটি

অভিনবত্ব করেছিলেন! এক সংখ্যায় কোনো একটি প্রশ্নের অবতারণা থাকত। পরবর্তী সংখ্যায় তার উত্তর বা আলোচনা করতেন বিভিন্ন ব্যক্তি। প্রশ্ন সাধারণত দেশ, জাতি, সমাজ, বিশেষ করে উপস্থিত সমস্যা নিয়েই করা হোতো।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করার পরের মাসেই (১৩১২, অগ্রহায়ণ) 'ভাণ্ডারের' একটি বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল, তাতে শুধু তিনটি বিষয় ছিল—১] ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ; ২] বিবরণ [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের]; ৩] বক্তৃতা। প্রকাশক কেদারনাথ দাশগুপ্ত নিবেদনে বলেছেন:

'শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা দেশে আজ যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকায় প্রদত্ত হইল।'

'কার্লাইল-সার্কুলার' প্রকাশিত হইবার পর হইতে গতকল্য (২৫শে অগ্রহায়ণ) পর্যন্ত বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে যে সকল সভা-সমিতি হইয়াছে প্রথম অংশে তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা গেল। দ্বিতীয় অংশে মিঃ রসুল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রভৃতির এক একটি বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট হইল। শিক্ষাসমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যে 'প্রভিসনাল কমিটি' গঠিত হইয়াছিল তাহার রিপোর্টও পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।'

এর থেকেই বুঝতে পারা যাবে 'ভাণ্ডার' পত্রিকাটি প্রায় পুরোপুরি সাময়িক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের অনেকগুলি গান এতে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-কথা বলাই বাহুল্য দেশের জনচিত্তকে স্পর্শ করিতে পারবেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সারি, বাউল এবং কীর্তনের সুরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৩১২ র 'বঙ্গদর্শনে'ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর অনেক গান লিখেছিলেন।

এই জাতি-সচেতনতার যুগে জাপানের জাতিগঠন সম্পর্কে দেশে যে ঔৎসুক্য দেখা গিয়েছিল, 'ভাণ্ডারে'ও তার চিহ্ন আছে। জাপানের বাণিজ্যক্ষেত্র (সুবোধচন্দ্র মজুমদার ১৩১২, মাঘ), ওকাকুরার জাপানের জাগরণ (অজিতকুমার চক্রবর্তী ১৩১৩, বৈশাখ) প্রভৃতি প্রবন্ধ তার দৃষ্টান্ত। ১৩১২ র আষাঢ় সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ ছিল 'জাপানের প্রতি'। রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি জাপানী ছন্দকেও বাংলায় আনবার চেষ্টা করেন। সেদোকা, চোকো, ইমায়ো ছন্দের অনুবাদ ঐ একই সংখ্যায় দেখা গেল।

রবীন্দ্রনাথ তিন বৎসর (১৩১২-১৪) 'ভাণ্ডার' সম্পাদনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে 'ভাণ্ডার'ই একমাত্র পত্রিকা নিছক সাময়িক কারণে যার উদ্ভব এবং বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধিতেই যার সার্থকতা। সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গেই প্রত্যক্ষত তিনি যুক্ত থেকেছেন যদিও শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষীরূপে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্য রকমের চিন্তাকে প্রকাশ করতে কোনো কালেই তাঁর দ্বিধা ছিল না। 'সাধনা'য় যার সূত্রপাত 'বঙ্গদর্শনে'র মধ্য দিয়ে 'ভাণ্ডারে' তার পূর্ণ পরিণতি ঘটল। এর পর তিনি এই পথ বর্জন করলেন। ঠিক 'ভাণ্ডারে' না হলেও 'বঙ্গদর্শন' থেকে রবীন্দ্রনাথের মানসিক দিক্ পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল—'ভাণ্ডারে'র পর 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনায় তার সম্পূর্ণতা। কাব্যের ক্ষেত্রে এল গীতাঞ্জলির যুগ।

তত্ত্ববোধিনী

'বঙ্গদর্শনে'র কোনো কোনো প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। মাঝখানে 'ভাণ্ডার' সম্পাদনার সময় কিছুকালের জন্য তাঁর মনোযোগ গিয়েছিল অন্যদিকে। ১৩১৮র বৈশাখ মাস থেকে 'তত্ত্ববোধিনী'র ভার গ্রহণ করে তিনি আবার ঔৎসুক্যকে ফিরিয়ে নিয়ে সংহত করলেন ধর্মচিন্তায়। 'ভাণ্ডার' যেমন বিশেষ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের পত্রিকা, 'তত্ত্ববোধিনী' তেমনি ধর্মালোচনার পত্রিকা। তবে ধর্ম রবীন্দ্রনাথের মনীষাক্ষেত্রে সংকীর্ণ প্রয়োজনের বিষয় নয়। তাঁর মূল জীবনদর্শন যা তাঁর সাহিত্য ও জীবনচর্যাকে প্রভাবিত করেছে, তাঁর ধর্মচিন্তাও তাই দিয়ে গঠিত। 'বঙ্গদর্শন' 'ভাণ্ডারের' যুগে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিক চিন্তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম সন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী'র ধর্মালোচনা আসলে তারই পরিণাম। ধর্ম বিষয়ের সেই সব প্রবন্ধ 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়ে' সংকলিত।

আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্যশিল্পের সঙ্গে এগুলির যোগ তেমন নেই মনে হলেও এই রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে মনীষী রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তো মনীষাবিচ্ছিন্ন নয়। তাঁর কাব্যের পিছনে রয়েছে যে অখণ্ড জীবনানুভূতি কিংবা চিরাগত ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণাবেগ, 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়ের' রচনার মধ্যে তারই প্রকাশ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রমত্ত পরিবেশ ত্যাগ করে তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আত্মনিয়োগ করলেন। রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বান্তর সূচিত করে আর একটি পত্রিকা। 'তত্ত্ববোধিনী'কে তিনি

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্র করে তুলতে চেয়েছিলেন, এজন্য তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার নিন্দাভাজনও হয়েছিলেন। এই পত্রিকাতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি চেয়েছিলেন আদি-ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্গঠিত করতে। যাঁদের সহায়তায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালিত হয়, তাঁদের অন্যতম ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বারের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। সেই উপলক্ষে লেখা 'পথের সঞ্চয়'। এই প্রবন্ধগুলি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বেরিয়েছিল। 'পথের সঞ্চয়ে' তিনি এক উদার মানবলোকের দিকে যাত্রা করেছেন—য়ুরোপ-যাত্রাকে তিনি বলেছেন তীর্থযাত্রা। জাতীয় আন্দোলনের গণ্ডী পেরিয়ে এবার তিনি বিশ্বমানবের উৎসবক্ষেত্রে আসন নিলেন। 'সবুজপত্রে' সূত্রপাত হল রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্য এবং মুক্ত মননের। তাই 'তত্ত্ববোধিনী' পর্বে এসে সমাপ্ত হল রবীন্দ্রজীবনের এক পর্যায়।

সবুজপত্র, কল্লোল : রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের আধুনিক, নবীনের দূত, তারুণ্যের বাণীমূর্তি। দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্য-জীবনে বারবার রবীন্দ্রনাথের কাছে নবীনের, তরুণের আহ্বান এসে পৌঁচেছে, তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন, কখনো প্রাচীনের, রক্ষণশীলের, পিছু টানের দলে যোগ দেন নি। 'ফাল্গুনী' নাটিকার মর্মকথা কবির জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই নাটিকার যে নব যৌবনের দল, তা কবির নিজস্ব দল ও এদের নেতা জীবন-সর্দার, সে-তো স্বয়ং কবি। জগতের চিরকালের যে-বুড়োটা যৌবন-উৎসবের আলো ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে অন্ধকার করে দেয়, তাকে বন্দী করে এনে বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলবার নেশায় নবীন যৌবনের দূতবৃন্দ প্রস্তুত হয়েছে, কবি তাঁদেরই দলনেতা। নোতুনের অপরিচয়ের অজানার প্রতি মানুষের যে চিরন্তন আকর্ষণ, তাই যৌবনের বসন্ত, তারণ্যের ফাল্গুন। 'ফাল্গুনী' নাটিকায় তারই জয়গান। কবির সাহিত্য-জীবনেও বারবার এই নবীনের ডাক এসেছে, সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাস, চিরাচরিত পথ ও ভাবনা ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেছেন। সেখানেই তিনি আধুনিকোত্তম।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জরা মৃত্যুকে পরাজিত করে বারবার যৌবন জয়লাভ করছে। 'ফাল্গুনী' নাটকের এই তত্ত্বটি কবি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন; 'শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হোলো বলে মনে হোলো সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি যে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে, প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে বেড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটেকেই যৌবন দেখি। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত—এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।'

সাহিত্য-জীবনেও রবীন্দ্রনাথ এই যৌবনের, তারুণ্যের, নবীনের জয়পতাকা দীর্ঘ ষাট বছর ধরে তুলে ধরেছেন। কখনো রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপন্থী

স্থিতাবস্থারক্ষাকারী মতবাদের সঙ্গে আপোষ করেন নি। উনিশ শতকের শেষপাদে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের সূচনা ; সেদিন তিনিই ছিলেন আধুনিক। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের শেষার্ধে তাঁর সাহিত্য-জীবনের সমাপ্তি ; সেদিনো তিনিই আধুনিক, না, তিনি আধুনিকোত্তম। সমকালের জীবনে সব প্রগতিশীল চিন্তাই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন, যাচাই করেছেন এবং শক্তি জুগিয়েছেন। তাই তিনি কখনো ফুরিয়ে যাননি। তাঁর মন কখনো বুড়িয়ে যায়নি, মরে যায়নি, নব নব চিন্তা-ভাবনাকে তিনি তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করার জন্য সদাই উৎসুক ছিলেন। সেজন্যই তাঁকে বলি আধুনিকের আধুনিক।

বর্তমান শতকে বাংলা দেশে দুটি সাহিত্য-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দুটি প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলন প্রবর্তিত হয়। একটির কেন্দ্র, 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-২৮), অপরটির কেন্দ্র 'কল্লোল' (১৯২৩-৩০)। সবুজপত্র-গোষ্ঠীর লেখকরা সাহিত্যে তারুণ্য ও নবীনের জয়পতাকা তুলে ধরেছিলেন ; রবীন্দ্রনাথের সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, সবুজপত্রে লিখেছেন, সবুজপত্রীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সবুজপত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার। এর পর কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা যা প্রাচীন, প্রবীণ—সব কিছুতেই অস্বীকার করলেন। বিদ্রোহ, বিরোধ, অস্বীকৃতি—এই পথেই তাঁরা নবীনের সন্ধানে বেরোলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে পথের বাধা বলে আখ্যা দিয়ে তাঁকে অস্বীকার করতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ এই অস্বীকৃতি ও বিদ্রোহকে নিন্দা করলেন না, বরং ভ্রান্তি নির্দেশ করে যথার্থ আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করলেন ও লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন তিনিই সর্বাগ্রগণ্য আধুনিক। কল্লোলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কটি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার নয়, অবিনয় ও উপেক্ষার উত্তরে ক্ষমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জয় ঘোষণা।

'সবুজপত্র' ও 'কল্লোল'—বর্তমান শতকের বাংলা সাহিত্যে দুটি উজ্জ্বল অধ্যায়। শতাব্দীর প্রতিভা, সাহিত্যের সম্রাট, আধুনিকতার পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ এই দুটি অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত তরুণের প্রতি স্পর্ধার উত্তরে আপন প্রতিভার নবরূপ প্রকাশ করলেন। এই ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমন কৌতূহলোদ্দীপক। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের সাহিত্য-আন্দোলনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের সেই যুগাতিশায়ী অথচ যুগন্ধর প্রতিভার পরিচয় রয়ে গেছে। আশ্চর্য এই, সবুজপত্র-পর্বে রবীন্দ্রনাথকে বাধা পেতে হয়েছে রক্ষণশীল ও নবীন—উভয়ের কাছ থেকেই। 'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, গিরিজাশংকর

রায়চৌধুরী, 'প্রবাসী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করলেন দুটি অভিযোগে—রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রাভিত্তিক নয় ও সর্বজনীন নয়। আর কল্লোল-পর্বে রবীন্দ্রনাথকে বাধা পেতে হয়েছে বেশী আধুনিক তরুণদের কাছে থেকেই—রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক নন, এই অভিযোগে 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'র আধুনিক লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেছেন। আসল কথা এই, সনাতনপন্থী ও প্রগতিপন্থী—দুই পক্ষই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন। কবি তাঁর সাহিত্যকর্মে ও আলোচনায় এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন, এবং প্রমাণ করেছেন 'ফাল্গুনী' নাটকের জীবন-সর্দারের মতো তিনি চিরনবীন।

২

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রবর্তনের সংকল্প প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে সেই 'নতুন' পত্রিকা 'সবুজপত্র' নামে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। সেদিন থেকে চার বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে লিখেছেন। 'সবুজপত্র'-পর্বটি সব দিক থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে নতুন অধ্যায় সৃষ্টির পর্ব। গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, গদ্যশৈলীতে, নাটকে সম্পূর্ণ নতুন পর্বের পরিচয় পাওয়া গেল; এটিকেই 'বলাকা'-পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; এর সঙ্গে পূর্বেকার রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রইল না।

'সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর দুটি প্রবন্ধ ('সবুজপত্র' ও 'সবুজপত্রের মুখপত্র') ও দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ ('যৌবনে দাও রাজটীকা')—এই তিনটিতে সম্পাদকের তথা 'সবুজপত্র'-মণ্ডলীর মনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধের সূচনা করেছিলেন একটি শ্লোকে—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'। এই প্রাণ ইয়োরোপের নবীন প্রাণ, এবং আনন্দ যৌবনের আনন্দ, এর উৎসাহ। ইয়োরোপ আমাদের মননে নিত্য ঝাঁকুনি দিচ্ছিল, তার ফলে আমরা আর ঘুমোতে পারছিলুম না। সম্পাদক বলেছেন, তা আমাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। এই প্রাণশক্তির অর্চনায় আমরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠবো। এই প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। 'সবুজপত্র' সেই প্রাণ-জাগানো আর্টের সাধনা করবে, এই তাঁর বক্তব্য। 'সবুজপত্র' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী সবুজের অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। এদেশের জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীর

দল সবুজকে বা প্রাণকে তার স্বভাবের মধ্যে ছেড়ে দিতে চান না। প্রমথ চৌধুরী এর বিরোধিতা করে বলেছেন, 'এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো তার কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই। কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।' সবুজপত্র এই যৌবনের অর্চনা করবে, এই আশাতেই এই সাহিত্যপত্রের প্রবর্তনা।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বে এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'বলাকা' কাব্য, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, 'ফাল্গুনী' নাটিকায় এই প্রাণেরই জয়গান করে হয়েছে। 'সবুজপত্রে'র নবীন-বরণের পিছনে যে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল, তার পরিচয় এই সব গ্রন্থে রয়েছে।

চিরনবীন রবীন্দ্রনাথ এই আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলেন। 'সবুজপত্রে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হোলো বলাকা কাব্যের প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান':

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা!

রবীন্দ্রনাথ অন্তরে অন্তরে যে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রত্যাশা করেছিলেন, তা 'সবুজপত্রে' পেলেন। এই সংখ্যাতেই তিনি লিখলেন 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরী অতিহিংসেবী ছলনাকে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আমরা যে আমাদের সে অভাব [মনের ও চরিত্রের] সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি নি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য। আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।' (সবুজপত্রের মুখপত্র)।

রবীন্দ্রনাথ এই ছলনা ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে তীব্র ব্যঙ্গ করে এই বৈশাখ

সংখ্যাতেই লিখলেন : 'চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলি বাধা। এমন স্থলে বলিতে হয় খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বর-দত্ত পাখাদুটোকে অসাড় করিয়া দিল ; নয় বলিতে হয় ঈশ্বর-দত্ত পাখার চেয়ে লোহার খাঁচাগুলো পবিত্র; কারণ, পাখা ত আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে ; কিন্তু লোহার সলাগুলো চিরকাল স্থির আছে।' এই আত্মপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে যৌবনের প্রতি কবির আহ্বান,'দেশের নবযৌবনকে আর নির্বাসিত করিয়া রাখিতে পারিবে না। তারুণ্যের জয় হউক, তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক, তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্য সাধন হইতে যাক্।' ('বিবেচনা ও অবিবেচনা')।

ছন্দের দোলায় এই বাঁধ-ভাঙা তারুণ্যের বন্দনা ধ্বনিত হোলো—

আন্‌রে টানা বাঁধা পথের শেষে!
বিবাগী-কর্ অবাধ পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা,
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

'বলাকা' কাব্যে এই উদ্দাম তারুণ্যের কলরোল, 'ফাল্গুনী' নাটকে এই প্রমত্ত যৌবনের অভিযান, 'সবুজপত্রে' এই সবুজের অভিযান। রবীন্দ্রনাথ নতুন ভাবের আবেগে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

'সবুজপত্রে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী লেখেন 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ। এই নামটি আগের সংখ্যার (১৩২১ বৈশাখ) 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতার চরণাংশ। এতে তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।······এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।···ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ

করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জয়লাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশংকা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।'

রবীন্দ্রনাথ এই মানসিক যৌবনের অধিকারী। তাঁর মনে যৌবনের ক্ষয়ের আশংকা ছিল না। এও মনে রাখা উচিত যে, তিনিই তাঁর সাহিত্য ও জীবন-সাধনায় সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীও এই মানসিক যৌবনের অধিকারী ছিলেন। তাই বলাকা-ফাল্গুনী-চতুরঙ্গ-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ও সবুজপত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী—উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা গভীর ও সুফলদায়ী হতে পেরেছিল।

যৌবনের সুরে রবীন্দ্রনাথ আপন বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন বলেই এই পর্বে বলতে পেরেছিলেন :

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও—
ফিরে নাহি চাও,
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়—
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

এই গতির উল্লাস, বন্ধনমুক্তির চাঞ্চল্য, জীবনের দর্প, বস্তুপুঞ্জের উপরে প্রেমের,—তথা যৌবনের জয়ঘোষণা কেবল 'বলাকা' কাব্যের নয়, এই পর্বেরই মূল সুর। 'সবুজপত্র' তাই যৌবনের পত্র, রবীন্দ্রনাথ সেই যৌবন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত আর প্রমথ চৌধুরী তার নান্দীপাঠকারী যাজ্ঞিক।

অতিবিবেচনা, পাটোয়ারী সংসারী বুদ্ধি, সামাজিক ভণ্ডামি, ধর্মের নামে পাপাচারণ, মঙ্গলের নামে মিথ্যাচরণ, আদর্শের নামে ব্যবসাদারি—এর বিরুদ্ধে 'সবুজপত্রে'র অভিযানে গল্পক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন পর পর সাতটি তীব্র জ্বালাময় গল্প লিখে। এগুলির নাম—'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', 'অপরিচিতা'—সবক'টিই 'সবুজপত্রে'র প্রথম বর্ষ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এ-সময়ে প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা

একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথের তীব্র তিক্ত মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে: 'মিথ্যার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে বাবুবাছা সম্বোধন করে আর চলবে না। আমাদের বর্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই—বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ কিন্তু যেখানে যথার্থই বীর্যের দরকার…সেখানে দেখতে পাই বড় বড় সাহিত্যিক পাণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্চে।' (চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ২৫। দ্রঃ 'রবীন্দ্রজীবনী' ২)। 'হৈমন্তী' ও 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে তিনি বৃদ্ধ পাপাচারী বাঙালী সমাজকে আঘাত করলেন; প্রত্যাঘাত এল সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' ও চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্রের 'নারায়ণ' পত্রিকা থেকে। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে সেই প্রতি আক্রমণ বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছে, রয়ে গেছে এই গল্পগুলি কঠিন হীরার মতো উজ্জ্বল নির্মম ব্যঙ্গ। জীর্ণ সংস্কার ও মিথ্যা আচারকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাবার যে সুর 'সবুজপত্রে' ও 'বলাকা'র 'সবুজের অভিযান' কবিতায় পাই, এখানে তারই অনুস্মৃতি। নারীর বিদ্রোহী মূর্তি 'স্ত্রীরপত্রে' অসহ্য জ্বালাময়ী দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূতা হল, তারই স্বতন্ত্র চিন্তা, ধ্যান ও কর্মের পরিচয় পাওয়া গেল 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত দুটি উপন্যাসে—'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ'-এ।

'সবুজপত্রে'র এবং প্রমথ চৌধুরীর সাধনার এককথায় পরিচয় দিতে পারি এইভাবে— মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি, যুক্তির প্রতিষ্ঠা, সর্ববিধ সংস্কারের পিছটান থেকে মুক্তি, সর্বপ্রকার আপ্তবাক্যের শাসন থেকে মুক্তি। এই মুক্তির পরিচয় কথাসাহিত্যে প্রথম পেলাম উপরোক্ত গল্পসপ্তকে এবং 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। 'চতুরঙ্গ' ও 'চার-ইয়ারি কথা' একই সময়ে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে ধর্মসাধনার বিকৃতি—ভাবরসের উন্মত্ত নেশা ও তার শোচনীয় পরিণতির চিত্র পাই। 'চার-ইয়ারি কথা'য় রোম্যান্টিক প্রেমের অতিকৃতি ও ন্যাকামির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করা হয়েছে। 'চতুরঙ্গে'র শচীশ ধর্মসাধনার কাঠিন্য ও ভাবসাধনার আতিশয্য—উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সম্পূর্ণ জীবনকে জানতে চেয়েছে—সে সংগ্রামে বহু বেদনা ও সংশয়। 'চার-ইয়ারি কথা'য় চার বন্ধু প্রথম যৌবনের রোম্যান্টিক স্বপ্নলোকের **Swan-song** গেয়েছে। তার ফলশ্রুতি ছলনা ও বঞ্চনা, মূঢ়,—হাস্যকর অধঃপতন। এ দুটি গ্রন্থের মধ্যে মিল আবিষ্কার করা অনুচিত। উভয় ক্ষেত্রেই চিন্তা ও বুদ্ধির যে মুক্তির পরিচয় পাই, তা আমাদের আকৃষ্ট করে। আর এটাই 'সবুজপত্রে'র মূল কথা।

'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রনাথ : এ দুই মণিকাঞ্চনের যোগাযোগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের আর একটি লাভ হয়েছে, তা হোলো—সাহিত্যের বিচারক্ষেত্রে বুদ্ধির মুক্তি ও নবীন যুগের প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই পর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ ওঠে—বস্তুতন্ত্রতা ও সর্বজনীনতার অভাব—এই অভিযোগ। সনাতনী রক্ষণশীল সাহিত্য-শিবিরে রবীন্দ্রনাথ ও 'সবুজপত্রে'র বিরুদ্ধে যাঁরা নেতৃত্ব করেন, তাঁরা হলেন, বিপিনচন্দ্র পাল ('নারায়ণ') ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ('সাহিত্য')। তীক্ষ্ণ যুক্তি ও মর্মভেদী ব্যঙ্গ-বাণের আঘাতে এঁদের ধরাশায়ী করেন প্রখ্যাত ব্যঙ্গশিল্পী স্বয়ং 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী (দ্র—'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' ১৩২১ মাঘ, 'চুটকি' ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ, 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' ১৩২২ কার্তিক। প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১)।

সবুজপত্রে 'বাস্তব' (১৩২১ শ্রাবণ) ও 'লোকহিত' (১৩২১ ভাদ্র) নামক দুটি প্রবন্ধে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ দুটির জবাব রবীন্দ্রনাথ দিলেন এবং আদর্শবাদের সমর্থন করলেন। সংসারের সত্য অপেক্ষা সাহিত্যের সত্যকে অধিকতর কাম্য ও বরণীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করলেন এবং সাহিত্যসৃষ্টি ও সমাজসেবা, উভয়ের মূলে আনন্দের অবস্থিতিকে প্রধান বলে মনে করলেন।

এরপরই 'ঘরে বাইরে' (সবুজপত্র, ১৩২২ বৈশাখ-ফাল্গুন) প্রকাশিত হোলো। এই উপন্যাসের যত নিন্দা ও সমালোচনা হয়েছে তা আর কোনো লেখা সম্পর্কেই হয় নি। নারীর স্বাতন্ত্র ও সংস্কারান্ধতার ব্যর্থতা—এ দুটির 'পরে কবি এ উপন্যাসে জোর দিয়েছেন। 'সবুজপত্রে'র মূল সুরের সঙ্গে এই প্রথা বর্জিত নূতন চিন্তার মিল আছে। মানবিক মূল্যবোধ ও নবীন প্রবীণের আদর্শের সংঘাতে এই উপন্যাস যে দীপ্তি পেয়েছে, তা এর পূর্বেকার কোনো উপন্যাসে দেখা যায় নি। 'ঘরে বাইরে' একাধারে সমকালের ও নিত্যকালের উপন্যাস। বস্তুতন্ত্রতার অভাব রয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে, এই অভিযোগের জবাব পাই এখানে। বাস্তবতার নগ্নমূর্তি এখানে দেখেছি, আবার আদর্শ ত্যাগমহিমার উজ্জ্বল ছবিও এখানে পাই। সমকালের স্বীকৃতি রয়েছে এই উপন্যাসে; লেখকের কৈফিয়তে ('সবুজপত্র' ১৩২২ অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে।' আধুনিক কাল বাংলা উপন্যাসে পটভূমিরূপে এই প্রথম দেখা গেল। সংশয়, নৈরাশ্য, জটিলতা, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি

আস্থাহীনতা, বুদ্ধির প্রতি আনুগত্য, চিত্তের অবাধ বিচরণ, কথাসাহিত্যে মননশীলতার প্রতি ঝোঁক: এগুলির মধ্য দিয়েই আধুনিক কালের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রেও তাই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক। বস্তুত 'সবুজপত্র' তাঁকে চালায় নি। তাঁর মন তৈরি ছিল, 'সবুজপত্র' উপলক্ষ্য মাত্র; কবির মন আপন শক্তিতেই অজানা অপরিচিত ভাবরাজ্যে পদক্ষেপ করেছে। এপর্বে রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধেও ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম') এই তীব্র কালচেতনা লক্ষ্য করি।

সংস্কার-মুক্তি বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যের আম-দরবারে প্রমথ চৌধুরী চলতি গদ্যকে সম্মানের আসরে বসিয়েছেন। তার প্রথম পরিচয় পেলাম সবুজপত্রে। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি মোড় ফিরল। সাধু গদ্যের পরিপূর্ণ ও মহৎ রূপটি আয়ত্তে পাবার পর পঞ্চাশোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য তার চর্চা ছেড়ে চলতি গদ্যকে বরণ করে নিলেন। প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহ-রূপ বাইরের ঠেলাতে রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকে বরণ করেছিলেন, এটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ', 'ছিন্নপত্র', 'শান্তিনিকেতন', 'গোরা'-র সংলাপ, হাস্যকৌতুক-নাটিকা ও 'অচলায়তন' পর্যন্ত নাটকের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্রথম 'সবুজপত্রেই' 'গল্পসপ্তক' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকে প্রকাশ্যে সাহিত্য রচনায় গ্রহণ করলেন। ১৮৮১ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যে অন্তরালবর্তী প্রয়াস, তা ফলবতী হল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে; 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১ শ্রাবণ 'সবুজপত্র') গল্পে রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকে সুয়োরাণী বলে ধরে নিলেন। রবীন্দ্র-গদ্য-বিবর্তনে এটাই সবুজপত্রের দান। 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়ের যোগাযোগে চলতি গদ্য আন্দোলন শক্তি লাভ করে প্রাপ্য সম্মান অর্জন করল। 'স্ত্রীর পত্র' কেবল ভাবরাজ্যে ও সমাজে বিপ্লব ঘটাল না, সেই সঙ্গে গদ্যরীতিতেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইশারা নিয়ে এল। 'স্ত্রীর পত্রে'র ভাষায় এমন একটি তীক্ষ্ণতা ও নির্মমতা আছে যা আমাদের প্রতি মুহূর্তে সচেতন করে রাখে। এর সূচনাটি এইরকম: 'আজ পনেরো বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে। আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখি নি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেছো, আমিও শুনেছি। চিঠি লেখবার মত ফাঁকটুকু পাওয়া যায় নি। আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, তুমি আছ তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই, সে তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েছে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দরখাস্ত করলে না।

বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি। আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে চিঠিখানি লিখছি, এ তোমাদের মেজবউয়ের চিঠি নয়।'—[গল্পগুচ্ছ, ৩]।

ভাব ও ভাষার এই মুক্তির অনুকূল ক্ষেত্র 'সবুজপত্র'। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ও 'সবুজপত্রে'র যোগাযোগ সুফলদায়ী হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যগুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। তবে যে তিনি সনেটে ও গল্পে রোম্যান্টিক প্রেমের শ্রাদ্ধ করেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভক্তিবশতঃ নয়, অন্ধ রবীন্দ্রানুসারিতা ও অনুকৃতির প্রতি বিরক্তিবশতঃ। প্রমথ চৌধুরীর রবীন্দ্রানুরাগের প্রমাণ সবুজপত্রের যৌবন-বন্দনা ও 'বলাকা'-'ফাল্গুনী'র যৌবনবন্দনা।

৩

'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠী এলেন, তাঁরাই আধুনিকের দল। এঁদের পরিচয় অল্প কথায় দিয়েছেন শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—'বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নূতন সাহিত্যের জোয়ার এল দেশে, তা পরোক্ষভাবে জাতীয়তার মাটি ছুঁয়ে থাকলেও, প্রত্যক্ষভাবে চলে গেল অন্তর্লোক বিশ্লেষণের এলাকায়, অথবা রাজনীতিক সমাজ-চেতনা সৃষ্টির পথে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এবং মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এ শতাব্দীর জীবনে ও মনন-রাজ্যে যে বিপ্লব এনেছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহও তা থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনি। সাহিত্যিকের সৃজনীমন চলে গেছে নোংরা মজুর-বস্তিতে, অবজ্ঞাত পতিতা চোর ডাকাত ভিক্ষুক গেঁজেল ও জুয়াড়ীর আড্ডায়।

মানুষের অন্তর্লোক যাচাইয়ের এই প্রয়াস তার সাহিত্যের দ্বিমুখী (জাতীয়তা-বনাম-আন্তর্জাতিকতা চিহ্নিত) পথকে শতমুখে প্রসারিত করে দিল। কিন্তু যত বড় সৃষ্টি হলে এই অভিনব মাল-মসলা সার্থক ঐতিহ্য গড়তে পারত, তা হয় নি। প্রথমত লেখকের জীবনবোধ ছিল সীমাবদ্ধ, কেননা বয়স ছিল অল্প এবং অভিজ্ঞতার চেয়ে পুঁথির সঞ্চয়ের ওপরই ভরসা রেখেছিলেন তাঁরা সবচেয়ে বেশী। দ্বিতীয়ত নিজের আদর্শ তাঁদের নিজেই তৈরী করে নিতে হয়েছিল, সামনে কোনো পূর্বাচার্য ছিলেন না। তবু এঁরা স্মরণীয় নতুন যুগের লেখক।' ['সাহিত্য ও স্বাধীনতা' : 'সাহিত্যের খবর' বৈশাখ ১৩৬৬]।

'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে আর দুটি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য—তা হ'ল 'বিচিত্রা' (সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ও প্রবাসী' (সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। শেষ দুটিতে রবীন্দ্র-অনুস্মৃতি। 'কল্লোল' পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব দেউলে হয়ে গেছে, চাই নতুন পথের অন্বেষণ। আনন্দের নয়, দুঃখ দারিদ্র্য বেদনা হতাশার সাহিত্যই একালের সাহিত্য—এই ধরনের দাবি এখানেই প্রথম ওঠে। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতায় তারই প্রতিরূপ পাই। 'কল্লোল-' পর্বের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, 'ভাবতুম, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সব-কিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু কল্লোলে এসে আস্তে-আস্তে সে-ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ—তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ। সেদিনকার কল্লোলের সেই বিদ্রোহ-বাণী উদ্ধতকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলুম কবিতায় :

> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহঙ্কার,
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরি না কভু ; সুকঠোর হউক সংসার,
> বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
> পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র-তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!
> গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
> উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম-সম্ভাবনা ;
> অক্ষর তূলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
> ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা!

['কল্লোলযুগ', ১ম সং, পৃ ১৪৭-৪৮]

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর মনের কথাটি এখন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তথাপি রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তরুণের ঔদ্ধত্য ও চাপল্যকে ক্ষমা করেছিলেন, নবীনের শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ-স্বরূপ কবিতাও পাঠিয়েছিলেন। সে কবিতা 'কল্লোলের' তৃতীয় বর্ষে (তেরশ বত্রিশ বঙ্গাব্দে) বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—

যেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত
আমার পরাণ হবে কিংশুকের রক্তিমা-লাঞ্ছিত
সেদিন আমার মুক্তি, যেই দিন হে চির-বাঞ্ছিত
তোমার লীলায় মোর লীলা
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে-তালে মিলা।

তরুণের মুক্তিপিপাসাকে কবি সেদিন স্মিতহাস্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রসন্ন দাক্ষিণ্যের সুর রইল না। তার জন্য দায়ী—নবীনের ঔদ্ধত্য ও দম্ভ এবং পূর্বাচার্য ও ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা।

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকদের নির্ভীকতা, নবীনতা, মানবমুখিতা এত তীব্র সুরে আত্মপ্রকাশ করল যে তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারল না। সীমাবদ্ধ জীবনবোধ, অল্প অভিজ্ঞতা, পুঁথিপড়া বোহিময়ান-আদর্শের প্রতি অনুরক্তি এঁদের মহৎ সাহিত্যকর্মের অন্তরায় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পরে এঁদের সম্পর্কে বলেন, লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন আধুনিক সাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এতদ্বারা কখনো মহৎস্থায়ী কীর্তি রচনা করা সম্ভব নয়। তথাপি বাংলা সাহিত্যে নতুন বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিলেন এঁরাই।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তৎকালীন সনাতনী সাহিত্য ব্যবসায়ীরা আক্রমণ চালান 'নারায়ণ' ও 'সাহিত্য' পত্রিকার মাধ্যমে, একথা পূর্বেই বলেছি। সেদিন আক্রমণের বিষয় ছিল—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা ও সর্বজনীনতার অভাব। বারো-তেরো বৎসর পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ সাহিত্যিকের দল রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে পুনর্বার অভিযোগ জানান। এবার অভিযোগ হল রবীন্দ্র-সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তবতার অভাব। সেদিনের 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় এই তর্কের পরিচয় পাই। বিরুদ্ধ পথে সেদিন প্রধান ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (কল্লোলের অন্যতম নেতা) ও শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' (বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ) ও 'সাহিত্যে নবত্ব' (প্রবাসী ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার' (বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন),

একপক্ষে; অপরপক্ষে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র ও 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার-এর উত্তর' (বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (বঙ্গবাণী ১৩৩৪ আশ্বিন) ও মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনীর অভিভাষণ এবং কৃত্তিবাস ভদ্র ওরফে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কল্লোলের জবানবন্দী' এই সাহিত্যতর্কের পরিচয়স্থল (দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী ৩; প্রভাতকুমার)।

'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ দুটি রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আজ স্থায়িত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মৌলিকতা ও আধুনিকতা, বাস্তবতা ও প্রগতিশীলতা নিয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন, তা অশেষ মূল্যবান এবং তার মূল্য আজো আছে।

কবি বলেছেন, 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে-একটি বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকে এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখানকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসী তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অজুহাতই আর্টের পৌরুষ।' (সাহিত্যধর্ম)

রিয়ালিটির নামে লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালনকে সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,—'তারা [আধুনিকরা] বলে সাহিত্যধারায় নৌকা চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্চে পাঁকের মাতুনি,—তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।' (ঐ)

তবু রবীন্দ্রনাথ তরুণকে অবজ্ঞা করেন নি, অগ্রাহ্য করেন নি। নজরুল, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, প্রবোধ প্রমুখ অগ্রণী তরুণ লেখকদের শক্তিকে তিনি যথোচিত স্বীকৃতি জানালেন। ১৩৩৪-এর মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।'

তারুণ্যের আস্ফালন, যে-আক্রতা, অসংযম, উৎকেন্দ্রিকতা, মাটি-ছাড়া ভবঘুরে জীবনের আতিশয্য ও অতিকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিন্দা করলেন, তেমনি নবীন যৌবনের প্রাণের শক্তির 'উদ্বোধন' গাইলেন—

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙে-চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশ পাথর হাতে আছে তার
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।
বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়'
কালের প্রয়াণ পথে
আসে নির্দয় নব যৌবন
ভাঙনের মহারথে॥

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করলেন তরুণ কল্লোলের নেতৃস্থানীয় 'কবি শ্রীমান কাজি নজরুল ইসলাম'কে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহত্ত্ব, ক্ষমা ও স্নেহের দ্বারা—যা ছিল উদ্ধত, অশ্রদ্ধাশীল, দর্পী, তাকে নম্র শ্রদ্ধাবান বিনয়ী তরুণ যৌবন বলে গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে সাহিত্যের আসরে আরেকটি তর্ক ওঠে নবত্ব বা আধুনিকতার পরিপূরক প্রসঙ্গরূপে। তা হোলো সাহিত্যের রস-আদর্শ নিয়ে, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, নিম্নরুচি ও সুরুচি নিয়ে। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ৪ঠা ও ৫ই চৈত্র (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ) দুদিন প্রবীণ ও নবীন দলের বিরোধে উভয়পক্ষে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়, রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করেন। তার বিবরণী সংগৃহীত হয়েছে 'প্রবাসী'তে। প্রথম দিনের প্রতিবেদন—'সাহিত্যরূপ' (প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ), দ্বিতীয় দিনের প্রতিবেদন—'সাহিত্য-সমালোচনা' (প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ)। আধুনিকতার উগ্র তামসিকতা ও অসংযমকে কবি নিন্দা করলেন, সেইসঙ্গে মক্ষিকাবৃত্তিযুক্ত সমালোচনারও নিন্দা করলেন।

এই বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্কের সবচেয়ে বড় সুফল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নব সৃষ্টির প্রকাশ। দেখা দিল 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' 'তপতী' 'রক্তকরবী' 'মহুয়া'।

তর্কে নয়, বিরোধে নয়, সাহিত্যকর্মে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বার প্রমাণ দিলেন তিনি চির-আধুনিক, আধুনিকোত্তম, তিনি চির মানসিক যৌবনের অধিকারী। সত্তরের প্রান্তভাগে উপনীত কবি প্রমাণ দিলেন, জরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি, তিনি সেই 'ফাল্গুনী'র জীবন-সর্দার, 'নূতন যৌবনের দূত', বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন বুড়িয়ে যায় নি, মন তাঁর যৌবনের ক্ষুধা ও আগ্রহে আজো চঞ্চল।

'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে প্রেমের যে মহনীয় রূপের ব্যাখ্যা, 'মহুয়া' কাব্যে ও 'তপতী' নাটকে তারই প্রকাশ। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে পটভূমি আধুনিককালের অব্যবহিত পূর্বের সমাজ-পটভূমি; বিবাহোত্তর জীবনে প্রেম ও কামের মধ্যে সংঘর্ষ এর উপজীব্য। 'শেষের কবিতা'র পটভূমি আধুনিক, পাত্রপাত্রী অতি-আধুনিক, এর মূল বিষয় প্রাক্-বিবাহ পূর্বরাগের অভিনব ব্যাখ্যা। 'মহুয়া'য় প্রেমের মহনীয় রূপ—তা ক্ষমা করে, সহ্য করে, বীর্যে প্রকাশ পায়। 'তপতী'তে এই প্রেমেরই নাট্যরূপ। আধুনিক জীবনের প্রধান সমস্যা এমন নিপুণ গভীর বিশ্লেষণ তরুণীদের বোহেমিয়ান্ গল্প-উপন্যাস-কবিতায় নেই।

সাহিত্যে নবত্ব ও প্রগতি বল্‌তে যথার্থ কী বোঝায়, তারই স্পষ্ট পরিচয় পাই এই গ্রন্থনিচয়ে। তরুণদের কাছে তা বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দাবি করে। সেদিনকার তরুণ লেখক, 'কল্লোলে'র অন্যতম শ্রীবুদ্ধদেব বসু চোদ্দ বছর পরে তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন একটি প্রবন্ধে ('কবিতা' ১৩৪৯ কার্তিক সংখ্যায়)। 'শেষের কবিতা'র আবির্ভাবে চমকিত তরুণ লেখকের স্বীকৃতি—'আমরা যা-কিছু করবার চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ করে, কী অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গীতে। মনে হোলো বইটা যেন আমাদের অর্থাৎ নবীন লেখকদের উদ্দেশ্য করে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের তীব্র মধুর ভর্ৎসনা। অবাক হয়ে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—সে যে আমাদের চেয়েও ঢের বেশি আধুনিক।'

সেদিনকার তরুণ লেখকদের এই মানস-প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। পরবর্তী দশ বছরে সাহিত্যিক-জীবনের শেষ পাদে—রবীন্দ্রনাথ আরো এগিয়েছেন—

প্রতিটি সাহিত্যকর্মে তাঁর আধুনিক জিজ্ঞাসু কৌতূহলী গতিশীল মনের পরিচয় রেখে গেছেন।

৪

তাই 'সবুজপত্র' ও রবীন্দ্রনাথ, 'কল্লোল' ও রবীন্দ্রনাথ—এই প্রসঙ্গের আলোচনায় মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কেবল মহৎ নন, তিনি মহত্তম; কেবল আধুনিক নন, আধুনিকোত্তম। সাহিত্যের নবত্ব তার চিরত্বে, অবিরাম গতিতে, অশ্রান্ত পথসন্ধানে, অপরিমেয় কৌতূহলে, গভীর জীবনজিজ্ঞাসায়।

এই গুণগুলি যাঁর আছে, তিনি স্থবিরের শাসন, প্রাচীনের ভ্রূকুটি, রক্ষণশীলের তর্জনীকে অগ্রাহ্য করে নবীনকে বরণ করে নিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ তা পেরেছিলেন। সবুজপত্র ও কল্লোলের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন, তারুণ্যের জয়রথের পথ অবরুদ্ধ না করে স্বয়ং পথনির্দেশ করেছেন। সাহিত্যের চিরনবীনতায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে নিম্নমুদ্রিত সনেটে। এর মাধ্যমেই তিনি কল্লোলের তারুণ্যকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন :

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক লয়
সমাপ্তির রেখা-দুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্ন স্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি।

কবি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্ব

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

শেষ পর্বের সূচনা কোথায়? কোন্ তারিখে? 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?' তাঁর 'পূরবী'র পরে 'পুনশ্চ',—রোগশয্যা'র পরে 'আরোগ্য'! রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী, চিরজাগ্রত! তবু তাঁর আয়ুর হিসেবেই তাঁর রচনাধারার বিভিন্ন পর্ববিভাগের কথা না ভাবা যাবে কেন?

শেষ দিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভেবেছেন পারাপারহীন অশেষ পরিব্যাপ্তির কথা! তবে, আগের পর্বে সে কথা একেবারেই যে না ভেবেছেন, তা নয়। পরিব্যাপ্তিতেই তাঁর সারা জীবনের আগ্রহ। 'প্রভাত-সংগীত'-এর 'প্রভাত-উৎসব'-এর কথা কে না জানেন? সেই আদিপর্বেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল:

'আকাশ, 'এসো, এসো' ডাকিছ বুঝি ভাই—
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা নাই।'

এবং এই ব্যাপ্তিচেতনার প্রকাশ তাঁর সারা জীবনের রচনায়। শেষ পর্বে এই একটি কথা—'শেষ'—বা এরই অন্য কোনো প্রতিশব্দ তাঁকে অনেকবার ব্যবহার করতে হয়েছে। 'পূরবী'তে 'শেষ বসন্ত',—'মহুয়া'তে 'শেষ মধু', —'পুনশ্চ'তে 'শেষ চিঠি,'—'রোগশয্যায়'-এ 'আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু', —এসব তো আছেই, তাছাড়া 'শেষ সপ্তক' তো তাঁরই নিজের দেওয়া নাম! তাঁর শেষ পর্বের কবিতায় এই অবসান-ভাবনা আর পরিব্যাপ্তিবোধ একসঙ্গে মিলেছে বলে মনে হয়। এ-পর্বের রচনায় তাই 'অবসান', 'গোধূলি' ইত্যাদি শব্দ ছড়িয়ে আছে। সেই সঙ্গে তাঁর 'পৃথিবী' (পত্রপুট) বা 'আফ্রিকা',— 'বৃক্ষবন্দনা' (বনবাণী), 'প্রশ্ন' (পরিশেষ)—অথবা 'রাতের গাড়ি' (নবজাতক) ইত্যাদি অন্য বিষয়ের, অন্য ভাবনার কবিতার কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে, 'জন্মদিনে'র 'ঐকতান,'—আবার 'রোগশয্যায়'-এর 'ধূসর গোধূলি লগ্নে' লেখাটি! ঐ শেষের লেখাটিতে তিনি বলেছিলেন:

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—
চিনিলাম তখন দোঁহারে।

দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ—
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের স্থর।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কল্পনার সমারোহ মোটেই নতুন ব্যাপার নয়। বর-বধূর রূপক প্রয়োগও তাঁর ক্ষেত্রে নতুন নয়। তাঁর শেষ পর্বেও তাঁকে বাংলার 'আধুনিকতম' কবি বলে মনে হয়েছে। অথচ তাঁর অতীতের 'গানভঙ্গ'-কবিতার মতন শেষ পর্বে তিনি লিখে গেছেন 'নূতন শ্রোতা'! 'পরিশেষ' বইখানিতে পর্যায়বন্ধে পর পর দুটি কবিতা ছাপা হয়েছে—ঐ 'নূতন শ্রোতা' নামেই। দুটিই ১৯২৭-এর রচনা—প্রথমটি ১৯এ আগষ্ট এবং দ্বিতীয়টি ২৭এ অক্টোবর লেখা হয়। সেই দ্বিতীয় কবিতায় নতুন কালের 'আধুনিকতা'র চেহারার তিনি যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেটি এই :

নতুন কালের শান দেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি

১৩৩৮ সালে নলিনীকান্ত গুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা' পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তার দশ বছর পরে 'প্রবাসী'তে তিনি সে-পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ লেখেন। ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধুর আমল থেকে বঙ্কিম-মধুসূদনের যে ব্যবধান, সেটা কালের দিক থেকে নয়,—মতিগতি বা মনোধর্মের দিক থেকেই তা বিবেচ্য,—এই ছিল নলিনীকান্তের মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন : 'আধুনিকতার পাকা সড়কে বঙ্কিম-মধুই বাংলাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তবুও, সে পথে উঠিয়াও প্রাচীন যুগের ধরন-ধারণ—কেমন যেন মাঠ-ঘাটের গন্ধ, কাদামাটির স্পর্শ—আমরা একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে আমরা সেখানে গাড়ী-যুড়ী—গাড়ি-যুড়ী কেন, রেল-মোটর পর্যন্ত চালাইয়া দিয়াছি।'

এই 'আধুনিকতা'র আরো নিখুঁত পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : 'আধুনিক আধুনিক হইয়াছে বিশ্বজগতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংমিশ্রণের কল্যাণে। জাতিতে-জাতিতে দেশে-দেশে নিবিড়তর আদান-প্রদান প্রত্যেক জাতিকে দেশকে দিয়াছে একটা অভিনব রূপ, অভিনব ধর্ম—এইভাবে যে অভিনবত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বোধ হয় আধুনিকতর বৈশিষ্ট্যের প্রধান অঙ্গ। মধুসূদন-বঙ্কিম

যে আধুনিক, তাহার অর্থ এই—তাঁহারা বাঙালীর শিল্পচেতনায় ইউরোপীয় হাবভাব আনিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। ইউরোপই হইল আধুনিক যুগের ধর্মক্ষেত্র, পীঠস্থান।' তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ইউরোপের সংস্পর্শের ফলে জাপান আধুনিক হয়ে উঠেছে, আর সেই সংস্পর্শের অভাবে চীন সে-রকম 'আধুনিক' হতে পারে নি। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু—এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রাদেশিক-অর্থে বাঙালী, কিন্তু বঙ্কিম-মধুসূদন এই প্রাদেশিকতার বেড়া ভেঙে দেশ-দেশান্তরের পরিচয় সঞ্চার করে দেন। রবীন্দ্রনাথও সেই কাজই করেছেন, কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই যে, বহির্বিশ্বকে খুবই সহজে নিজের ভাষায় প্রতিফলিত হতে দিয়েও তাকে তিনি সত্যিই আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি কথা নলিনীকান্ত এই সূত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করেছিলেন। সে কথা এই যে:

দেশে দেশে মোর দেশ আছে,
আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।—

এইটি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছিলেন: 'দেশ হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এইরকম তির্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, আলিঙ্গন করিয়াছে বিশ্বকে। কাল হিসাবেও তাহা আবার অন্যদিকে বর্তমান হইতে উঠিয়া গিয়াছে অতীতে, বৈষ্ণব সাধকের অনুভব, উপনিষদের অনুভবের রাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন।—এই দিককার অনুভবকে লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন আবার সেই তির্যক্-প্রসারিত বিশ্ব-অনুভূতির মধ্যে। স্থানকালের এই ব্যবধানহীন ব্যাপ্তি আর নিত্যতার উপলব্ধিতেই রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিকতা'র বিশেষত্ব,—একথা মেনে নিলে, তাঁর সমস্ত সৃষ্টিক্ষেত্রটিই সেই 'আধুনিক' দৃষ্টির দান বলে স্বীকার করতে হয়।

লোকধারণায় যাকে বলে 'আধুনিকতা', নলিনীকান্তের আলোচনায়—সেই আধুনিকতার সঙ্গে কালের নিত্যতা এবং স্থানের পরিব্যাপ্তি কতটা জায়গা পেয়েছে, সে-বিষয়ে আপাততঃ আলোচনা স্থগিত রেখে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার কালানুক্রমিক প্রবাহের পর্ব-বিভাগ করতে হলে 'ক্ষণিকা' থেকেই তাঁর আধুনিকতার সূত্রপাত ধরা যাবে,—না-কি 'বলাকা' থেকে,—'পূরবী' থেকে,—না-কি 'মহুয়া'য়,—'শেষসপ্তকে', না-কি 'পুনশ্চ' কবিতা-সংগ্রহে, সে-বিষয়ে তাড়াতাড়ি সংশয়াতীত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছোনো সম্ভব নয়। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০ তারিখে 'নবজাতক'-এর সূচনায় তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাব্যের ঋতু পরিবর্তন বারেবারেই ঘটে গেছে। 'প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে

ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু-যোগান নতুন পথ নেয়।'
সেই স্থচনাতেই তিনি বলেছিলেন :

'কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে অন্যমনে। কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে। সম্প্রতি সেই সমজদারের সাড়া পেয়েছিলুম। আমার একশ্রেণীর কবিতার এই বিশিষ্টতা আমার স্নেহভাজন বন্ধু অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েছিল। ঠিক কীভাবে তিনি এদের বিশ্লেষণ করে পৃথক করেছিলেন তা আমি বলতে পারি না। হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা। কিন্তু এ আলোচনা আমার পক্ষে সংগত নয়। আমি তাই 'নবজাতক' গ্রন্থের কাব্যগ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপরেই দিয়েছিলুম। নিশ্চিন্ত ছিলুম, কারণ দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ব্যাপকক্ষেত্রে তাঁর সঞ্চরণ।'

'নবজাতক'-এর এই 'স্থচনা'য় ব্যাপ্তির কথা তিনি নিজেই বলেছেন। নলিনীকান্তের সূত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি বিচার করলে তাকে 'আধুনিক' বলতেই হয়। কিন্তু এ-অর্থে তিনি কী কোনো কালে অনাধুনিক ছিলেন? প্রথম জীবনে তিনি সেই-যে বলেছিলেন,—জগতের আলিঙ্গন গ্রহণের জন্যে তাঁর হৃদয় প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, সেই 'প্রভাতসংগীতে'র আমল থেকে,—এমনকি তারও আগে থেকেই তিনি এই ব্যাপ্তি উপলব্ধির কথা বার বার বলে গেছেন। 'নবজাতক'-এর পরে বৈশাখ ১৩৪৮-এ বেরিয়েছিল 'জন্মদিনে' [১ বৈশাখ, ১৩৪৮]। 'জন্মদিনে' বইখানির প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই তাঁর চেতনার অশেষস্পর্শিতার কথাই তাঁকে বলতে শোনা গেছে। যেমন তিনি প্রথম কবিতাতেই বলেছেন :

> আজি এই জন্মদিনে
> দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।
> যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
> নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে

রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে।
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

দ্বিতীয় কবিতার প্রথম দুটি লাইনে তিনি বলেছিলেন :

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।

এবং সেই কবিতার শেষ তিন লাইনে নিজের সেই ব্যাপ্তিবোধের কথাই তাঁকে পুনর্বার বলতে শোনা গেছে :

শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে ॥

তাহলেও 'নবজাতক'-এর বেশির ভাগ কবিতাই কিন্তু অন্য জাতের, অন্য বিষয়ের। সেখানে তিনি 'শেষদৃষ্টি', 'বিদায়', ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু একটু লক্ষ করলেই মানতে হয় যে, তৎসত্ত্বেও 'ভূমিকম্প', 'রাজপুতানা', 'হিন্দুস্থান', 'বুদ্ধভক্তি' ইত্যাদি কবিতাগুলির নামেতেই নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগের বিশেষ ঝোঁকটুকু ব্যক্ত হয়েছে। 'জন্মদিনে'তে নিজের জন্মদিন অবলম্বন করে তাঁর অন্তর্মুখী হবার সুযোগ বেশি ছিল এবং সে-সুযোগের সদ্ব্যবহারেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। 'নবজাতক'-এর 'অস্পষ্ট', 'ইষ্টেশান' ইত্যাদি কবিতায় এতৎসত্ত্বেও সীমা-অসীমের মহাসম্মিলনের কথা ধ্বনিত হয়েছে। 'নবজাতক'-এর 'কেন' কবিতায় তিনি মানবজীবনের অশেষ ব্যাপ্তি-চৈতন্যও প্রকাশ করেছেন, আবার, সেই সঙ্গে, এই বিপুল জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের গূঢ় অর্থানুসন্ধানও ব্যক্ত হয়েছে :

নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারা বেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন ॥

'পবিশেষ'-এরই সমকালীন 'পূরবী'তে তাঁর অতীতের 'কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনা'র কথাটাই প্রধান ; পূরবী সন্ধ্যার সুর,—সেখানে একই সঙ্গে ফেলে-আসা

অধ্যায়ের বিষণ্ণতা এবং নিজের বোধ-বুদ্ধি-বিশ্বাসের তীব্র স্বীকৃতি বা সমর্থন ধ্বনিত হয়েছে। কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা মন্তব্যগুলির মধ্যেও সেই একই বিশেষত্ব দেখা গেছে, যেমন 'শিলঙের চিঠি'র মধ্যে—'ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে,'—এই উক্তির সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি জানিয়েছিলেন :

ছড়া কিম্বা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।

কিন্তু 'তপোভঙ্গ' 'লীলাসঙ্গিনী', 'সাবিত্রী,' 'আহ্বান' প্রভৃতি 'পূরবী'র প্রসিদ্ধ কবিতা তাঁর ভূমাবোধের ব্যাকুলতা এবং আত্মবোধের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তিরই উদাহরণ। 'কালের অধীশ্বর' কিংবা 'কালের রাখাল' কিংবা অন্য যে-কোনো নামেই অমৃতস্বরূপকে তিনি চিহ্নিত করুন না কেন, সেইসব আহ্বানের মধ্যে নতুন কালের বন্দনা স্পষ্ট নয়,—এবং তা মোটেই যুগান্তসূচক নয়! বরং ১৯২৬-২৭ থেকেই তাঁর নতুন মনোভঙ্গির সূচনা। সে অবিশ্যি নতুনও বটে, নতুন নয়ও বটে। তাঁর শেষ পর্বের কবিতার কাল-সীমা তাই ১৯২৭ থেকেই ধরা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক উচ্ছলতার সুখে,—নৈসর্গিক উচ্ছ্বাসের প্রহরে,—তাঁর কবিদৃষ্টিতে মানব-সংসারের স্থূল-সূক্ষ্ম নানাবিধ বাদপ্রতিবাদ তখন 'শুকনো পাতার মতো' অপসারিত হয়েছিল! এবং সেই অবস্থায় বড়োই বিস্ময়-ব্যাকুল মনে তিনি তাঁর 'হৃদয়-নিকুঞ্জ' মাঝে ঋতুরাজ বসন্ত-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন!

২৭এ শ্রাবণ ১৩৩৫ 'মহুয়া'র 'নিবেদন' কবিতাটি লেখা হয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন :

অজানা খনির, নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার।

এসব কথা পড়তে পড়তে আবার মনে পড়ে যে, 'পূরবী', 'পরিশেষ', 'বনবাণী', 'মহুয়া'—সময়ের দিক দিয়ে এ সবই পরস্পরের সন্নিহিত রচনা।

১৯২১-২২ সালে রবীন্দ্রনাথ যে 'মাটির ডাক' শুনেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনের মাটির কথার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব নেই। কখনো কাছের জগৎ, কখনো বা দূরের জগৎ তাঁকে নিত্যই আকর্ষণ করেছে। তবু ভেতরে-ভেতরে গভীর যে মনোধর্মে তাঁর সবচেয়ে বেশি নিষ্ঠা ছিল, সেটিকে বলা যায় শান্তরসের

নিষ্ঠা। ১৩০১-২ সালে, অর্থাৎ ইংরেজি হিসেবে গত শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি যখন 'চিত্রার' শীতে ও বসন্তে' 'নগর-সংগীত' ইত্যাদি কবিতা লিখেছিলেন, তখনকার মনোভাবের পরিচয় দিতে হলে তাঁরই 'ছিন্নপত্র' থেকে মন্তব্য তুলে বলা যায় যে, মানুষের বিষয়কর্মময় ব্যস্ততার মধ্যে প্রসন্নভাবে প্রতিদিনের কর্তব্য নির্বাহ করতে-করতে তিনি তখন প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে 'কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।' পরের যুগেও তিনি সে বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নি। সে-আদর্শ তিনি কখনোই অস্বীকার করেননি। কিন্তু 'চিত্রা'-র যুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর যে শান্ত প্রসন্নতা ছিল, সমাজের গভীর সব অসংগতির চিন্তাতে ক্রমশঃ কালস্রোতে সে-প্রসন্নতা কেমন-যেন গাম্ভীর্যে,—এবং কখনো বা কৌতুকস্মিত কারুণ্যে পর্যবসিত হয়েছিল! 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় তাঁর যৌবনের কর্মব্যস্ততার কথাসূত্রে,—সেই আগেকার আমলে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল :

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হু হু করে হাওয়া আসে
হি হি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে,
এবার মাতিব রণে
বৃথা কাজে অকারণে
কেটে গেছে দিনরাত্র।

সে-কালের এই সংকল্পের মধ্যেও কিঞ্চিৎ কৌতুকের মর্জি ছিল বটে। তিনি বলেছিলেন :

লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে
করিব না অনাসৃষ্টি ;
লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধার্-বান
খাড়া রবো দ্বারবান
দশদিকে রাখি' দৃষ্টি।

পরিহাসের সুরে আত্মকথা বলতে-বলতে,—সারবান লেখার প্রসঙ্গ ধরেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, ঘরের দরজা বন্ধ করে এইসব লেখা লিখে-লিখে শুধু কলমের কালিতেই তাঁর

'আঙুলের ডগাগুলো
হয়ে গেল কালীকুষ্টি !'

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কাব্য, বিজ্ঞান,—এমন কি, দেশের অর্থনৈতিক নানা খুঁটিনাটি বৃত্তান্তও তাঁর সে-সময়ের অধ্যয়নের বিষয় ছিল। তখন—

আমি জানি, রুশিয়ান
কতদূরে আগুয়ান,
বজেটের খতিয়ান
কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন
পাশ হোলো কী আইন
কুইনের বেহাইন
বিধবা হইল কল্য ;· ·

'চিত্রা'-পর্বের মনোভঙ্গির এই বিশেষত্ব তাঁর 'পূরবী'-পরবর্তী নতুন ভঙ্গির আলোচনাসূত্রে স্মরণীয়। সংসারের 'জটিল কুটিল' বিচিত্র কর্মের মধ্যেও তিনি তখন নিজেকে বলেছিলেন 'নীড়হারা নিশার পক্ষী'। 'চিত্রা'র 'নগর-সংগীত'-এর মধ্যেও এই একই স্বীকৃতি দেখা যায়। সে-কবিতার শেষদিকে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল :

মানবজন্ম নহে তো নিত্য
ধন-জন-মান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য
কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি—কেবল মাত্র
দু'চারি দিবস, দু'চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবন-পাত্র
জন-সংঘাত মদিরা।

জনসংঘাত-বোধের সেই 'মদিরা'-ধর্ম বা নেশার ভাবটা ক্রমশঃ তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। জগতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এবং সমাজ-ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্দোলনের

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। ১৩২৮ সালের ২৩এ ফাল্গুন তারিখে 'পূরবী'র 'মাটির ডাক' কবিতাটি লেখা হয়। যৌবনের নানামুখী কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে প্রৌঢ় বয়সের সেই কবিতায় তিনি জানিয়েছিলেন :

আজকে খবর পেলেম খাঁটি
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ দেবতার
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।

কর্মচাঞ্চল্যের তাড়নায় যৌবনে একদা সেই শান্ত প্রকৃতির আরামাবাস ছেড়ে তিনি যে দূরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে-কথার উল্লেখ করে অনুশোচনার সুরে তিনি বলেছিলেন :

হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে ;
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা!
আবর্জনা জমে উপার্জনে।

'শীতে ও বসন্তে'র মধ্যে ঈষৎ হাস্যে-পরিহাসে, ব্যঙ্গে-কটাক্ষে ব্যস্ত মানুষের এই রকম ব্যস্ততার কথা বলতে-বলতে হঠাৎ তারই মধ্যে তাঁকে ঝড়ের ছবি আঁকতে দেখা গেছে, সেই 'চিত্রা'তেই :

হেনকালে দুদ্দাড়
খুলে গেল সব দ্বার
চারিদিকে তোলপাড়
বেধে গেছে মহাকাণ্ড
নদীজলে, বনে গাছে
উলটিয়া পড়িয়াছে
দেবতার সুধাভাণ্ড

মাটির ধরণীতে প্রকৃতির সেই আদিম চাঞ্চল্যই যে সর্ববিলোপী আশ্চর্য এক

শক্তি রূপে দেখা দেয়, কবিতার পরের অংশে তাঁর সেই ধারণাই ব্যক্ত হয়েছিল :

'রুশিয়ার অভিপ্রায়'
ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায়
'আমিরের ষড়যন্ত্র।'
'প্রাচীন ভারত' বুঝি
আর পাইব না খুঁজি
কোথা গিয়ে হোলো পুঁজি
জাপানের রাজতন্ত্র।'

তরুণ বয়সের রচনাশক্তিতে তখন বুঝি বা ভাঁটা পড়েছে, এমনি আশঙ্কা প্রকাশ করে সকৌতুক আস্ফালনের ভঙ্গিতে জিৎভূমি—শিলঙ থেকে ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি 'শিলঙের চিঠি' কবিতাটি লিখেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল :

যা হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে ;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,—
কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও ধাঁ করকে।

নিত্য নতুনভাবে নিজের রচনাশক্তির নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহে তিনি কখনোই নিরুৎসাহ ছিলেন না। 'পূরবী'-তে তো বটেই,—তারপর 'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত অজস্র লেখার মধ্যে রূপকারের কলাকৌশলে বৈচিত্র্যসাধনের এইরকম ব্যাকুলতার আর অন্ত ছিল না। এ-পর্বের রচনায় কবিতার তত্ত্বকথাই কিছু কি কম বলা হয়েছে ? 'পূরবীর' ঐ 'শিলঙের চিঠি-র' মধ্যেই সে-সময়ের ক্লান্তিবোধের সঙ্গে আগের পর্বের উৎসাহ-উদ্দীপনার তুলনা করে কৌতুকময় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ অভ্যাস ;
মনে ছিল, হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস ;
কিছু না হোক, 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো—
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।

এখন শুধু গল্প লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।

অবিশ্যি গল্পে অতঃপর নতুন ভঙ্গি দেখা গেছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে—বাংলা ১৩৩৪ সালে 'বিচিত্রা'-র আশ্বিন সংখ্যা থেকে তাঁর বৃহৎ উপন্যাস 'যোগাযোগ' বেরিয়েছে; ১৩৩৫ সালের ভাদ্র থেকে চৈত্র পর্যন্ত 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে 'শেষের কবিতা'; ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বাংলা ১৩৩৮ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি'। আর, সেই ১৯৩১খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর কবিতার বই 'বনবাণী' বেরিয়েছিল। ১৯৩২-এ পর-পর 'পরিশেষ' (ভাদ্র, ১৩৩৯) ও 'পুনশ্চ' (আশ্বিন, ১৩৩৯),—১৯৩৩-এ 'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ, ১৩৪০),—১৯৩৫-এ 'শেষ সপ্তক' (বৈশাখ, ১৩৪২) ও 'বীথিকা' (ভাদ্র, ১৩৪২),—১৯৩৬-এ 'পত্রপুট' (বৈশাখ, ১৩৪৩) এবং 'শ্যামলী' (ভাদ্র, ১৩৪৩) বেরিয়েছে। তার পরের লেখাগুলির সংখ্যাও কম নয়, তাদের গুণগত গৌরবও তুচ্ছ নয়। একে একে 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'প্রহাসিনী,' 'আকাশ-প্রদীপ,' 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়,' 'আরোগ্য' এবং 'জন্মদিনে'—এই ন'খানি কবিতার বই তাঁর মৃত্যুর আগেই ছাপা হয়েছিল; মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে 'ছড়া' (ভাদ্র, ১৩৪৮) এবং 'শেষ লেখা' (ঐ)। 'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষোলো বছরের মধ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একমাত্র 'মহুয়া' (আশ্বিন, ১৩৩৬) বইখানিই কতকটা ফরমাসী বলেই বোধ হয় একটু অন্য ধরনের। তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রণয়ধ্যানের প্রকাশ খুবই স্নিগ্ধ, তীব্র এবং বিস্ময়কর সন্দেহ নেই,—কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের শেষ-পর্বের বিশেষ পরিচয় সেখানে ব্যক্ত হয়নি। 'মহুয়া'-র পাঠ-পরিচয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ জানিয়েছিলেন:

'মহুয়া'র অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ হইতে পৌষ মাসের মধ্যে লেখা। এই সময়ে কথা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে প্রেমের কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেওয়া যায় এইরূপ একখানি বই বাহির করা হইবে, এবং কবি এই বইয়ের উপযোগী কয়েকটি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া গেল; এই সব কবিতা এখন 'মহুয়া' নামে বাহির হইতেছে।

ইহার কিছু পূর্বে ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে, 'শেষের কবিতা' নামে

উপন্যাসের জন্য কয়েকটি কবিতা লেখা হয়। ভাবের মিল হিসাবে সেই কবিতাগুলিও এইসঙ্গে ছাপা হইল।'

১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসে 'সেঁজুতি' প্রথম প্রকাশিত হয়। তার অল্পকাল আগেই রবীন্দ্রনাথ একটি বড়োরকমের অসুস্থতা ভোগ করেছিলেন। প্রায় আড়াই বছর পরে আবার অনুরূপ রোগভোগের পরে তাঁর 'আরোগ্য' বেরিয়েছিল ১৩৪৭-এর ফাল্গুনে। 'সেঁজুতি' উৎসর্গ করা হয় ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের নামে। 'উৎসর্গ'-কবিতাটির মধ্যে সেই ১৩৪৫-এর ব্যাধিযন্ত্রণার কথা আছে—

অন্ধ তামসগহ্বর হতে
ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে
হেরিনু নূতন চোখে।

শান্তিনিকেতনে বসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেঁজুতি'র এই 'উৎসর্গ'-কবিতা লিখেছিলেন। তার তারিখ দেওয়া আছে—১লা শ্রাবণ, ১৩৪৫। আর, বইখানির ভেতরকার মোট বাইশটি কবিতার সবগুলিতে তারিখ না থাকলেও তারিখ-দেওয়া রচনাগুলির দিকেই চোখ রেখে বলা যায় যে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যেই 'সেঁজুতি'র কবিতাগুলি লেখা হয়।

১৩৪৫ সালের পঁচিশে-বৈশাখ উদ্‌যাপিত হয় কালিম্পং-এর গৌরীপুর ভবনে। বিখ্যাত 'জন্মদিন' কবিতাটি তিনি সেখান থেকেই বেতারে পাঠ করেছিলেন। সেইটিই 'সেঁজুতি'র প্রথম কবিতা। তাতে তিনি বলেছিলেন:

আজ আসিয়াছ কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

শুধু 'সেঁজুতি' কেন,—'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক কবিতাসংগ্রহের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জন্ম-মরণের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা একটু বেশি জোর দিয়ে বার-বার বলেছেন। কাজেই, 'সেঁজুতি'র এই

'এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা'-র আয়োজনটা আকস্মিক নয়,—পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। 'শেষ লেখা'-র প্রথম কবিতার তারিখ ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯। সকলেই জানেন যে তাতে তিনি জানিয়েছিলেন :

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি' লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

'সেঁজুতি'-র 'জন্মদিন'-এর মধ্যেও অনুরূপ প্রার্থনা আছে :

পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

জরার আক্রমণে শরীর ভেঙে পড়েছে তখন। চক্ষু-কর্ণ ক্রমশঃ অশক্ত হয়ে পড়ছিল,—তিনি 'নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে' যেতে-যেতে বেশ বুঝতে পারছিলেন যে শেষ প্রহরের অন্তিম লগ্ন তখন আসন্ন! প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্য-প্রকৃতির সংঘর্ষের কথা ভেবে তিনি জানিয়েছিলেন :

কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে-মানুষ তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু কর, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন কর নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধ' বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দির বেদীতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে ; তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব।

'শেষ লেখা'র দ্বিতীয় কবিতায় [রচনাকাল ৭ মে, ১৯৪০] এই কথাই আরো সংহত রূপে দেখা দিয়েছিল—

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।

'আরোগ্য' বইখানির প্রথম কবিতায় [রচনাকাল ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১] মধ্যেও এই কথাই পুনর্বার শোনা গিয়েছিল :

দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে
সব ক্ষতি মিথ্যা করি' অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

'আরোগ্য' বইখানির এই কবিতার মধ্যেই তিনি বলেছিলেন—'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।' নিরাসক্ত মন দিয়ে সেই নিত্যকে দেখবার কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু জায়গায় বলা হয়েছে। তাঁর শেষ পর্বের এইসব কবিতার মধ্যে সেই কথাই প্রধান কথা হয়ে উঠেছে। 'জন্মদিন' কবিতাটির শেষদিকে তিনি বলেছিলেন :

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি,
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।

'সেঁজুতি'র 'জন্মদিন'-এর সঙ্গে 'পূরবীর' 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির তুলনা মনে আসা স্বাভাবিক। ১৩২৯ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে লেখা এই কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চির নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের শেষ দিনগুলিতেও তাঁর কলম দিয়ে মহাকাল যা লিখেছেন, সে-কথার শাশ্বত আবেদন ভোলবার নয়। বিন্দু বিন্দু জল দিয়েই মহাসমুদ্র গড়ে ওঠে বটে, তবু অনেক জলবিন্দুর সমাহার ঘটিয়ে তোলাটাই সমুদ্র-সৃষ্টির নমুনা নয়! বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্র-কাব্যের কোনো পর্বই ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেখবার জিনিস নয়। তাঁর শেষ পর্বের সঙ্গে তাঁর অশেষ পূর্ণতার যোগ অনস্বীকার্য। এই শেষ পর্বে তিনি দেশের যুবশক্তিকে নাগিনীর বিষোদ্গারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে উৎসাহও দিয়েছেন, আবার পরমের দিকে,—অনিবার্য একের দিকে তাঁর চিরকালের অভিমুখিতার কথাও ব্যক্ত করেছেন!